আহ্‌মদীয়াত

(ইসলামের পুনর্জাগরণ)

মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ

প্রকাশক
সৈয়দ ছারফরাজ আহমদ
মাসজিদুল মাহ্‌দী
মৌলভীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

সম্পাদনা ঃ
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী [কাশ্‌তকার]

[সর্বস্বত্ব ঃ লেখকের]

প্রথম প্রকাশ ঃ
রমজান – ১৪০৬ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ – ১৩৯৩ বাং
জুন – ১৯৮৬ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
মহররম – ১৪২০ হিঃ
বৈশাখ – ১৪০৬ বাং
এপ্রিল – ১৯৯৯ইং

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা US $ 2.00

মুদ্রণ ঃ **ইন্টারকন এসোসিয়েট্‌স**
মতিঝিল, ঢাকা

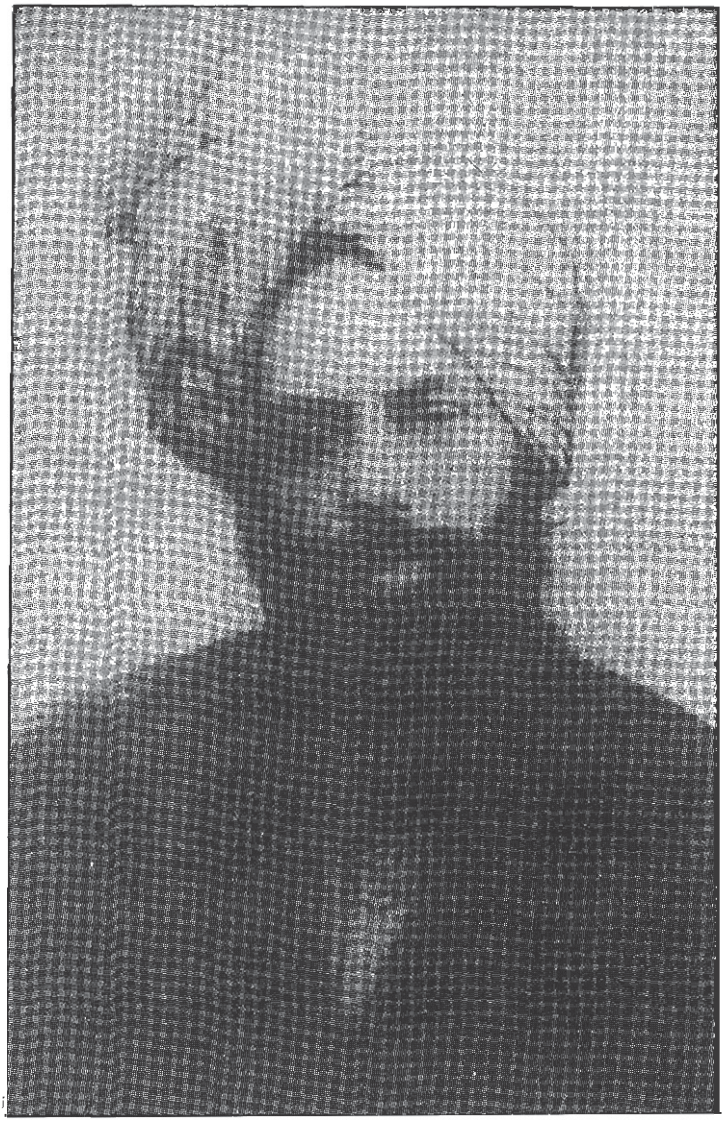

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৩৫–১৯০৮)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস সালাম

উৎসর্গ ঃ

মরহুম পিতা
মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ (রঃ)
স্মরণে

লেখক পরিচিতি

মাওলানা সৈয়্যদ এজাজ আহমদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম ও পীর হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রঃ) সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯১৪ সনে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্থানীয় অন্নদা হাই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার পর ১৯২৭ সনে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের মূলকেন্দ্র কাদিয়ানে গমন করেন। সেখানে ১৯৪৩ সন পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর দীনি শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৮ সনে মিশনারী ক্লাস পাশ করেন এবং তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর প্রবীণ সাহাবীদের সাহচর্যে শিক্ষালাভ করারও সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি ১৯৩৯ সন হতে ১৯৭৪ সন পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৫ বছর আহ্‌মদীয়া জামাতের সদর মুরব্বী হিসেবে খিদমত করেন। তিনি ১৯৬৯ সনে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইনচার্জ মুরব্বী পদে উন্নীত হন।

মাওলানা সৈয়্যদ এজাজ আহমদ ইতোমধ্যে কয়েকখানি মূল্যবান তবলীগী পুস্তক রচনা করেন ঃ (ক) সীরাতে 'সুলতানুল কলম' (খ) আহ্‌মদীয়াত (গ) জয্‌বাতুল হক (বঙ্গানুবাদ) (ঘ) জামীমা বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার ৫ম খন্ডের কিয়দংশসহ বহু ছোটখাট তবলীগি প্রচারপত্রও প্রকাশ করেন। আল্লাহ্‌তাআলা তার কুরবাণী ও খিদমতকে গ্রহণ করুন এবং উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন ॥

– প্রকাশক

পূর্বকথা

بسم الله الرحمن الرحيم -

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন

فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দাও, যাহারা মনোযোগসহকারে কথা শুনে এবং উহার উত্তম অংশের অনুসরণ করে তাহারাই ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং তাহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান – (সূরা আয্ যুমার ঃ ১৮–১৯)।

হাদীসে আছে ঃ "জ্ঞানের কথা মোমেনের হারানো সম্পদ তুল্য, যেখানেই উহা পাওয়া যায় সেখান থেকেই মোমেন তা কুড়িয়ে নেয়।"

কিন্তু যুগে যুগে যখনই মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য কোন নবী-রসূল বা যুগ-ইমাম আবির্ভূত হয়েছেন তখনই সব মহল থেকে তাঁর বিরোধিতা হয়েছে। সমাগত হেদায়াতকারীর প্রচার হতে জনসাধারণকে দূরে রাখার জন্য যুগের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে সম-সাময়িক উলামা সম্প্রদায় আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এমন কি এ ধরনের মারাত্মক বিরোধিতা হতে সারওয়ারে কায়েনাত রাহ্মাতুল্লিল আলামীন হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-ও রেহাই পাননি। পবিত্র কোরআন নাযিলের শুরুতেই জনগণের মধ্যে এর পবিত্র শিক্ষার প্রসার ও প্রভাব যেন বিস্তারিত না হয়ে পড়ে তজ্জন্য নেতৃবৃন্দ জনগণকে একথা বলে বিভ্রান্ত করতে লাগলেন যে, কোরআন পাঠ করলে বা তা শ্রবণ করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে কোরআন শরীফে রয়েছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾

অর্থাৎ এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তোমরা এই কোরআন শুনিও না, এবং ইহার মধ্যে (পাঠকালে) শোরগোল সৃষ্টি কর, যাহাতে তোমরা জয় লাভ করিতে পার' (সূরা হা-মিম আস্ সাজদাঃ ২৭ আয়াত)।

আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ যুগেও যখন চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে মোজাদ্দেদ তথা যুগ-ইমাম, আল্-ইমামুল মাহদীকে জগতের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্ প্রেরণ করলেন তখন তিনিও বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকেন যেমন আমাদের প্রিয়নবী রসূলে আরাবী (সাঃ) কোরেশদের হাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তখন পাক-ভারত উপমহাদেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উলামা সম্প্রদায় এমনকি মক্কা-মদীনার আলেম-উলামাও তাঁর বিরুদ্ধে কাফেরের ফতওয়া দিয়ে তাঁর রচিত পুস্তকাদি পাঠ না করার জন্য কড়া নির্দেশ জারি করেছিলেন।

এ পুস্তকে এতদ্বিষয়ে যথাসাধ্য আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদী বিভিন্ন মহল থেকে এ পর্যন্ত যেসব ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের অনবরত চেষ্টা ও দোয়ার ফলে সেগুলো শনৈঃ-শনৈঃ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে এবং পদে পদে আসমানী সাহায্য লাভের মাধ্যমে এ জামাত দ্রুত বেড়ে চলেছে।

উদীয়মান সূর্য যখন মাথার উপরে পৌঁছে তখন দিবসকাল এসেছে কিনা তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পারসীতে এক মশহুর প্রবাদবাক্য আছে ঃ

"آفتاب آمد دلیل آفتاب"

"মধ্যাকাশে বিরাজমান ভাস্করই ভাস্করের প্রমাণ।"

বস্তুতঃ শত-সহস্র বাধা-বিঘ্ন, কুফরী ফতওয়া ও অমানবিক অত্যাচার-উৎপীড়ন সত্ত্বেও এক শতাব্দী পুরা হতে না হতেই আল্লাহ্র রোপিত এ চারাটি এক মহা-মহীরুহে পরিণত হয়েছে। দেখতে দেখতে ১৫২টি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আহমদীয়া জামাতের সক্রিয় প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় তদীয় জামাতের সদস্যসংখ্যা চার লক্ষ হতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আজ সংখ্যায় প্রায় দুই কোটিতে উপনীত হয়েছে। ইহা কি আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, কোন কোন রাষ্ট্রপ্রধানের আহমদী বিরোধী অমানবিক নির্যাতনমূলক আইন প্রয়োগেও সিলসিলায়ে আলীয়া আহমাদীয়ার অগ্রগতিকে রুখতে সক্ষম হয়নি?

'আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলই পরিণামে জয়যুক্ত হয়ে থাকেন' আল্লাহ্তা'লার এ বাণী ধ্রুব সত্য।

আমার কর্মময় জীবনের দীর্ঘ ৪০টি বৎসরই কেটে গেছে উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে। কোথাও দু'দন্ড বসবার ফুসরত পাইনি। বহু কথা শুনেছি, বলেছিও বহু। সারা জীবন কথার মালা গেঁথে এসেছি। সে মালাই এবার কাগজে কলমে তুলে ধরার প্রয়াস নিচ্ছি।

ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত কেউ নয়। আমার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম আশা করা যায় না। তবুও দৃঢ় আশা পোষণ করছি যে, এ পুস্তকের কথাগুলোকে বিচার-বিবেচনা করতে কেউ কার্পণ্য করবেন না এবং তখনই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক বলে গণ্য হবে।

পাখী গান গায় আপন মনে, কে তার গান শোনে আর কে শোনে না সে জানার অবসর তার নেই। তবে যিনি শোনেন তিনি উপকৃত হন। তাই প্রত্যয় পোষণ করি যে, পুস্তকটি যারা পাঠ করবেন ইনশাল্লাহ্ উপকৃত হবেন।

এ কর্মপ্রেরণায় নানা রূপে যারা উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁদের স্মৃতি অবশ্যই আমার মনের মণিকোঠায় অম্লান হয়ে থাকবে।

আমার স্নেহাস্পদ মোহাম্মদ ইয়ামীন প্রকাশনার ব্যয়ভার বহন করাতেই পুস্তকটি পাঠক সমাজের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছে। জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী পুস্তকের সম্পাদনা, কিছু টীকা সংযোজন ছাড়াও বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে বাংলা অংশের প্রুফ দেখার দুরূহ কাজও করেছেন। সর্বজনাব আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মকবুল আহমদ খান, মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, মীর মোহাম্মদ আলী নানাভাবে সহায়তা দান করেছেন। শেখ আবদুল আলী পাণ্ডুলিপি লেখার কাজ করেছেন। মুদ্রাকর এম. আবদুল হাকিম সাহেব বাংলা ছাড়াও আরবী এবং উর্দূ অংশের প্রুফ দেখে প্রভূত সাহায্য করেছেন। এরা আমার শুভাকাঙখী, সত্যের প্রচারে পুস্তকটি কার্যকর ভূমিকা পালন করলে এরাও লেখকের মতই আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞ হবেন। আল্লাহ্ তাঁর অপার করুণায় আমাদের সবার প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন!

খাকসার ঃ
সৈয়দ এজাজ আহমদ
'মাসজিদুল মাহদী'
মৌলভীপাড়া
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

তারিখ ঃ ২৭শে রমযান, ১৪০৬
২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩
৬ই জুন, ১৯৮৬
[শুক্রবার]

সূচী-পত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
সিলসিলায়ে আলীয়া আহমদীয়ার মূল ধর্মবিশ্বাস	...	১৩
মোজাদ্দেদগণের তালিকা	...	১৫
মোজাদ্দেদ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী	...	১৬
হযরত আহমদ কাদিানী (আঃ)-এর দাবীর বিভিন্ন দিক	...	১৯
স্বতন্ত্র জামা'ত কেন ?	...	২৩
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর উত্তর	...	২৯
জামা'তের নাম ঃ	...	৩১
ইমাম মাহ্দী (আঃ) জাহির হওয়া সম্পর্কে চিন্তাবিদদের ও দ্বাদশ শতাব্দের মাজাদ্দেদ-এর অভিমত	...	৩৭
বিরুদ্ধাচারণ প্রসঙ্গ	...	৩৯
ইমাম ও মোজাদ্দেদগণের উপর কুফরী ফতওয়া	...	৪১
ইসলাম ও মুসলমানের সংজ্ঞা	...	৪৪
হানাফি ফিকাহ্ অনুযায়ী ইসলামের সংজ্ঞা	...	৪৬
ব্যাপকভিত্তিক ধর্মবিশ্বাস ও আহ্মদীয়া জামা'ত	...	৪৮
আহমদীয়া জামাতের আকায়েদের বৈষম্য	...	৫১
জেহাদ	...	৫৮
কলমের জেহাদ	...	৬০
মোজাদ্দেদ ও ইসলাম প্রচার	...	৬৩
আহ্মদীয়াত তথা ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয়	...	৭৪
জিন্দা ধর্ম জিন্দা নবী	...	৮৩
পবিত্র কোরআনই একমাত্র জিন্দা কেতাব	...	৮৯
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কোরআনের মর্যাদা	...	৯৭
ইসলামের হেফাযতের প্রয়োজনীয়তা এবং আসমানী সাহায্য	...	১০৩
আর্যসমাজীদের সঙ্গে রূহানী মোকাবেলা	...	১০৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
আন্তঃধর্ম মহাসম্মেলন ও বিশেষ নিদর্শন	...	১১৫
ব্রাহ্মসমাজ ও আহমদীয়া জামাত	...	১১৭
ত্রিত্ববাদিতা ও হযরত আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ)	...	১২০
খৃষ্টানদের সঙ্গে রূহানী মোকাবেলা	...	১২৪
অমৃতসরের ঐতিহাসিক মোনাযেরাতে একটি আশ্চর্য ঘটনা	...	১২৮
হেনরী মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমা	...	১২৯
আলেকজান্ডার ডুইয়ের সঙ্গে মোবাহালা	...	১৩৫
আমেরিকার ডঃ জন আলেকজান্ডার ডুই-এর ছবি	...	১৪৭
অবশেষে তৌহীদেরই বিজয় হবে এবং মিথ্যা উপাস্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে ঃ	...	১৪৮
জিয়ন সিটিতে আহ্‌মদীয়া মসজিদ ও মিশন হাউজ	...	১৪৯
মিঃ পিগটের পরিণতি	...	১৪৯
শুদ্ধি আন্দোলন	...	১৫০
প্রখ্যাত মনীষীদের দৃষ্টিতে আহ্‌মদীয়ত	...	১৫৫
'আল্লাহ্‌ই আমাকে পাঠিয়েছেন'	...	১৬২
সত্য নির্ধারণের সন্দেহাতীত পন্থা	...	১৬৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আহ্‌মদীয়াত

সিলসিলায়ে আলীয়া আহমদীয়ার মূল ধর্মবিশ্বাস

সিলসিলায়ে আলীয়া আহমদীয়ার মূল আকিদা অতীব স্বচ্ছ এবং দ্ব্যর্থহীন। যথাঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই পরিপূর্ণ দীন"(৩ঃ২০)। কোরআন শরীফ মানব-জাতির জন্য এ ধরাধামে একমাত্র জীবন্ত শরীয়ত এবং সারওয়ারে কায়েনাত নবীকুল শিরমণি রাহমাতুল্লিল-আলামীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-ই একমাত্র শাফায়াতকারী রসূল। তিনি খাতামান্-নবীঈন (নবীগণের মোহর) নবীগণের নবী অর্থাৎ তিনি নবীসম্রাট। তাঁর অন্তর্ধানের পর কেয়ামত পর্যন্ত এ দুনিয়াতে আর কোন 'নূতন ধর্ম' কোন 'নূতন শরীয়ত' কোন 'নূতন কলেমা' বা অন্য কোন 'শরীয়তধারী' নবীর আগমন হবে না। সিলসিলায়ে আলীয়া আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ঘোষণা করেছেনঃ বর্তমানে আদম সন্তানের (সারা বিশ্বমানবের) জন্য কোরআন শরীফই হচ্ছে একমাত্র পূর্ণ জীবনবিধান। কোরআনের মর্যাদা বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে ইলহামের মাধ্যমে সম্বোধন করে জ্ঞাত করেছেন ঃ اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِى الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ 'সর্বপ্রকার (ঐহিক ও পারত্রিক) মঙ্গল কোরআন শরীফেই নিহিত রয়েছে'। কোরআন শরীফের শিক্ষাতেই রয়েছে সাফল্য এবং এককভাবে ইহাই মুক্তির একমাত্র উৎস। ধর্ম হিসেবে মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় যা কিছুর প্রয়োজন, তন্মধ্যে এমন কিছুই (বাকী) নেই যা কোরআনে নেই। কেয়ামতের দিন একমাত্র কোরআনই হবে ঈমানের সত্যাসত্যের মানদন্ড স্বরূপ। তেমাদেরকে হেদায়াত করার মত আকাশের নিম্নে একমাত্র কোরআন ব্যতিরেকে দ্বিতীয় আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। বস্তুতপক্ষে কোরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থটি তোমাদেরকে প্রদান করে খোদাতা'লা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। আমি সত্য-সত্যই ঘোষণা করছি যে, তোমাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে, তা যদি খৃষ্টানগণকে দান করা হতো তবে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো না। তোমাদেরকে কোরআন শরীফের মাধ্যমে যে নেয়ামত ও হেদায়াত দান করা হয়েছে, ইহুদীদেরকেও যদি তাওরাত কেতাবের বদলে কোরআন শরীফের অনুরূপ নেয়ামত এবং হেদায়াত প্রদান করা হতো তবে তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন ফেরকা কেয়ামতের অস্বীকারকারী হতো না। *

সুতরাং তোমরা খোদাপ্রাপ্ত (কোরআন শরীফ নিহিত) এ নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা এক অতীব প্রিয় নেয়ামত এবং এক মহাসম্পদ। যদি কোরআন নাযিল না হতো, সমগ্র দুনিয়া একটি অপবিত্র মাংসপিন্ডস্বরূপ হয়ে যেত। (প্রকৃত পক্ষে) দুনিয়ার অন্য সব গ্রন্থই কোরআন শরীফের সম্মুখে তুচ্ছ।

– ('কিশ্‌তিয়ে নূহ' বাংলা অনুবাদঃ ৫০-৫১ পৃঃ)

ইহা সর্বজনবিদিত যে, চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে নাযিলকৃত পবিত্র কোরআনের বর্ণনাসমূহ যেরূপ নাযিল হয়েছিল আজ পর্যন্ত হুবহু রয়ে গেছে। কোরআনের বৈশিষ্ট্য যে, ইহা ব্যতিরেকে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থই তাহরিফ (হস্তক্ষেপ) এবং তাবদিল (পরিবর্তন) হতে মুক্ত নহে। এর মূল কারণ কোরআন শরীফ 'কালামুল্লাহ্' এবং মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও সর্বাঙ্গীন জীবনবিধান। কোরআন শরীফের হেদায়াতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্তা'লার বিশেষ নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত। যেমন, সূরা হিজর-এর ১নং রুকূতে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

অনুবাদ ঃ "নিশ্চয় আমরাই এই যিকর (কোরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হেফাযতকারী"(১৫ঃ১০)। আল্লাহ্তা'লার এ অলংঘনীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোরআনের হেফাযতের ব্যবস্থা দুই প্রকারে চালু আছে। যথাঃ

(১) কোরআনের বাহ্যিক ও শাব্দিক হেফাযতের ব্যবস্থা

(২) কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা বা উহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বাবলী এবং আহকামসমূহের যথাযথ মর্ম উদ্ঘাটনের ব্যবস্থা।

শব্দ, বাক্য এবং ভাষাগত হেফাযতের সুবিধার্থে আল্লাহ্তা'লা কোরআন শরীফের বাক্যসমূহে এমন আশ্চর্যজনক, প্রাঞ্জল, সরল, স্বচ্ছ এবং মর্মস্পর্শী আরবী ভাষার সমাহার রেখে নাযিল করেছেন যা মানুষের ভাষা ব্যবহারের প্রকৃতি মোতাবেক এত আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী যে, অতি সহজেই উহা স্মৃতিপটে সুরক্ষিত হয়ে যায়। জগতের অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের ভাষায় এবং বাক্যবিন্যাসে কোরআনে ব্যবহৃত আরবীর মত ভাষাগত মাধুর্য বা লালিত্যের সংযোগ নেই। তাই ঐসব গ্রন্থকে 'হেফয' করে সিনায় সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

অতএব ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই পুরুষাণুক্রমে শত শত হাফেযে কোরআনের সৃষ্টি হয়ে আসছে। তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই সহজে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ 'হেফয' বা মুখস্থ করে আসছেন। হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ও সহস্রাধিক হাফেয ছিলেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের জামানা হতেই এরূপ হেফযকারীগণের সেলসেলা জারি রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে।

প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনের বাহ্যিক বা শব্দগত হেফাযত এবং কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা, তত্ত্বকথা এবং আহকামসমূহের অন্তর্নিহিত মর্ম ও দর্শনের হেফাযতের ব্যবস্থা একই সূত্রে গাঁথা নহে। কোরআনে আল্লাহ্তা'লা এরশাদ করেছেনঃ

সূরা ওয়াকেয়া ৩য় রুকূ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ অর্থাৎ "পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেহ ইহাকে স্পর্শ করিবে না "(৫৬ঃ৮০)। এখানে 'স্পর্শ' শব্দটি কোরআনের অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্ব ও মর্ম উদঘাটনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, আয়াতসমূহ কণ্ঠস্থ করার অর্থে নহে। কেননা, আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং রূহানী জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিও

হাফেয হতে পারে। বস্তুতপক্ষে একমাত্র আত্মার পবিত্রতা সাধনকারী আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত পবিত্র ব্যক্তিরাই ঐশী সাহায্যে কোরআনের খাঁটি মর্ম উদঘাটন করতে সমর্থ হন। কোরআনের বাহ্যিক পবিত্র বাক্যসমূহের কেবল হেফয-কার্য সুসম্পন্ন করলেই পবিত্র কোরআনের আসল হকিকতের হেফাযত করা হয় না।

মানবসুলভ দুর্বলতাবশতঃ ধর্মের মূল সত্যপথ হতে মানুষের পদস্খলন ঘটা এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তৌহীদের উপাসনার পরিবর্তে সমাজের সৃষ্ট রুসুম রেওয়াজের অনুসরণকে প্রাধান্য দেওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

অর্থাৎ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে (৪ঃ২৯)।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী "কুসংস্কার" বা রুসুম রেওয়াজের অনুসরণ করে যখনই মুসলিম কলুষিত হয়ে পড়বে, তখনই এ সমুদয় কালীমা সমাজ হতে বিধৌত করে ইসলাহ কার্য সমাধানের জন্য রসূলে করীম (সাঃ)-এর উম্মত হতে প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শিরোভাবে মোজাদ্দেদ বা ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) **ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন** ঐ সকল মোজাদ্দেদগণ এসে তৌহীদবিরোধী ভ্রান্ত আকিদাসমূহকে এবং বেদাতপূর্ণ অবান্তর রুসুম রেওয়াজগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করে ইসলামকে যুগের চাহিদা মোতাবেক ব্যাখ্যা করবেন, সঞ্জীবিত করবেন এবং ইসলামী শরীয়তের নীতিমালার অনুসরণে মুসলিম সমাজকে ঢেলে সাজিয়ে নবায়ন করবেন। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ

سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا - (ابوداؤد اور مشكوٰة - ٣٦)

অর্থাৎ "অবশ্যই আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মোজাদ্দেদ আবির্ভূত করবেন; যিনি ইউজাদ্দিদুলাহা দীনাহা অর্থাৎ যিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন। আঁ হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতি হিজরী শতাব্দীতে এই উম্মতের মধ্যে এমন বহু মোজাদ্দেদের আগমন ঘটেছে যাঁদের নাম ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

মোজাদ্দেদগণের নামের তালিকা

বিগত ১৩০০ (তেরশত) বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক শতাব্দীতেই যেভাবে মোজাদ্দেদগণের আবির্ভাব হয়েছে, (ভূপালের নওয়াব) সিদ্দীক হাসান খাঁ কর্তৃক ১২৯১ হিজরী সনে প্রণীত 'হুজাজুল কেরামা ফী আসারিল কিয়ামাহ্' নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লিখিত রয়েছে। এ গ্রন্থে উল্লিখিত মোজাদ্দেদগণের (রাহঃ) ধারাবাহিক নামের তালিকা দেওয়া হলো ঃ

১। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ)
২। হযরত ইমাম শাফী এবং আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ)
৩। হযরত আবুশারাহ আবুল হাসান আশয়ারী (রাঃ)
৪। আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (রাহঃ) এবং কাজী আবুবকর বাকেলানী (রাহঃ)
৫। হযরত ইমাম গাজ্জালী (রাহঃ)
৬। হযরত সৈয়্যদ আবদুল কাদির জিলানী (রাহঃ)
৭। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) এবং খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (রাঃ)
৮। হযরত হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রাহঃ) এবং হযরত সালেহ ইবনে ওমর (রাহঃ)
৯। হযরত ইমাম জালাল উদ্দিন সাইওতী (রাহঃ)
১০। হযরত মোহাম্মদ তাহের গুজরাটি (রাহঃ)
১১। হযরত মোহাম্মদ আলফেসানী আহমদ সিরহিন্দী (রাহঃ)
১২। হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রাহঃ)
১৩। হযরত সৈয়্যদ আহমদ বেরেল্‌ভী (রাহঃ)

মোজাদ্দেদ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিঃ ১৩০৬ সনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার আদেশক্রমে মোজাদ্দেদ এবং পরে ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করেন। তিনি জলদ্‌গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন ঃ

"اور مجھے خدا کی پاک اور مطہر وحی سے
اطلاع دی گئی ہے۔ کہ میں اس کی طرف سے مسیح موعود
اور مہدیٔ معہود اور اندرونی اور بیرونی اختلافات
کا حکم ہوں۔ یہ جو میرا نام مسیح اور مہدی رکھا گیا۔
ان دونوں ناموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے مشرف فرمایا۔ اور پھر خدا نے اپنے بلا واسطہ
مکالمہ سے بھی میرا نام رکھا۔" (اربعین حصہ اول - ۳)

(ক) অনুবাদ ঃ আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর পবিত্র ইলহামের মাধ্যমে আমাকে জ্ঞাত করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আমাকে এ শতাব্দীর মসীহ মাওউদ এবং মাহদী মাহুদ নিযুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে বিরাজিত অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক এখতেলাফ বা মতবৈষম্যসমূহের মীমাংসার জন্য এযুগে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে হাকাম (ন্যায়

বিচারক) হিসেবে মনোনীত করেছেন। রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে মসীহ্ এবং মাহদী এ দুই উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন। ইল্হামের মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা কর্তৃক এ দু'টি নামেই আমাকে সম্বোধন করা হয়েছে। –('আরবাঈন' হিস্যায়ে আওয়ালের ৩য় পৃঃ)

(খ) তৎপ্রণীত গ্রন্থ কেতাবুল ব্যরিয়ার ১৬৮ পৃষ্ঠায় হাশিয়াতে লিখেছেনঃ

جب تیرھویں صدی پار ہو کر چودھویں صدی آ گئی۔
تب اللہ تعالی نے اپنے الہام کے ماتحت * مجھے
مخاطب کرکے فرمایا کہ "تم ہی اس ہجری صدی کے
مجدد ہو۔"

অনুবাদঃ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী উত্তীর্ণ হয়ে যখন চতুর্দশ শতাব্দীর আগমন হয়ে গেল তখন ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমিই এ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ"।

(গ) উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের ২য় পৃষ্ঠায় তিনি ঘোষণা করছেনঃ

مجھے اس خدائے کریم کی قسم ہے جو جھوٹ کا
دشمن اور مفتری کا نیست و نابود کرنے والا ہے۔
کہ میں اسی کی طرف سے ہوں۔ اور اسی کے بھیجنے سے
عین وقت پر آیا ہوں۔ اور اس کے حکم سے کھڑا
ہوا ہوں۔ اور میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے۔
اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور نہ میری جماعت
کو تباہی میں ڈالے گا۔ جب تک وہ اپنے تمام کام کو
پورا نہ کر لے۔ جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔"
(اربعین حصہ سوئم ص۔۲)

অনুবাদ ঃ যে আল্লাহ্তা'লা মিথ্যাবাদীর দুষমন এবং মিথ্যা রটনাকারীগণকে নাস্তানাবুদ (ধ্বংস) করে থাকেন আমি সেই আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি যে, আমি তাঁরই পক্ষ থেকে এসেছি এবং তাঁরই নির্দেশে যথাসময়ে আমার অভ্যুদয় হয়েছে। প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ্তা'লা আমার সাহায্য করছেন এবং কখনও কোনদিন আল্লাহ্ আমাকে অকৃতকার্য করবেন না। যে পর্যন্ত আমার আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাফল্যমন্ডিত না হবে সে পর্যন্ত আমার জামাত কস্মিনকালেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না।

(ঘ) 'বারাকাতোদ্দোয়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবী পেশ করতে যেয়ে তিনি বলেনঃ

অনুবাদ ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মোজাদ্দেদ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক পূর্ব শতাব্দীসমূহের প্রত্যেক শতাব্দীতেই যেরূপ মোজাদ্দেদগণের আগমন ঘটেছিল তদনুরূপ এ জামানাতেও ইসলাহ্ করবার জন্যই আল্লাহ্তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন। কেননা, মুসলমানদের মধ্য হতে ভ্রান্তিসমূহকে দূরীভূত করার জন্য একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্য ব্যাতিরেকে গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং এ জামানাতে আমাকে প্রেরণের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে পথভ্রষ্ট এবং বিপথগামী লোকদের সমক্ষে সত্য এবং জেন্দা খোদার জাজ্বল্যমান প্রমাণাদি পেশ করা এবং তাজা নিশানসমূহের মাধ্যমে সত্যের অস্বীকারকারীগণের নিকট যেন ইসলামের প্রকৃত মাহাত্ম্য এবং হকিকত ব্যাখ্যা করে প্রকৃত ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করা যায়।

(ঙ) 'এযালায়ে আওহামের ' প্রথম খন্ড ১৫৪ পৃষ্ঠায় তিনি ইহাও ঘোষণা করলেন ঃ

অনুবাদঃ অগণিত বিরোধীগণের মোকাবিলা হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে আল্লাহ্র ইলহাম প্রাপ্তির ভিত্তিতে নিজকে আমি চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদরূপে সর্বজনসমক্ষে আমার দাবী পেশ করছি তা যদি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে থাকে, তবে এমন দ্বিতীয় অন্য একজনকে পেশ করা হোক যিনি আমারই মত আল্লাহ্র এলহাম প্রাপ্ত হয়ে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হয়োর দাবী পেশ করতে সক্ষম।

'মামুর মিনাল্লাহ্' (আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ) কথাটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্র অলী, দরবেশ, কুতুব, আবদাল, মুহাদ্দেস বা মূলহাম (ইলহাম লাভের মত রূহানীভাবে পবিত্র ব্যক্তি) আর 'মামুর মিনাল্লাহ্' হওয়া এক কথা নহে। আবহমানকাল হতেই ইহা এক কঠিন পন্থা। আমাদের সাধারণ জাগতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির দূরদর্শিতা দ্বারা বিবেচনা করলে দেখতে পাই যে, ইহা বড়ই সঙ্কটময়। এতদসত্ত্বেও সত্য-সত্যই যাঁরা আল্লাহ্র মামুর তাঁদের উপর আল্লাহ্র এমনই এক বিশেষ ফযল ও রহমতের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে যার ফলে অসম্ভব পরিণত হয়ে যায় সম্ভবে এবং মামুর মিনাল্লাহ্ ও তাঁর অনুসারীবৃন্দই উচ্চাঙ্গের কৃতকার্যতা দ্বারা আশীষযুক্ত হয়ে যায়। কোরআন শরীফে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ

(১) كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ

(২) اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

আল্লাহ্ ফয়সালা করিয়া লইয়াছেন ঃ 'নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হইব' (৫৮ঃ২২)।

জানিয়া রাখ, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র দলই সফলকাম হইবে' (৫৮ঃ২৩)।

'মামুর মিনাল্লাহ' হিসেবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর একাধারে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ এবং ইমাম মাহ্দী হওয়ার দাবী সম্পর্কে তাঁর ঘোষণাসমূহ আলোচিত হয়েছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের অবশ্যই এতদ্বিষয়ে যথাযথ তাহকীক করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, গায়ের জোরে বা বিদ্যার অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে 'মামুর মিনাল্লাহ্র' দাবী টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নহে। কোন 'ডানপিটে ব্যক্তির' প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারাও এহেন দাবী দাঁড় করান যে সম্ভব নহে, সাম্প্রতিককালের পবিত্র মক্কা নগরীর জনৈক দাবীকারকের পরিণতি দ্বারাও আমরা তা উপলব্ধি করেছি। কারণ, এ দাবীর সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ্তা'লার সংগে।

হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর দাবীর বিভিন্ন দিক ঃ

ইমামুজ্জামান বা যুগ-ইমাম বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য হযরত মির্যা সাহেব প্রণীত 'জরুরতুল ইমাম' নামক পুস্তকের আলোকে তাঁর দাবীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছিঃ

(১) হযরত আহমদ (আঃ) বলেনঃ স্মরণ রেখ যুগ-ইমাম (ইমামুজ্জামান) শব্দটি দ্বারা নবী-রসূল, মোজাদ্দেদ ও মোহাদ্দেস সকলকেই বুঝায়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি মানব জাতির সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট হননি এবং যাদেরকে রূহানী জামালাত ও রূহানী উৎকর্ষতা প্রদান করা হয়নি এমন ব্যক্তিগণ জামানার ওলী এবং আবদাল হওয়া সত্ত্বেও 'যুগ-ইমাম' বা 'ইমামুজ্জামান' হতে পারে না।

–(জরুরতুল ইমাম- বাংলা অনুবাদঃ ৪২ পৃঃ)

(২) অতঃপর বলেন শেষ প্রশ্ন ইহাই রয়েছে যে, বর্তমান জামানার (চতুর্দশ শতাব্দীর) ইমাম কে? যাঁকে অনুসরণ করাটা সাধারণ মুসলমানসহ সমাজের সমগ্র সাধককুলের, সত্য স্বপ্নদর্শীর এবং মুসলমানগণের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দ্ধারিত হয়েছে? আমি দ্বিধাহীন চিত্তে এ শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলছিঃ **" খোদার ফযলে এবং তাঁরই বিশেষ অনুগ্রহে সেই যুগ-ইমাম তথা 'ইমামুজ্জামান' আমিই। বস্তুতঃ ইহার সকল চিহ্ন এবং নিদর্শনাবলী আল্লাহ্তা'লা আমার মধ্যে পুঞ্জীভূত করে দিয়েছেন।"**

(৩) খোদাতা'লা (ব্যক্তিগত জীবনে) আমাকে ৪টি নিদর্শন দিয়েছেন যথাঃ

(ক) কোরআন শরীফের অলৌকিকত্বের প্রতিচ্ছায়ায় আমাকে ভাষা, বাগ্মিতা এবং রচনাশক্তির উৎকর্ষতা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার মোকাবিলা করার মত কেউ নেই।

(খ) আমাকে কোরআন শরীফের গভীর তত্ত্বজ্ঞান, হকিকত ও মা'রেফাত প্রকাশ করবার নিদর্শন প্রদত্ত হয়েছে। এতদ্বিষয়ে কেউই আমার মোকাবিলা করতে সক্ষম নন।

(গ) আমি আমার অসংখ্য প্রার্থনা মঞ্জুরীর তথা দোয়াসমূহ কবুলিয়তের নিদর্শনপ্রাপ্ত হয়েছি। ইহাতেও আমার সমকক্ষতা করতে কেউই সক্ষম নয়। ইহা আমি শপথ করে বলতে পারি এবং ইহার প্রমাণও আমার হাতে বিদ্যমান রয়েছে যে, আমার ত্রিশ হাজারেরও অধিক প্রার্থনা কবুল হয়েছে।

(ঘ) আমাকে অধিক মাত্রায় গায়েবের সংবাদের নিদর্শন প্রদত্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার মোকাবিলা করতে পারে এমন কেউই নেই। রসূলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো জ্বলন্ত নিদর্শনের ন্যায় আমার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। এ সম্পর্কে খোদাতা'লার সাক্ষ্যসমূহ আমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে ঃ (পারসি)

ع - آسماں بارد نشاں الوقت می گوید زمیں -
ایں دو شاہد از پئے تصدیق من استادہ اند *

অনুবাদ ঃ "আকাশ (আমার দাবীর সমর্থনে) নিদর্শনের ধারা বর্ষণ করছে এবং পৃথিবীও তা ঘোষণা করছে যে, সে সময় সমাগত এবং এ দুই সাক্ষী আমার দাবীর সত্যতা ঘোষণা করছে।"

(৪) যদি কেউ এরূপ প্রশ্ন করে যে, (এ জামানায়) আমার বিচারক (হাকাম) হওয়ার প্রমাণ কি; তবে তার উত্তরে আমি বলব যে, যে যুগে ইমামের আগমন নির্ধারিত ছিল, সেই যুগে ক্রুশ সম্বন্ধীয় ভ্রান্তি অপনোদন করা বিচারকের তথা 'হাকামের' কর্তব্য বলে স্থির করা ছিল এবং সে জাতিও এখন বিদ্যমান রয়েছে এবং এ বিচারকের জন্য যে সব নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল তা-ও প্রকাশিত হয়ে গেছে। নিদর্শনের ধারা এখনও প্রবহমান। আসমান আপন নিদর্শন দেখাচ্ছে, জমীনও আপন নিদর্শন প্রকাশ করছে। ভাগ্যবান সে ব্যক্তি যার চক্ষু এ ব্যাপারে বন্ধ নহে।

–(জরুরতুল ইমাম-বাংলা অনুবাদঃ ৪৫পৃঃ)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত সৈয়্যদ আহমদ বেরেলভী (রাহ্ঃ)-এর খাস শাগরীদ এবং ঐ জামানাতে উপমহাদেশে ইসলামের একজন একনিষ্ঠ সেবক হযরত মৌলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেব লিখছেন ঃ

بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سستی
آجانے کے بعد مجدد ان سب امور دین کو زندہ اور
تازہ کر دیتا ہے - اور دین کی ساری نعمت مجدد کے
پاس موجود ہوتی ہیں - اور دین میں فتور
پڑھنے اور مجدد کے دین کو تازہ کرنے کے وقت میں
مجدد کے طریقے اس کے سوا جو طریقہ ہوگا وہ بیرا
ہوں اور جوگیوں اور فاسقوں اور بدعتیوں کا
طریقہ ہوگا - اس لئے ان کا طریقہ والا پھر کسی
دوسرے طریقے والے کا ہرگز محتاج نہیں ہوتا -
(ذخیرۂ کرامات حصہ اول - صفحہ ۱۵) —

অনুবাদ ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর দীন-ইসলামের মধ্যে যখনই ধর্মীয় ব্যাপারে কোন গ্লানি আসবে অর্থাৎ ভুল-ভ্রান্তি এবং গাফলতি পরিলক্ষিত হবে তখনই জামানার মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হয়ে, ঐসব ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে (বিদাত, বদরুসুমাদি) দূরীভূত করে দীন-ইসলামের সমুদয় রূহানী নেয়ামত একমাত্র জামানার (সংশ্লিষ্ট হিজরী শতাব্দীর) মোজাদ্দেদের কাছেই মজুদ থাকে। সুতরাং ধর্ম সংস্কারক হিসেবে মহান কাজে ব্যাপৃত মোজাদ্দেদের ডাকে সকলেরই সাড়া দেওয়া উচিত। কেননা, মোজাদ্দেদের আবির্ভাব হওয়া মাত্রই জামানার অন্য সব গদ্দিনেশীন পীর এবং বুযুর্গগণ দ্বারা পরিচালিত আপনাপন তরীকাসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাতেল বলে সাব্যস্ত হবে। এ কারণেই সমাগত মোজাদ্দেদের তরীকাভুক্ত কোন মুসলমান কখনও অন্য কোন প্রচলিত তরীকার মুখাপেক্ষী হবে না। –(জাখিরায়ে কেরামত-প্রথম খন্ডঃ ১৫ পৃঃ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার ইলহাম মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে ইমামুজ্জামান হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেনঃ "হে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী ! তোমরা শোন, আসমান ও জমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র ইহা একটি ফয়ছালা যে, তিনি আমার এ জামাতকে সমগ্র পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করবেন। যুক্তি ও দলিলের মাধ্যমে এ জামাত সকল জাতির মানুষের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। সে দিন অত্যাসন্ন বরং দ্বারদেশে উপস্থিত যখন পৃথিবীতে এ একটি মাত্র মাযহাব (ধর্ম) হবে, যাকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা হবে। এ মযহাব এবং সিলসিলাকে (সিলসিলায়ে আলীয়া আহমদীয়াকে) অস্বাভাবিকরূপে এবং অলৌকিকভাবে আশিসযুক্ত করবেন এবং যারা এ ইলাহি সিলাসিলাকে ধ্বংস করতে ইচ্ছুক, আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেককে ব্যর্থ ও নিষ্ফল করবেন এবং এ বিজয় চিরস্থায়ী হবে, এমনকি কেয়ামত এসে পড়বে।"

–(তাযকেরাতুশ-শাহাদাতাইন-১৯০৫ সনে প্রকাশিতঃ ৬৪ পৃঃ)

এক্ষেত্রে মিথ্যা দাবী করা মানে আগুন নিয়ে খেলা করা। মিথ্যাদাবী বিষপান তুল্য। কারণ, মিথ্যাবাদীর পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝

অনুবাদঃ "এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিতাম, অতঃপর আমরা তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া দিতাম, তখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহই তাঁহার (আমার আযাব) হইতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না'"– (সূরা আল্ হাক্কাঃ ৬৯ঃ৪৫–৪৮)।

এ আয়াতে করীমাতে আল্লাহ্‌তালা তাঁর একটি অলঙ্গনীয় সুন্নত বা নীতি ব্যক্ত করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এমন কোন কথার প্রচারণা চালায় যা করার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাকে বলেননি, তাহলে এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্

কঠোর শাস্তি প্রদান করেন এবং তার প্রচারিত মিথ্যা মতবাদকে জিল্লতির মাধ্যমে দুনিয়া হতে মুছে দেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে একমাত্র একজনই ছিলেন যিনি এলহামের মাধ্যমে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে একাধারে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ এবং ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করেন। তিনি হচ্ছেন হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)। জনসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে দাবী করার পর তাঁর উপর উপর্যুপরি ইলহাম নাযিল জারি ছিল। তাঁর প্রাপ্ত ইলহামসমূহের মধ্যে একটি ইলহাম ছিল, যাতে তাঁকে আল্লাহ্‌তা'লা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বিরুদ্ধবাদীদের কেউই, তোমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা (খাসভাবে) তোমার রক্ষক। যথা ঃ

يَعْصِمُكَ اللّٰهُ مِنْ عِنْدِهٖ وَاِنْ لَّمْ يَعْصِمْكَ النَّاسُ ۔

—(تذكره)

অর্থাৎ "লোকে যদি তোমাকে রক্ষা না-ও করে তবে আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করবেন এবং কোন ব্যক্তিই তোমাকে হত্যা করতে সমর্থ হবে না।"

এ ইলহামটি নাযিল হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করলেন যে, শত শত পর্বতসম বিঘ্নের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আমার মিশন দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে এবং অজস্র কুফরী ফতওয়া, অত্যাচার, বয়কট অতিক্রম করলেও আমার জামাতের অগ্রগতি ব্যাহত হবে না। কারণ, সর্বাবস্থায় এবং যে কোন জটিল পরিস্থিতির মোকাবেলায় আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এবং আমার জামাতকে নিরাপত্তা দেবেন। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা সুস্পষ্ট ভাষায় আমাকে ইহাও জ্ঞাত করেছেনঃ

اِنِّىْ مُهِيْنٌ مَّنْ اَرَادَ اِهَانَتَكَ وَاِنِّىْ مُعِيْنٌ مَّنْ اَرَادَ اِعَانَتَكَ ۔

—(تذكره)

অর্থাৎ "যে কেহ তোমার খেয়ানত করতে প্রচেষ্টা চালাবে আমি (আল্লাহ্) তাকে অপমানিত করব এবং যে কেহ তোমাকে সাহায্য করবে, আমি তাকে সাহায্য করব।"

হযরত আহমদ (আঃ)-এর এরূপ সাহসিকতাপূর্ণ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বিরুদ্ধবাদীরা তদানীন্তন বৃটিশ শাসিত (ব্রহ্মদেশ ও সিংহলসহ)- বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সব এলাকাতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁকে হত্যা করে তৎপ্রতিষ্ঠিত সিলসিলায়ে আলীয়া আহমদীয়ার মিশনকে দুনিয়া হতে মুছে দেওয়ার জন্য অব্যাহত গতিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। এমনকি তদানীন্তন খৃষ্টান এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হোমড়া-চোমড়াদের যোগসাজসে মির্যা সাহেব (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এক খুনের মিথ্যা মোকদ্দমাও করা হলো। পবিত্র মক্কা ও মদীনার আলেমগণ হতে হত্যা করে দেওয়ার ফতওয়া আনিয়েও তোড় জোরে প্রচার করা হলো। কিন্তু সব ষড়যন্ত্রই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা এরশাদ করেছেন ঃ

وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى অর্থাৎ "যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র প্রতি) মিথ্যা আরোপ করিয়াছে সে সর্বদা বিফলই হইয়াছে" (২০ঃ৬২)। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, অন্য কোন দুনিয়াবী সাধারণ ব্যাপারে মিথ্যা বলা আর আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রটনার অপরাধ 'একই পর্যায়ের অপরাধ নয়'। বস্তুতপক্ষে মিথ্যা ওহী ইলহামের দাবী খাড়া করে জঘন্য আস্ফালন দ্বারা এ জগতে কেউ কখনও তিষ্ঠিতে পারেনি-পারবেও না।

এ বিষয়ে উল্লেখ্যঃ

(ক) হানাফী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আকায়েদের কেতাব 'শরাহ্ আকায়েদে নাসফীর' ১০০ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, "মানুষের আকল কোন প্রকারেই ইহা গ্রহণ করতে পারে না যে, ওহী এলহামের মিথ্যা দাবী করে কোন ব্যক্তি ২৩ বৎসর আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারে। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই কতল হয়ে যাবে।"

(খ) প্রখ্যাত মোফাস্‌সেরে কেরআন আল্লামা জামাখশরীও (রাহঃ) উপরোক্ত অভিমতের সমর্থন করেছেন। যথাঃ 'কাদখাবা মানিফতারা' এই আয়াতে করীমার অর্থ হচ্ছে, যদি কোন দাবীকারক আল্লাহ্‌র উপরে মিথ্যা আরোপ করে তাহলে কোন বাদশাহের উপর মিথ্যা অপবাদ আনয়নকারীকে যেভাবে কতল করে দেওয়া হয় (মৃত্যুদন্ড হয়) ঠিক তদনুরূপ আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপকারী মিথ্যা দাবীকারককে আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিশোধ নেবেন, এবং অবশ্যই তাকে কতল করে দেওয়া হবে।

–(তফসীরে কাশ্‌শাফ-কলিকাতা মুদ্রিতঃ ১৫২ পৃঃ)

সুতরাং মির্যা সাহেব (আঃ) মূলতঃ 'মামুর মিনাল্লাহ্' তথা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কিনা পবিত্র কোরআনের আলোকে তা যাচাই করে দেখাই হবে প্রকৃত সত্যান্বেষীগণের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কারণ, তাঁর দাবী যদি মিথ্যা হয় তবে 'কাদখাবা মানিফতারা' মোতাবেক মির্যা সাহেবের ধ্বংসপ্রাপ্তির ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিশন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ারই কথা।

পক্ষান্তরে তাঁর দাবী যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে দুনিয়ার বুকে তাঁর মিশন অক্ষুণ্ন, অটুট এবং প্রগতিশীল কিনা এবং মোখালেফাতের প্রবল ঝড়-তুফানের সম্মুখীন হয়েও প্রতিটি উদীয়মান সূর্যকে সাক্ষ্য রেখে তাঁর জামাতের অগ্রগতি অব্যাহত গতিতে ধাবমান কিনা তা অনুসন্ধান করে সত্য যাচাই করাই হবে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুগণের একমাত্র কর্তব্য।

স্বতন্ত্র জামা'ত কেন ?

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) দুনিয়ার যাবতীয় মুসলিম ফেরকা বা দল-উপদলসমূহ হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে একটি 'স্বতন্ত্র জামাতের ' সংগঠন কেন করলেন তা-ও একটি বিচার্য বিষয়। অনেকে এ যুক্তিও প্রদর্শন করে থাকেন যে, সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজ যেখানে দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, এমতাবস্থায় এমনিতেই তারা দলীয় কোন্দলের শিকার। তদুপরি 'আহমদীয়া জামাত' নামক আরও একটি নতুন

ফেরকা সৃষ্টি করে, দল উপদলের মধ্যে সদা বিরাজিত কলহ কোন্দল হ্রাস করার ব্যবস্থা না করে বরং বৃদ্ধিই বা কেন করা হলো?

এ প্রশ্নের উত্তর দুই ভাবেই দেওয়া যেতে পারেঃ

(১) যুক্তির মাধ্যমে

(২) আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে

যুক্তির দিক দিয়ে বলতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম সংহতি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কারণ, মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের বলে বলীয়ান 'কাবেলে এতায়াত' কোন বিশ্ব বরেণ্য নেতা বা খেলাফত নেই। মুসলমানদের বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে এবং মুসলমানদের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত ঘটলে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে মুসলিম সংঘবদ্ধতা বা মুসলিম সংহতিকে অক্ষুণ্ন রাখার মত এমন কোন মজবুত মুসলিম সংস্থা বা নেতার অস্তিত্ব নেই।

সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তেজিত জনসমাবেশের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কোন সংহতি কায়েম হয় না। কেননা, এ ধরনের জনসমাবেশ লাগামহীন ও পরমুহূর্তে নীতিচ্যুত হয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরকম কোন কিছুকে জামাত নামে আখ্যায়িত করা যায় না। বরং জামাত বলতে ঐরূপ এক সংস্থাকেই বুঝায়, যার সদস্যগণ ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ঐশী সম্পর্কযুক্ত কাবেলে এতায়াত আন্তর্জাতিক ইমামের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধভাবে সুসংহত অবস্থায় বসবাস করেন এবং যারা ঐশী কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নীতিগত ঐক্যসহ সারা বিশ্ব মুসলিমের জন্য সমভাবে একটি সাধারণ কার্যসূচীসহ একতাবদ্ধ আছেন। বর্তমানে দুনিয়াতে প্রায় ১০০ কোটি মুসলমান বিদ্যমান আছে। কিন্তু তারা জামাতভুক্ত নন বরং প্রত্যেকটি মুসলমানই ব্যক্তি হিসেবে স্বতন্ত্র। একজন ভারতীয় মুসলমান স্বতন্ত্র। একজন ইন্দোনেশীয়ান মুসলমান স্বতন্ত্র। একজন হানাফী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানও স্বতন্ত্র।

পবিত্র কোরআনের শিক্ষাঃ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

অর্থাৎ "এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর আর তোমরা পরস্পর বিভক্ত হইও না" (৩ঃ১০৪), মোতাবেক ঐশী সম্পর্কযুক্ত একজন কাবেলে এতায়াত নেতা অর্থাৎ খলীফার নেতৃত্বের রজ্জুকে * আঁকড়ে একত্রিত থাকারঅবস্থায় নেই। আর বিচ্ছিন্নতারূপ মানসিক রোগ থেকে মুক্তিলাভ করার কোন পথও খোলা নেই। তারা এমন মনোভাবাপন্ন অবস্থায় পৌছুতে সমর্থ নহে যে, সে একথা বলতে উৎফুল্ল হবে যে, আমি ভারতীয়, ইন্দোনেশীয়ান, হানাফী বা শিয়া মুসলমান নই। বরং সমন্বিত কর্মসূচী প্রণয়নকারী ঐশী মদদপুষ্ট একজন মুসলিম নেতার নেতৃত্বাধীন একজন উম্মতে মোহাম্মাদীয়া মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কোন জামাত না থাকার কারণেই দুনিয়ার

* টীকা ঃ আল্লাহ্‌র 'রুজু' বলতে এখানে একমাত্র খেলাফতকেই' বুঝায়, যার সম্পর্কে সূরা নূরের নবম রুকূতে মোমেনদের সঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মুসলিম সম্প্রদায় একতাবদ্ধ নহে।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَّ لَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ وَّلَا اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ۔

অর্থাৎ "জামা'ত ভিন্ন ইসলাম নেই। আমীর বা ইমাম ব্যতিরেকে কোন জামাত নেই এবং আনুগত্য ব্যতিরেকে কোন ইমাম নেই।" –(জামে ইবনে আবদুল বিরঃ ৬ পৃঃ)

হুযূর (সাঃ)-এর এ হাদীসের আলোকে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সমবেত সিদ্ধান্ত এবং সাধারণ কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত এক নেতা (ঐশী সাহায্যপুষ্ট নেতার) নেতৃত্বাধীনে জামাত গঠন করলে ৫/৭ জন লোক দ্বারাও 'একটি জামাত' হতে পারে। তাতে সংখ্যা, সংখ্যাধিক্য কিংবা জনবহুলতার কোন প্রশ্ন নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করাযায় যে, আঁঃ হযরত (সাঃ)-এর মহান নবুওয়তের প্রথম দিন যে ইসলামী জামাত সংগঠন করা হয়েছিল এ সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ জন। দুনিয়ার এই প্রথম ইসলামী জামাতটির নেতা স্বয়ং হুযূর (সাঃ) ছিলেন। পক্ষান্তরে, তদানীন্তন সমগ্র জজিরাতুল আরবের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্তি একই নেতার নিয়ন্ত্রণাধীন সংঘবদ্ধ কোন জামাত ছিল না।

সুতরাং এসব দিক বিবেচনা করলে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, চতুর্দশ-শত হিজরীতে এসে মুসলমানদের মধ্যে কোন জামাতই ছিল না। বিশ্বের মুসলিম চিন্তাবিদ এতদ্বিষয়ে পেরেশান ছিলেন এবং তাঁদের দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজে তখন এক শোচনীয় মহাশূন্যতা বিরাজ করছিল। ইসলামকে হেফাযতের জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব যোগ্যতম নেতার আবির্ভাবের জন্য ইসলামদরদীগণের উৎকণ্ঠা দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। চিন্তাবিদদের অন্তর হতে অহরহ এরূপ হা-হুতাশের প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁরা বলতেছিলেনঃ-"মুসলমানী দার কেতাব অ মুসলমানাঁ দার গোর" অর্থাৎ

ইসলাম হয়েছে শুধু কিতাবের বুলি,
মুসলমান গেছে সব কবরেতে চলি।

সুতরাং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইসলামের মূল কান্ড হতে পৃথক হয়ে দল বা জামাত গঠন করেননি বরং ইসলামের মূল কান্ডকে মজবুত করার জন্যই যা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল তাই করেছেন। একজন আধ্যাত্মিক নেতার অনুসারী একটি 'জামাত' গঠন করেছেন মাত্র।

বস্তুতপক্ষে আলমে ইসলামে যখন জামাতের কোন অস্তিত্বই ছিল না, তখনই জামাত গঠন করে শূন্যস্থানকে পূর্ণ করাই ছিল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাঁর এ কার্যক্রম ছিল সম্পূর্ণরূপে ঐশী সংকেতপ্রসূত।

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে আরও অধিকতর আলোকপাত করবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত কবি ও দার্শনিকগণের উক্তিসমূহের কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হলঃ

(১) মিশরের প্রাক্তন মুফতী মোহাম্মদ আবদুহু এ জামানার মুসলমানদের চরম অধঃপতন সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

إنّ جاهلية اليوم أشدّ من الجاهلية في زمن

النبيّ صلّى الله عليه وسلّم -

—(المنار جلد ا ص ۲۷)

অর্থাৎ রসূলে করীম (সাঃ)-এর জামানায় আরবগণ যেভাবে শোচনীয় জাহেলিয়তের কবলে নিপতিত ছিল, ঠিক তদনুরূপই পথভ্রষ্ট ও ইসলামী আদর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান যুগের মুসলমানর ও হুবহু জাহেলিয়তের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়ে পড়েছে।

—(তফসীরে আল্ মানার প্রথম জিল্দ-মিশরে মুদ্রিত ঃ ২৭পৃঃ)

(২) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবও বর্তমান যুগের মুসলমানদের অধঃপতন সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেছেনঃ

جو تاریکی چھٹی صدی عیسوی میں جہالت نے
پھیلائی جبکہ اسلام کا ظہور ہوا - ویسی ہی تاریکی
آج تہذیب اور تمدن کے نام سے پھیلی ہوئی ہے -
جبکہ اسلام اپنی غربت اولی میں مبتلا ہے اور
شیطان کی تخت اسی عظمت اور دبدبہ سے کبھی زمین
کی سطح پر نہ بچھایا گیا تھا جیسا کہ اب قائم و مسلط ہے -
—(الہلال جلد ۴ - ص ۱۰۳)

অনুবাদঃ খৃষ্টিয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাথমিক অবস্থায় জাহেলিয়তের যে চরম অন্ধকার বিরাজমান ছিল বর্তমান যুগেও তাহযিব এবং তমদ্দুনের নামে মুসলিম সমাজে অনুরূপ জাহেলিয়তই প্রসার লাভ করেছে-----------।

তিনি আরও বলেনঃ শয়তানের সিংহাসনটি বর্তমান যুগে এমনই আযমত এবং দব্‌দবার সহিত প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে যে, ইতিপূর্বে আর কোন জামানাতেই এহেন জাঁকজমকের সহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

—(আল্ হেলাল, চতুর্থ জিল্দ-বোম্বে মুদ্রিতঃ ১০৩ পৃঃ)

(৩) এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মৌলানা নূরুল হাসান সাহেব ভূপালভী বিগত ১২৭৯ হিজরীতে তৎপ্রণীত বিখ্যাত কেতাব 'একতেরা বুস্‌সায়াত' এর ১২ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

"এখন প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মাত্র নাম এবং কোরআনের মাত্র অক্ষর অবশিষ্ট আছে। মসজিদগুলো বাহ্যিকভাবে আবাদ কিন্তু একেবারে হেদায়াতশূন্য। বর্তমান যুগের এ উম্মতের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল জীব থেকে নিকৃষ্টতম।"

(৩ক) মুসলমান জাতি জামাতহীন নেতাহীন হওয়ার কারণে ইসলামের অস্তিত্ব বিপন্ন এবং সর্বতোভাবে মুলমানরা কোণঠাঁসা হয়ে পড়েছে তা স্বীকার করতে যেয়ে "একতেরা বুস্‌সায়াতেরই" ৫৬ পৃষ্ঠায় তিনি বলেনঃ

غربت اسلام اور قرب قیامت کا زمانہ ہے۔
اس وقت نہ کوئی جماعت مسلمین ہے۔ اور نہ کوئی
امام۔ کنارہ کشی کا زمانہ ہے۔
(اقتراب الساعۃ ص ۵۶)

অনুবাদঃ "ইহা ইসলামের জন্য দারিদ্রের যুগ ও কেয়ামতের সন্নিহিত জামানা। মুসলমানদের এখন না আছে কোন জামাত, না আছে কোন ইমাম। এটা হচ্ছে মুসলমানদের জন্য এক কিনারা কাশির (কোণাঠাঁসা থাকার) জামানা।"

(৪) উপমহাদেশের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব 'সম্বর্দ্ধনা' গ্রন্থে লিখছেন ঃ

"ইসলাম আজ যে রূপ নিয়েছে তা-ও একটা বাঁধন বৈ কি? অর্থ বুঝা নেই, কেবল শব্দের আবৃত্তি; অনুষ্ঠান আছে, নাই তার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য; বাহ্যিকতা আছে, নাই (তাতে) আন্তরিকতা। এসব ভন্ডামি, এর চেয়ে সাফ নাস্তিক হওয়া ভাল।"

(৫) পাক ভারত উপমহাদেশের স্বনামধন্য কবি মৌলানা আলতাফ হুসেন হালি সাহেবও 'মুসাদ্দাসে হালিতে' মুসলমানদের দুরবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে তাঁর কবিতার মাধ্যমে অনুশোচনার সুরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে গেছেন ঃ

ع۔ شور ہے ہوگئے مسلماں نابود۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلماں سرجود؟
(مسدس حالی)

(ক) (এরূপ) "হাহাকার রব শুনা যায় যে, মুসলমান নাবুদ বা ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি বলছি (এখানে) কোনদিন কি মুসলমানদের অস্তিত্ব বলতে কিছু বিদ্যমান ছিল?"

(খ) তিনি আরও বলেন ঃ

ع — رہا دین باقی نہ اسلام باقی —
فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی —

অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতাতেও উপরোক্ত উচ্ছ্বাসই বিরাজমান যথাঃ

"ধর্মও অবশিষ্ট নেই, ইসলামও অবশিষ্ট নেই.
কেবল ইসলামের নামটিই বাকী রয়েছে।"

(৬) প্রখ্যাত কবি ও দার্শনিক আল্লামা একবাল তাঁর শেক্‌ওয়া' নামক মরসিয়ার মাধ্যমে অনুশোচনার সুরে ব্যক্ত করেছেনঃ

ع — وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود
یہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود —
— ('شکوہ' علامہ اقبال)

অনুবাদঃ "বেশভূষাতে তোমরা খৃষ্টান
সভ্যতাতে হও হনুদ
এইত মুসলিম দেখতে যারে
লজ্জা আজি পায় এহুদ"

(৭) বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামও লিখেছেনঃ
"বাহিরের দিকে মরিয়াছি যত, ভিতরের দিকে তত,
গণতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু ছাগলের মত"

অনেকে এমনও বলে থাকেন যে, অন্য কোথাও না থাকলেও অন্ততঃ পবিত্র আরব ভূমিতে খাঁটি ইসলাম বিদ্যমান রয়েছে। এ কথার উত্তরে কবি নজরুল দুঃখ করে অনুশোচনার সুরে বলেনঃ

"খালেদ! জজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি
পলিদ হলো, খুলেছে সেখানে ইউরোপ, 'পাপের ভাটি'

বর্তমান যুগের কবি, প্রখ্যাত মনীষী এবং চিন্তাবিদদের এসব 'মরসিয়া' এবং 'লেখনীতে' প্রকৃতই ইসলামের শোচনীয় অবনতির চিত্রই ফুটে উঠেছে। ইসলামদরদী মাত্রই স্পষ্টতঃ অনুভব করবেন যে, এ জামানায় পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ — (روم ۴۲)

অর্থাৎ 'জল-স্থল সবই সম্পূর্ণরূপে কলুষিত হয়ে গেছে'। সুতরাং 'ঐশী সাহায্য তথা ঐশী ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে মানব জাতির উদ্ধারের আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই।

স্বতন্ত্র জামা'ত কেন ?

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর উত্তর ঃ

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আখেরী জামানা সম্পর্কে আঁঃ হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর দিকেই আমাদের দৃকপাত করতে হবে। মিশকাত শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

عن عبد الله ابن عمر (رضى الله عنه) - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ليأتين على أمتى كما اتى على بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل (وفى رواية شبرا بشبر) حتى ان كان منهم من اتى أمه علانية لكان فى امتى من يصنع ذالك - وان بنى اسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق امتى على ثلث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة - رواه ترمزى -

(مشكوة كتاب الايمان ص ٣٠)

(অনুবাদ) এমন এক জামানা আসবে যখন মুসলমান জাতি বহু দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (মত বিরোধের কারণে) যে ভাবে ইহুদীগণ ৭২টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল আমার উম্মতের লোকেরাও তদনুরূপ বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে ৭২ এর স্থলে ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। এসব দলের মধ্যে একটি দল ব্যতিরেকে বাকী সব দল হয়ে যাবে আগুনের অধিবাসী। —(কিতাবুল ঈমান-মিশকাতঃ ৩০ পৃঃ)

উপস্থিত সাহাবা কেরাম (রাঃ) তখন প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ একটি মাত্র বেহেশ্‌তি দলের লক্ষণ কি হবে? হুযূর (সাঃ) উত্তরে এরশাদ করলেন ঃ

"اَلَا وَهِيَ الْجَمَاعَةُ" وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

(ترمزی شریف) -

অর্থাৎ এর বড় লক্ষণই হবে যে, সেটা একটা 'জামাত' হবে। আর জামাতের উপরেই আল্লাহ্‌র হাত (তথা ঐশী সাহায্য) থাকবে।

হুযূর (সাঃ) আরও এরশাদ করলেন ঃ

تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা মুসলমানদের ঐ জামাতভুক্ত হবে যাদের একই ইমাম হবে' এবং হুযূর (সাঃ) ইহাও এরশাদ করলেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً

الْجَاهِلِيَّةِ -

জামানার ইমামের বয়াত গ্রহণ না করে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু জাহেলিয়তের মৃত্যু হবে। -(মিশকাত)

উপরোক্ত হাদীসের সাথে, কোরআন শরীফের 'সূরা নূরের' আয়াতে এস্তেখলাফে আল্লাহ্‌র ওয়াদা ঃ

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِهِمْ - اِلٰى اٰخِرِهٖ —(سورة النور - ع ٩)

অর্থাৎ **সৎকর্মশীল ঈমানদারগণের মধ্যে আল্লাহ্ খেলাফত কায়েম রাখবেন** মিলিয়ে দেখলে, ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, খাঁটি ঈমানদারগণের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং মদদপ্রাপ্ত একজন ইমাম অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে এবং প্রত্যেক মুসলমানকে জামানার ইমামের হাতে বয়াত করতে হবে।

সুতরাং প্রণিধানযোগ্য যে, ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ-কর্তৃক মনোনীত যুগ-ইমামের বয়াত গ্রহণ করে বয়াতকারী মুসলমানগণ দ্বারা একই রূহানী ইমামের নেতৃত্বাধীন যে 'জামাত' সংগঠিত হয়, ইসলামী পরিভাষায় উহাকেই 'জামাত' বলা হয়।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ - وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا

إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ - — (جامع ابن عبد البر ج ١)

অর্থাৎ "জামাত ভিন্ন কোন ইসলাম নেই, আমীর বা ইমাম ব্যতিরেকে কোন জামাত নেই এবং আনুগত্য ব্যতিরেকে কোন আমীর বা ইমাম নেই।"

হুযূর (সাঃ)-এর উপরোক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে এযুগে একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদই (আঃ) ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ হতে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে 'শতাব্দীর মোজাদ্দেদ' এবং 'ইমাম মাহদী' হওয়ার দাবী করেন এবং 'সিলসিলায়ে আলিয়া আহমদীয়া' বা আহ্মদীয়া 'জামাত' প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একমাত্র ইহাকেই 'জামাত' আখ্যা দেওয়া যথার্থ।

জামা'তের নাম ঃ

কেহ কেহ এরূপ প্রশ্নও উত্থাপন করে থাকেন যে, জামাতটির নাম 'আহমদীয়া' জামাত কেন? এর উত্তর হচ্ছে যে, এ নামটি প্রকৃতপক্ষে কোন খেয়ালী বা কষ্ট-কল্পনাপ্রসূত নহে। বরং এরূপ নামকরণের পেছনে মহান ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং তথ্যাবলী বিরাজমান রয়েছে। বিগত শতাব্দীসমূহে যেসব বুযুর্গানে দীন গুজরে গেছেন তাঁদের রূহানী অভিজ্ঞানপ্রসূত অভিমতের সমর্থনে এবং এ বিষয়ে তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীর ফলশ্রুতিতেই আখেরী জামানাতে মুসলমানদের এ জামাতকে আহমদীয়া জামাত বা 'জামাতে আহমদীয়া' নাম দেওয়া হয়েছে।

(ক) ১৯০০ সনের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বিবৃতি দিয়েছিলেন, "আমাদ্বারা সংগঠিত ফেরকার নাম **'মুসলমান ফেরকায়ে আহমদীয়া'** এজন্যই রাখা হয়েছে যে, আমাদে নবী করীম (সাঃ)-এর দু'টি প্রধান-নাম ছিল। যথাঃ (১) মোহাম্মদ (সাঃ) এবং (২) আহ্মদ (সাঃ)। মোহাম্মদ নামটি ছিল 'জালালি' অর্থাৎ শক্তির বিকাশক এবং এ নামের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণীই নিহিত ছিল যে, যে সমুদয় শত্রু তরবারির মাধ্যমে ইসলামের উপর হামলা চালিয়েছিল এবং শত শত নিরীহ মুসলমান নর-নারীর উপর অমানুষিক অত্যাচার আর অকথ্য নিপীড়ন চালিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, তাদেরকে তরবারি দ্বারাই শাস্তি প্রদান করবেন। কিন্তু 'জালালি" নামের সঙ্গে যুগপৎ "জামালি" নাম অর্থাৎ 'আহমদ' নামটিও সৌন্দর্য বিকাশক হিসেবে নির্দ্ধারিত ছিল। এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে যে, ধর্ম নিয়ে জবরদস্তি তথা যুলুম অত্যাচারের পন্থা সম্পূর্ণরূপে রোধ করবেন এবং বাধ্যবাধকতার বদলে শান্তি, সৌহার্দ্য, প্রেম, পরস্পর হুসনে সুলুক এবং মমত্ববোধের মাধ্যমে দীনকে কায়েম করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

আঁঃ হযরত (সাঃ)-এর পূত ও পবিত্র জীবনে এ দু'টি নামের গুণাবলী বিকশিত হয়েছিল। আঁঃ হযরত (সাঃ)-এর মক্কী জিন্দেগী ছিল সম্পূর্ণরূপে ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশক অর্থাৎ ইসমে 'আহমদ' নামের বিকাশস্থল, যার মধ্যে সর্বাঙ্গীন ধৈর্য এবং সহনশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের শিক্ষাই বিদ্যমান ছিল।

পরবর্তীকালে হুযূর (সাঃ)-এর মদনী জিন্দেগীতে ইসমে 'মোহাম্মদ'-এর বিকাশক জালালি গুঁণরাজির পূর্ণবিকাশ ঘটল। এখানে আল্লাহ্‌তা'লার এক মহান 'হেকমত' এবং 'মসলেহাত' অনুযায়ী এ জালালি সিফাতের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের নির্মূল করার মহান কার্য সম্পন্ন হয়েছিল।

আখেরী জামানাতে, পুনরায় আঁঃ হযরত (সাঃ)-এর দ্বিতীয় নাম 'আহমদ'-এর গুণাবলীর আন্তর্জাতিক বিকাশ ঘটবার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এবং তাঁরই অনুসারীগণের মধ্যে এমন এক রূহানী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যাঁর রূহানী মর্যাদা ও গুণরাজির মাধ্যমে 'আহমদী' অর্থাৎ জামালি তথা সৌন্দর্য বিকাশক সিফাতের পূর্ণবিকাশ ঘটবে। তিনি ধর্ম প্রচারের ময়দানে এমনই এক শান্তিময় সুশৃঙ্খল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হবেন যে, অতঃপর ধর্ম নিয়ে দুনিয়াতে আর কোন হানাহানির প্রয়োজন পরিলক্ষিত হবে না। ধর্মীয় ব্যাপারে অস্ত্রযুদ্ধের চির অবসান ঘটবে। এ প্রেক্ষিতেই জামাতের নাম 'ফেরকায়ে জামাতে আহমদীয়া' করা সমীচীন বলে বিবেচনা করা হলো।

(খ) ফেরকার নামকরণ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেছেন যে, আখেরী জামানাতে বিশ্বের মুসলিম সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে কেহ নিজকে 'হানাফী' কেহ 'শাফেয়ী' কেহ 'মালেকী' কেহ 'শিয়া' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচয় দিতেছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে একটা বেদাত পদ্ধতি। কারণ, রসূলে করীম (সাঃ)-এর মাত্র দু'টো প্রধান নামই ছিল। একটি মোহাম্মদ (সাঃ) অপরটি আহমদ (সাঃ) * এখানে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্‌র ইসমে আযম বা সর্বশ্রেষ্ঠ নাম হচ্ছে 'আল্লাহ্'। ঠিক তদনুরূপই আঁঃ হযরত (সাঃ)-এর নামের মধ্যেও 'মোহাম্মদ' নামটি হলো তাঁর 'ইসমে আযম'। আল্লাহ্‌র নামের মধ্যে যেরূপ হাইউন, কাইয়ুম, রহমান ও রহীম ইত্যাদি গুণবাচক নামসমূহ রয়েছে ঠিক তদনুরূপ রসূলে করীম (সাঃ)-এর গুণবাচক নাম 'আহমদ' (প্রসংশাকারী) রয়েছে তাঁর 'মুহাম্মদ' নামের মধ্যেই।

হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) অন্য এক জায়গায় "জালালি" এবং "জামালি" নামের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন 'মোহাম্মদ' নামটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো 'শানে মাহবুবিয়ত' অর্থাৎ গৌরবময় ঐশী প্রেমের পরাকাষ্ঠা সমেত আল্লাহ্‌র মহিমা এবং অদ্বিতীয় মহাশক্তির বিকাশক। কারণ, মোহাম্মদ অর্থ 'সদাপ্রশংসিত ব্যক্তি' সুতরাং ইহা

---

* টীকাঃ সুতরাং হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর এ দু'টি নামের সামঞ্জস্য রেখেই নিজকে মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়া সঙ্গত হবে। অন্য নামে নহে। – গ্রন্থকার

প্রকৃত প্রেমাস্পদে গুণরাজীর বিকাশক এবং জামাল হলো তাঁরই মাধ্যমে ঐশী সৌন্দর্য প্রকাশের এক অপরিহার্য অবস্থা। 'আহমদ' নামের প্রকৃত তাৎপর্য হল, এই নামের মাধ্যমে শানে আশেকিয়তের প্রকাশ অর্থাৎ অকৃত্রিম নির্ভেজাল ইসলাম প্রেম এবং আল্লাহ্‌র প্রেমের গৌরব প্রকাশক। 'আহমদ' নামের আশকানা সিফাতসমূহের দ্বারা বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য, ক্ষমা এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের সমাবেশ বুঝায়।

সুতরাং মোহাম্মদ নামের অভ্যন্তরে সুপ্ত ছিল ----- 'জালালি' কৈফিয়ত। কেননা, সর্বাঙ্গীণরূপে প্রশংসিত হওয়ার জন্য তদীয় চরিত্রে এস্তেগনা (স্বয়ংসম্পূর্ণতা) গুণের সমাহার একান্ত অনিবার্য ছিল। আর 'আহমদ' নামের মধ্যে সুপ্ত ছিল 'جلالی' 'আশেকানা ওয়াসফ'। এ জন্য ইহা হবে জামালি রঙ্গের বুরুয সদৃশ।

–(আল্ হাকামঃ ২৩শে আগষ্ট, ১৯০১, খৃষ্টাব্দ)

১৯০১ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তদানীন্তন বৃটিশ শাসিত পাক-ভারত উপমহাদেশের আদমশুমারী কার্যক্রম আরম্ভ হয়। ঐ সময়কার সরকারের নির্দ্ধারিত আদমশুমারী ফরম পূরণ করার সময় 'ফেরকার নাম' নামক একটি কলাম পূরণ করারও নির্দেশ ছিল। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর প্রতিষ্ঠিত সিলসিলাভুক্ত আহমদীগণকে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, আমার জামাতভুক্ত সদস্যগণকে 'মুসলমান ফেরকায়ে আহমদীয়া' নামে আখ্যায়িত হওয়াই আমি পসন্দ করি। এ জামাতকে 'আহমদীয়া মাযহাবের মুসলমান' হিসেবে সম্বোধন করাকেও আমি বৈধ বলে বিবেচনা করি। – (ইস্তেহারঃ ৪ঠা নভেম্বর, ১৯০০সন)

ইহা অতীব আশ্চর্যের ব্যাপার যে, অতীতে এ উম্মতের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বুযুর্গানে দীন তাঁদের প্রণীত কেতাবসমূহে চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমনকারী ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামাতের নাম 'আহমদীয়া' জামাত নামকরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। যথাঃ

(১) একাদশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রাহঃ) -এর আরবী ও পারসি ভাষায় প্রণীত "মাবদায়া ওয়া মায়াদ" নামক পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠায় তাঁর উপর নাযিলকৃত আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ ইলহামের উল্লেখ করে তিনি লিখছেনঃ

وَاَقُولُ قَوْلاً عَجِيبًا لَمْ يَسْمَعْهُ اَحَدٌ وَمَا اَخْبَرَ بِهٖ مُخْبِرٌ

بِاِعْلَامِ اللهِ تَعَالٰى وَاِيَّاىَ وَبِفَضْلِهٖ وَكَرَمِهٖ -

آنکه بعد از هزار وچند سال از زمان رحلت آں
سرور علیه وآله الصلوات والتحیات زمانے مے آید
که حقیقت محمدی (ص) از مقام خود عروج فرماید

و بہ مقام حقیقت کعبہ متحد گردد - در این زمان حقیقت محمدی (ص) حقیقت احمدی نام باید و مظہر ذات احد جلّ سبحانہ گردد ٥

(رسالہ مبدء و معاد ص ۵۸)

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ ফযলে আমি এমনই একটা আশ্চর্য কথার বর্ণনা দিচ্ছি যা আজ পর্যন্ত কেউ কোনদিন শুনেনি আর অদ্যাবধি কোন খবর পরিবেশনকারীও এ রকম কোন খবর পরিবেশন করেননি। ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ আমাকে নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে জ্ঞানদান করেছেন যা আমার উপর তাঁর অপার অনুগ্রহ ও করুণার মাধ্যমে আমি অবগত করতেছি। খবরটি হচ্ছে "আঁঃ হযরত (সাঃ)-এর অন্তর্ধানের এক সহস্র কয়েক বৎসর পরে এরূপ এক জমানা আসবে যখন হাকিকতে মোহাম্মদী হাকিকতে কাবার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে এবং ঐ জামানাতে 'হাকিকতে মোহাম্মদী' 'হাকিকতে আহমদী' নাম ধারণ করে এবং একমাত্র হাকিকত আহমদীই সিফতে আহাদের অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদ গুণের বিকাশস্থল রূপে গণ্য হবে।"

(২) হানাফী সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত ইমাম হযরত মোল্লা আলী কারী (রাহঃ) (মৃত্যু ১০১৪ হিজরী সন) মিশকাত শরীফের শরাহ 'মিরকাতের' প্রথম জিলদ ২৪৮ পৃষ্ঠায় চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ এবং ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত জামাতের নাম 'পবিত্র জামাতে আহমদীয়া' হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেনঃ

فَتِلْكَ اثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ -

وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

وَالطَّرِيْقَةِ النَّقِيَّةِ الْاَحْمَدِيَّةِ ٥

(مرقاة جلد ۱ - ص ۲۴۸)—

অনুবাদঃ আখেরী জামানাতে উম্মতে মুসলেমার ৭৩ ফেরকার মধ্যে আহলে সুন্নত জামাতের একমাত্র ঐ একটি ফেরকাই নাজাত-প্রাপ্ত দল হবে যা 'পবিত্র তরিকায়ে আহমদীয়ার' উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আর বাকী সবাই অগ্নিবাসী বলে গণ্য হবে।

(৩) দিল্লীর অধিবাসী প্রসিদ্ধ মুলহাম বুযুর্গ হযরত শাহ্‌ নিয়ামতুল্লাহ্‌ অলী সাহেব (রাহঃ) পারসি ভাষায় রচিত তাঁর এক কবিতায় মাহদীয়ে আখেরুজ্জামানের লক্ষণাবলী সম্পর্কে নিম্নলিখিত ছন্দটি লিখে গেছেন ঃ

احمد می دانم - نام آں نامدار می بینم -
مہدی وقت و عیسئ دوراں -
ہر دو را شہسوار می بینم ○

অর্থাৎ সেই প্রতিশ্রুত পুরুষের নাম রসূলে করীম (সাঃ)-এর নাম সদৃশ আলিফ হে মীম দাল-এক কথায় আহমদ হবে। তিনি মাহদী হবেন যুগের ঈসা (আঃ)ও হবেন। একাধারে তিনি মসীহ্ এবং মাহদী উভয় চরিত্রেরই বিকাশস্থল হবেন।

(৪) একটি হাদীসেও 'আহমদ' নামেরই উল্লেখ পাওয়া যায়।

যথাঃ

فَإِنَّهُ الْمَهْدِيُّ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ○

অনুবাদঃ আগমনকারী মাহদী (আঃ)-এর নাম 'আহমদ-বিন-আবদুল্লাহ' হবে। *

-(আল্ ভাতা ওয়াল হাদিসীয়া-মিশরে মুদ্রিতঃ ৩৮ পৃঃ) লেখকঃ হযরত আহমদ শাহাবুদ্দিন ইবনে হাজারিল হায়ে সামীয়ে, (মৃত্যুঃ ৯৭৪ হিজরী সন)

(৫) পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক ও কবি আল্লামা ইকবাল প্রণীত কবিতার পুস্তক 'বাঙ্গেদারায়' একটি কবিতায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর এ জোরালো উক্তি বিগত শতাব্দীর বুযুর্গানে-দীনগণের অভিমতেরই সমর্থন করছে।

যথাঃ

ہو چکا گو قوم کی شان جلالی کا ظہور -
ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور ○

—(بانگ درا)

অনুবাদঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর শান জালালীর বিকাশ হয়ে গেছে। এখন কেবল বাকী রয়েছে শান জামালির বিকাশ।

(ক) 'একবালনামা' পুস্তকের প্রথম জিলদ ৪১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে জনৈক অরিয়েনটেলিষ্টকে সম্বোধন করে আল্লামা ইকবাল এক পত্রে লিখেছিলেনঃ

اس وقت دنیا کو صرف ایک معمولی مصلح کی
ہی نہیں بلکہ ایک نبی کی ضرورت ہے ○

—(اقبال نامہ جلد ا ص ۴۱)

অনুবাদঃ "পৃথিবীতে বর্তমান যুগে শুধু একজন সাধারণ সংস্কারকই যথেষ্ট নহে। বরং চাহিদা পূরণের জন্য একজন নবীরও প্রয়োজন।"

* টীকাঃ উহা অপর এক হাদীসে উল্লেখিত হাদীসের উক্তিঃ "ইউয়াতি ইসমুহু ইসমি ওয়া ইসমু আবিহে ইসমু আবি"-তাঁর নাম আমার নামের তুল্য হবে এবং তাঁর পিতার নাম আমার পিতার নামের তুল্য হবে।

আখেরী জামানায় উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্য হতে ইমাম মাহদী (আঃ) জাহির হয়ে জামাতে আহমদীয়া নামক জামাত গঠন সম্পর্কে বিগত শতাব্দীর বুযুর্গানে-দ্বীন ইমামগণের ভবিষ্যদ্বাণী এবং আধুনিক যুগের চিন্তাবিদগণের অভিমত আলোচিত হয়েছে। জামাতে আহমদীয়া নামটি আরবী আভিধানিক স্বীকৃতিও পেয়েছে। যথা ঃ

اَلْمُنْجِدُ فِى الْاَدَبِ وَالْعُلُوْمِ নামক বিখ্যাত আরবী অভিধানে 'আল আহমদীয়া' শব্দটির নিম্নরূপ আভিধানিক ব্যাখ্যা ব্যক্ত করা হয়েছে।

الأَحْمَدِيَّة : مذهب ديني اسّسه (١٨٨٠) ميرزا غلام احمد قادباني في البُنجاب . اتباعه منتشرون خاصةً في الهند (بنجاب واقليم بُمباي) . تتفق عقائد الأحمدية مع الإسلام إلا في ثلاثة : ١ طبيعة المسيح وهو في زعمهم لم يصلب ولكنه مات في الظاهر فقط ودُفن في قبر خرج منه بعد ذلك وهاجر الى كَشْمير ليعلّم الانجيل ثم توفي . ٢ دعوة المهدي ووظيفته الدعوة الى السلام ، ويتجسّد فيه المسيح والنبي في وقت واحد . ٣ الجهاد القائم لا على السيف بل على الوسائل السلميّة .

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার প্রধান দাবী হচ্ছে মাহদী (আখেরি জামানা), তদুপরি তিনি একাধারে এ জামানার জন্য মসীহ্ এবং (উম্মতি) নবীও।

–(আল মুনজেদ্ ফিল লুগাতেল আদাবে ওয়াল উলুমে)
(মুদ্রিত-বৈরুত, লেবাননঃ ১৯৬০ পৃঃ ৮)

ইমাম মাহদী (আঃ) জাহির হওয়া সম্পর্কে
চিন্তাবিদদের ও দ্বাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ-এর অভিমত

(১) মৌলানা সৈয়্যদ আবুল আলা মওদুদি লিখেছেনঃ

বিবেক-বুদ্ধি, মানব-প্রকৃতি এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি অবশ্যই এমন একজন নেতার আবির্ভাব দাবী করে যার নাম হবে ইমামুল মাহদী। নবী করীম (সাঃ) হাদীসে তাঁর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। –(ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনঃ ২২ পৃঃ)

অতঃপর উক্ত পুস্তকে তিনি আরো মন্তব্য করেছেন, "যারা এ ধরনের নেতার আবির্ভাবের কথা শুনে অবাক হন, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি দেখে আমি অবাক হই। লেনিন ও হিটলারের মত ধূরন্ধর মিথ্যাচারি নেতৃবর্গ যদি খোদার এ দুনিয়ায় আবির্ভাব হতে পারে, তাহলে আলমে ইসলাম একজন সত্য ও হেদায়াতকারী ইমামের আবির্ভাব ঘটাকে সুদূর-পরাহতই বা মনে করা হচ্ছে কেন?"

একজন গ্রন্থকার হিসেবে মৌলানা সৈয়্যাদ আবুল আলা মওদুদি সাহেবের এসব উক্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ব্যক্তিগত বিবেক-বুদ্ধিপ্রসূত মাত্র, রসূলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী-সমূহের সত্যতার বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে মুসলিম জনসাধারণকে তিনি কেবল সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত শাহ অলীউল্লাহ শাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রাহঃ) আল্লাহ্‌তা'লার অহীর মাধ্যমে সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে সুসংবাদ লিপিবদ্ধ করে গেছেনঃ

وَعَلَّمَنِي رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ أَنَّ الْقِيَامَةَ قَدِ اقْتَرَبَتْ

وَالْمَهْدِيُّ قَدْ تَهَيَّأَ لِلْخُرُوجِ ٥

(تفهيمات الهية جلد ٢ - ص ١٢٣)—

অনুবাদঃ ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে অবহিত করেছেন যে, কেয়ামতের (অর্থাৎ নবজাগরণের) যুগ সমাগত, মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভূত হওয়ার সময় অত্যাসন্ন।" –(তাফহিমাতে এলাহিয়া -২য় জিলদঃ ১২৩ পৃঃ)

(২) হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে এ উপমহাদেশের তদানীন্তন প্রখ্যাত আলেম মৌলানা নূরুল হাসান সাহেব প্রণীত গ্রন্থ 'একতেরাবুস্‌সায়াত'-এর ২২১ পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ এখন আমরা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে উপনীত হয়েছি----- ফলে আগামী ৪/৬ বৎসরের মধ্যে অবশ্যই মাহদী জাহির হয়ে যাবেন।

কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ঠিক সেই নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ১৩০৬ হিজরীতে (চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে) ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আল্লাহ্‌তা'লার ইলহামের মাধ্যমে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে ঘোষণা করলেনঃ

(ক) اُٹھ کہ میں نے تجھے اس زمانہ میں اسلام کی
حُجّت پوری کرنے کے لئے اسلامی سچائی کو دنیا میں
پھیلانے کے لئے اور ایمانوں کو زندہ اور قوی کرنے
کے لئے چنا o —(تریاق القلوب ص ۳۲۴)

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌তা'লা ইলহাম যোগে আমাকে জ্ঞাত করেছেন উঠ! ইসলামের হুজ্জতকে পূর্ণ করবার জন্য এবং সারা বিশ্বে ইসলামের সত্যতাকে প্রচার করে ঈমানকে জিন্দা ও মজবুত করার উদ্দেশ্যেই তোমাকে মনোনীত করা হয়েছে।"

—(তরিয়াকুল কুলুবঃ ৩২৪ পৃঃ)

(খ) এ সম্পর্কে তিনি আরও ঘোষণা করলেনঃ

اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ وہ اسلام کو کل
ملتوں پر غالب کرے ۔ اس نے مجھے اسی مطلب کے لئے
بھیجا ہے ۔ اور اسی طرح بھیجا ہے جس طرح پہلے
مامور آتے رہے ہیں o
(الحکم ۔ ۳۱ جنوری ۔ سنہ ۱۹۰۴)

অনুবাদঃ এ জামানাতে আল্লাহ্‌তা'লার ইহাই ইচ্ছা যে, সারা বিশ্বের সব ধর্মের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করা হবে। আল্লাহ্‌তা'লা এ উদ্দেশ্যেই আমাকে প্রেরণ করেছেন। যেভাবে পূর্বযুগে আল্লাহ্ মামুর মিনাল্লাহ্ প্রেরণ করতেন, ঠিক সেই একইভাবে এ জামানাতেও 'মামুর মিনাল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র খাস উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট ব্যক্তি হিসেবেই আমি প্রেরিত হয়েছি।"

—(আল্ হাকামঃ ৩১ শে জানুয়ারী, ১৯০৪ সন)

(গ) 'এযালায়ে আওহাম' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের ৮৫৬ পৃষ্ঠায় তিনি ইহাও ঘোষণা করেছেন ঃ

جو مجھے دیا گیا ہے ۔ وہ محبت کے ملک کی
بادشاہت اور معارف الٰہی کے خزانے ہیں ۔ جن کو
بفضلہ تعالیٰ اس قدر دوں گا کہ وہ لوگ لیتے لیتے تھک
جائیں گے o —(جلد اول ۔ ازالۂ اوہام ص ۸۵۶)

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে যা প্রদান করেছেন উহা হচ্ছে (এলাহি) মহব্বত-এর জগতের এক বাদশাহাত এবং ঐশীতত্ত্বের জ্ঞানভাণ্ডার। এ রূহানী তত্ত্বের অফুরন্ত ভান্ডার হতে আমি এত অধিক হতে অধিক পরিমাণ (রূহানী সামগ্রী) বিলিয়ে দিতে থাকব যা গ্রহণ করতে করতে লোকজন অভিভূত ও ক্লান্ত হয়ে যাবে।

বিরুদ্ধাচরণ প্রসঙ্গ

ইহা সর্বজনবিদিত যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর মধ্যে কোন একজন নবীর দৃষ্টান্তও এমন পাওয়া যায়নি যাঁর বিরোধিতা হয়নি। ইহা একটি শাশ্বত সত্য যে, 'মামুর মিনাল্লাহ্' আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট মহাপুরুষ মাত্রই বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সরওয়ারে কায়েনাত রাহমাতুল্লিল আলামীন খাতামাল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কেও চরম বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়েছিল, তা কারও অজানা নেই। আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা ইয়াসীনের দ্বিতীয় রুকূতে এরশাদ করেছেনঃ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝٣١

অনুবাদ ঃ পরিতাপ ! বান্দাগণের জন্য, তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাহার প্রতি তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই (৩৬ঃ৩১)।

অতএব হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বিরোধিতার দাবানল হতে কি করে রেহাই পেতে পারেন? ইহা অবধারিত সত্য যে, বিরোধিতা তথা মোখালেফাত হওয়াটাই বরং 'মামুর মিনাল্লাহ্‌র' সত্যতার একটা প্রধান লক্ষণ।

চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেকার শতাব্দীসমূহের প্রখ্যাত বুযুর্গানে দীন, ইমাম ও আলেমগণের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) জাহির হওয়ার পর জামানার আলেমগণ বিরোধিতা করবেন। যথাঃ

(১) এ উম্মতের বিশিষ্ট অলী হযরত মহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রাহঃ), যাঁকে বিখ্যাত 'ফতুহাতে মক্কিয়া' নামক গ্রন্থের টাইটেল পৃষ্ঠায় 'খাতামুল আওলিয়া' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জাহির হওয়া সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

اِذَا خَرَجَ اِمَامُ الْمَهْدِىْ فَلَيْسَ لَهٗ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ
اِلَّا الْفُقَهَاءُ خَاصَّةً فَاِنَّهٗ لَا يَبْقٰى لَهُمْ رِيَاسَةٌ ۝

(فتوحات مكيه جلد ٣ - صر ٣٧٤)—

অনুবাদঃ 'ইমাম মাহদী (আঃ) যখন জাহির হবেন তখন ঐ জামানার ওলামা এবং ফকীহ্‌গণই তাঁর পরম শত্রু হয়ে যাবেন। শত্রুতার কার্যক্রমগুলো বিশেষতঃ এ কারণেই চালাতে থাকবেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করলে সমাজে তাদের স্ব-স্ব মহলে নেতৃত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।" –(ফতুহাতে মক্কিয়া, ৩য় জিলদ-মিশরে মুদ্রিতঃ ৩৭৪পৃঃ)

(২) তদনুরূপ এ উম্মতের একজন মশহুর মোজাদ্দেদ, হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী সৈয়্যদ আহমদ সরহিন্দি (রাঃ) (১০৩৪) লিখেছেনঃ

نزدیک است کہ علماء ظواہر مجتہدات اورا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام از کمال دقت وغموض مأخذ انکار نمایند ومخالف کتاب وسنت دانند ۔ —(مکتوبات امام ربانی جلد ۲ - صہ ۱۰۷)

অর্থাৎ ইহা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নহে যে, সমসাময়িক ওলামাগণ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সূক্ষ্ম ও তত্ত্বপূর্ণ মূল্যবান ধর্মীয় ব্যাখ্যাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তাঁর কথাগুলোকে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র খেলাফ মনে করে তাঁকে অমান্য করে বসবে।

–(মকতুবতে ইমাম রাব্বানি-২য় জিলদঃ ১০৭পৃঃ) [লক্ষ্ণৌতে মুদ্রিতঃ ১৯১৩ সন]

(৩) এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম সাহেব নানতুভি (রাহঃ) লিখে গেছেনঃ

امام مہدی علیہ السلام چونکہ سراپا کلام اللہ کے موافق ہوں گے اس لئے کروڑوں لوگ مہدی موعود سے روگردانی کریں گے ۔ —(قاسم العلوم صہ ۱۱۵)

অনুবাদঃ মাহদী (আঃ) যেহেতু সম্পূর্ণ কালামুল্লাহ্‌র উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন সে কারণে কোটি কোটি লোক মাহদী (আঃ)-কে অবজ্ঞার চক্ষে অমান্য করবে।

–(কাসেমুল উলুমঃ ১১৫-১১৬ পৃঃ)[প্রকাশকঃ কোরান লিমিটেড, উর্দূবাজার, লাহোর]

(৪) আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা নোয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব কান্নৌজি প্রণীত প্রসিদ্ধ কেতাব 'হুজাজুল কেরামা ফি আসারিল কিয়ামার ৩৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

অনুবাদঃ 'হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যেহেতু সে জামানাতে (আখেরী জামানাতে) রসূলে করীম (সাঃ)-এর সুন্নতকে জীবিত করবার জন্য সকল প্রকার বেদাতকে দূরীভূত করবার সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন তখন ফেকাহ্‌সমূহের অনুসরণকারী এবং পিতৃপুরুষগণের প্রচলিত কল্পিত ভ্রান্ত আকিদাসমূহের বেড়াজালে আবদ্ধ অবস্থায় অভ্যস্থ ঐ জামানার আলেমগণ বলতে থাকবেন, সে ব্যক্তি আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম এবং আমাদের জাতীয় মূলভিত্তিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। সুতরাং তারা মাহদী (আঃ)-এর সঙ্গে ঘোর বিরোধিতা করবে এবং স্বীয় মজ্জাগত অভ্যাস বা রেওয়াজ মোতাবেক মাহদী (আঃ)-এর উপরে কুফরী এবং গুমরাহির ফতওয়া জারি করবে।'

ইমাম ও মোজাদ্দেদগণের উপর কুফরী ফতওয়া

এখানে বিগত তেরশত বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক শতাব্দীর বুজুর্গদের সঙ্গে মোখালেফাতের খানা সমূহের গুটি কতক হৃদয় বিদারক ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

(১) প্রথম জামানায় মোজাদ্দেদ হযরত উমর বিন আবদুল আযীযকে (রাঃ) বিরুদ্ধবাদীগণ বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল।

(২) হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত ইমাম শাফী (রাহঃ)-কে সমসাময়িক আলেমগণ কাফের-ইবলীস বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁকে প্রথমতঃ বন্ধন অবস্থায় বেইজ্জতির সহিত ইয়ামেন হতে বাগদাদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং পথিমধ্যে অপমানিত করা হয় ও যারপরনাই কষ্ট দেওয়া হয়। অতঃপর পুনরায় গর্দানে শিকল পরিধান করিয়ে নগ্নপদে হাঁটিয়ে কুফা হতে মদীনা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেও যাবার পথে তাঁর উপর অমানুষিক নিপীড়ন চালান হয়েছিল।

(৩) হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহঃ)-কে বিরোধী মৌলবীগণের প্ররোচনায় ২৭ বৎসর পর্যন্ত জেলে রাখা হয়েছিল এবং ভারী শিকলে বাঁধা অবস্থায় প্রত্যহ বিকালে তাঁকে কোরা (চাবুক) মারা হত।

-(১। তাজকেরাতুল আওলিয়াঃ ১২০৯ নং রেওয়ায়াত)

(২। হারবায়ে তকফীর পুস্তক)

(৪) হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর প্রখ্যাত মোজাদ্দেদ হযরত ইমাম গাজ্জালী (রাহঃ)-এর বিরুদ্ধে জামানার উলামাগণ সম্মিলিতভাবে কাফেরের ফতওয়া জারি করেছিল। আলেমদের এরূপ জোরালো ফতওয়ার ফলশ্রুতিতে ইমাম (রাহঃ) প্রণীত সমস্ত মূল্যবান কেতাবাদিও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

(৫) হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ পীরানেপীর অর্থাৎ বড়পীর সাহেব হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ)–কে ঐ জামানার আলেমগণ কাফের বলে ফতওয়া দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এরূপ এক জোরালো ফতওয়াও জারি করেছিল যে, বড়পীর সাহেব (রাহঃ)-কে যারা এ ফতওয়া মোতাবেক কাফের না বলবে তারাও কাফের বলে গণ্য হবে।

(৬) হিজরী ৭ম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে ঐ জামানার উলামাগণ কুফরীর ফতওয়া দিয়েছিল এবং হাকেমে ওয়াক্ত থেকে ফরমান জারি করিয়ে তাঁকে মিশরের কোন এক শহরে অন্তরীণ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ অন্তরীণ থাকা অবস্থাতেই ইমাম সাহেব (রাহঃ)-এর বিরুদ্ধে কাযীর বিচার চলছিল। শেষ পর্যন্ত কাযীর ফতওয়া অনুসারে তাঁকে কতল করা হয়। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, তাঁর লাশ সম্মানজনক দাফনকার্য হতে বাধা প্রদান করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

(৭) হিজরী একাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত সৈয়্যদ আহমদ সরহিন্দী (রাহঃ), যিনি মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রাহঃ) নামে আখ্যায়িত ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও সমসাময়িক মোল্লাগণ কুফরীর ফতওয়া জারি করেছিল। উলামাগণের প্ররোচনায় তদানীন্তন দিল্লীর মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রাহঃ)-কে গোয়ালিয়রের দুর্গে দীর্ঘকাল যাবত বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

(৮) সমসাময়িক উলামাগণের ফতওয়ার ফলশ্রুতিতে হযরত ইমাম মালেক (রাহঃ)-কে জেলে কয়েদী হিসেবে রাখা হত। কয়েদী অবস্থায় সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর পর্যন্ত তিনি জুমআ'র নামাযের জন্য বের হতে পরেননি। মসলা-মাসায়েল নিয়ে আলেমদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার কারণে আলেমদের ফতওয়া মোতাবেক তাঁকে ৭০টি করে কোরা মারা হত -(ইবনে খালকান)

(৯) আলমে ইসলামের প্রখ্যাত ইমাম, ইমাম বোখারী (রাহঃ) ও সাময়িক উলামাগণের কাফেরের ফতওয়া হতে রেহাই পাননি। কাফেরের ফতওয়া দিয়ে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত কর হয়েছিল। কথিত আছে যে, উলামাদের নির্যাতন-নিপীড়নে অতিষ্ট হয়ে হযরত ইমাম বোখারী (রাহঃ) শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট এই বলে দোয়া করেছিলেনঃ "হে খোদা! আমার জন্য এ পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গেছে; অতএব, তুমি আমাকে তোমার সান্নিধ্যে নিয়ে যাও।" অতঃপর এরূপ দোয়ার পরে ঐ মাসেই তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

-(ইমাম বোখারী [রাহঃ] -এর জীবন চরিত)

(১০) 'ইমামে আযম' বলে খ্যাত হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-কে বেদাতি, জিন্দিক এবং কাফের ফতওয়া দেওয়া হয়েছিল। সমসাময়িক আলেমগণ তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা এলযাম সাজিয়ে তাঁকে বন্দী করান এবং এ কয়েদী অবস্থাতেই আলেমদের প্ররোচনায় তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

-(হযরত মৌলানা শিবলী নোমানী প্রণীত 'সিয়াতে নোমান' কেতাব)

(১১) ইসলাম জগতের প্রখ্যাত অলী হযরত শেখ মহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রাঃ), যাঁকে এ উম্মতের 'খাতামুল আওলিয়া' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাঁকেও ঐ জামানার আলেমগণ কাফের হওয়ার ফতওয়া দিয়েছিলেন এবং এ ফতওয়াতে এরূপ কথারও উল্লেখ ছিল যে, তাঁর কুফরী ইহুদী নাসারাদের কুফরী হতেও জঘন্যতর।

উপরোল্লিখত প্রখ্যাত বুযুর্গানে-দীনগণ ব্যতিরেকে এ উম্মতে এমন আরও বহু বুযুর্গ গুজরে গেছেন, যেমন-(১) বায়জীদ বোস্তামী (রাঃ), (২) হযরত জোনেদ বোগদাদী (রাহঃ), (৩) শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রাঃ), (৪) মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী (রাহঃ) ইত্যাদি আল্লাহ্‌র অলীগণের সবাইকে কুফরীর ফতওয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি রোধে অধিক দৃষ্টান্ত পেশ করা হতে বিরত রইলাম।

এ উপমহাদেশের বৃটিশ শাসন যুগের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীটি ছিল মুসলমানদের জন্য এক বিড়ম্বনাময় নিপীড়িত, নিষ্পেষিত এবং চরম অধঃপতিত হওয়ার শতাব্দী। এ শতাব্দীতেই দিল্লীর নামে মাত্র সর্বশেষ মোগল সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হলেন, আর

সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা হতে লাগল নিপীড়নের শিকার। রাজরোষে নিপতিত মুসলমানগণ 'সূর্যাস্ত আইনের' কবলে নির্যাতিত হতে লাগল এবং ক্রমান্বয়ে রাজ্যহারা, জমিদারি, তালুকদারি ও জোত-জমিহারা হয়ে একান্তই করুণার পাত্রে পরিণত হয়েছিল। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে ছিল তারা শোচনীয়ভাবে অনগ্রসর। দারিদ্র্যে নিপীড়িত মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে শুরু হল খৃষ্টান-পাদ্রীদের ধর্মান্তরিতকরণ অভিযান। তদানীন্তন প্রবল প্রতাপান্বিত ভারতের সম্রাজ্ঞীকে বিলাতের বিশপগণ 'বিশ্বাসের রক্ষিকা' উপাধিতে বিভূষিত করে এ উপমহাদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সর্বাংগীন সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। এ সুযোগে তারা ইসলাম ও ইসলামের নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে মেতে উঠেছিল। মোসলেম চিন্তাবিদগণ ঐ সময়ে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে অক্ষম হয়ে হা-হুতাশ আর উচ্ছ্বাসের সুরে ইহাই বলতেছিলেনঃ

"মুসলমান গেছে সব কবরেতে চলি
ইসলাম হয়েছে শুধু কেতাবের বুলি।"

মুসলমান জাতির এহেন অধঃপতনের যুগে কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর মুজাদ্দেদের দাবির বহু পূর্বেই ইসলামের সপক্ষে কলম ধারণ করেন। তিনি 'বারাহীনে আহ্মদীয়া' নামক (পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত) এক অনুপম কেতাব প্রণয়ন করেন। এতে তিনি ইসলামের সপক্ষে খৃষ্টান-পাদ্রীদের এবং আর্যসমাজী পন্ডিতদের উপস্থাপিত ইসলামের বিরোধী যাবতীয় 'ঠুনকো' আপত্তিগুলোকে কোরআন তথা ইসলামের অকাট্য যুক্তিসমূহ দ্বারা চূড়ান্তভাবে খন্ডন করলেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বিষোদগারের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব প্রদান করে তাদেরকে বাতেল সাব্যস্ত করেন। এতে তারা হতভম্ব হয়ে গেল।

তদানীন্তন ভারতের বিশিষ্ট আলেম এবং 'এশায়াতুস্-সুন্নাহ্' নামক পত্রিকার সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ হুসেন বাটালবি প্রমুখ আলেম ও জার্নালিষ্টগণ সকলে একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, গত তেরশত বৎসরের ইতিহাসে ইসলামের সপক্ষে এমন মজবুত দলিল পেশকারী মোজাহেদ কাদিয়ানে (পাঞ্জাব) আবির্ভূত হযরত মির্যা সাহেবই অদ্বিতীয় ও তুলনাবিহীন।

-(এশায়াতুস-সুন্নাহ্ঃ ১৮৮৯ সন-১৩০৬ হিজরী)

আল্লাহ্তা'লার একটি শাশ্বত নীতি উপস্থিত করা প্রয়োজন। তাহা এই যে, আল্লাহর জ্যোতিকে কেউই নির্বাপিত করতে সমর্থ হয় না। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٩

অর্থাৎ - "তাহারা চাহে যেন তাহারা নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা আল্লাহ্র নূরকে নির্বাপিত করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নিজ নূরকে নিশ্চয় পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবেন, কাফেরগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন" (সূরা আসসাফ্ ঃ ৯ আয়াত)।

আল্লাহ্‌তা'লার এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর শিক্ষা এবং মতবাদের আলো ক্রমশঃ সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এ এলাহি জামাতের অগ্রগতি অব্যাহত গতিতে চলছে।

১৮৮৯ সালে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবির পরক্ষণে অজস্র ফতওয়ার ছড়াছড়ি হওয়া সত্ত্বেও, আল্লাহ্‌র ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে তদরচিত পুস্তক 'ফতেহ ইসলামে' মির্যা সাহেব (আঃ) নির্ভিকচিত্তে দ্বিধাহীন ভাষায় সমগ্র জগদ্বাসীকে সম্বোধন করে ঘোষণা করলেনঃ "প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্‌র এ রীতি চিরকাল প্রচলিত আছে যে, যখন কোন রসূল বা নবী বা মোহাদ্দাস মানবজাতির এসলাহ বা সংস্কারের জন্য আকাশ হতে অবতীর্ণ হন তখন সহচররূপে তাঁর সঙ্গে এমন সকল ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়, যাঁরা যোগ্যতাসম্পন্ন হৃদয়সমূহে হেদায়াত বা সত্যের প্রেরণা দান করে এবং পুণ্যের আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং অনবরত তাঁরা (ফেরেশ্‌তাগণ) অবতীর্ণ হতে থাকে, যে পর্যন্ত না কুফরী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ঈমান-বিশ্বাস ও সততার প্রভাব দেখা দেয়।"

"এ অধম যেহেতু সততা ও সত্য সমভিব্যাহারে খোদাতা'লার তরফ হতে এসেছে, অতএব চতুর্দিকেই তোমরা তাঁর সত্যতার নিদর্শনাদি দেখতে পাবে। সে সময় দূরে নহে বরং অত্যাসন্ন, ফেরেশ্‌তা বাহিনীকে যখন আকাশ হতে অবতরণ করতে এবং এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীগণের হৃদয়ে অবতীর্ণ হতে দেখতে পাবে। কোরআন শরীফে তোমরা এ বিষয় বুঝে থাকবে যে, মানবহৃদয়কে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তিত করার জন্য খলীফাতুল্লাহ্‌র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশ্‌তাগণের অবতরণও অত্যাবশ্যক।"

–(ফতেহ ইসলাম-বঙ্গানুবাদঃ ১৯-২২ পৃঃ)

ইসলাম ও মুসলমানের সংজ্ঞা

'ইসলাম' একটি পবিত্র এবং প্রিয় নাম। খাস করে আল্লাহ্‌তা'লা উম্মতে মোহাম্মদীয়ার জন্যই এ নামটি নির্ধারিত করেছেন। প্রাগৈসলামিক যুগের নবীগণও এ পবিত্র নাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। কোরআন শরীফে এ 'নামটি' সম্পর্কে আল্লাহ্‌ এরশাদ করছেনঃ

হুয়া সাম্মাকুমুল মোসলেমিনা মিন কাবলু ওয়া ফিহাযা (সূরা হাজ্জ, রুকূ ১০) তোমদের নাম রাখা হল মুসলমান এবং (কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার) পূর্বেকার ঐশী কেতাবসমূহেও এ নামের উল্লেখ আছে।

তৌরাতের ইয়াসায়া (যীশাইয়) নবীর কেতাবে উল্লেখ আছেঃ "এবং তুমি এক নব্য নামে আখ্যায়িত হবে যা সদাপ্রভুর মুখ নির্ণয় করবে।"

–(যীশাইয়-দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ৬২ আয়াত)

সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লা যে নাম দান করেছেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণের মাধ্যমেও যে নামটির খবর দেওয়া হয়েছিল সে নামের চেয়ে অধিকতর পবিত্র এবং সম্মানিত নাম আর কি হতে পারে?

আল্লাহ্‌তা'লা জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে একদা রসূলে করীম (দঃ)-কে দীন ইসলাম সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অবহিত করেন-ঃ

(১) এ সম্পর্কে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে,একদিন জিব্রাঈল (আঃ) মানবাকৃতিতে কতক সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) উপস্থিতিতে মসজিদে নববীতে নবী করীম (সাঃ)-এর সন্নিকটে অবস্থান করে প্রশ্ন করলেনঃ 'মাল-ইসলামু?' অর্থাৎ ইসলামের সংজ্ঞা কি?' আঁ হযরত (দঃ) উত্তরে বললেন ঃ

اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً
رَّسُوْلُ اللّٰهِ - وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ
رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا - قَالَ
صَدَقْتَ *

অর্থাৎ ইসলামের সংজ্ঞা হচ্ছে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করাঃ (১) আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই, (২) মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, (৩) নামায কায়েম করা, (৪) যাকাত প্রদান করা, (৫) রমযান মাসে রোযা পালন করা, (৬) হজ্জব্রত পালন করা। অর্থাৎ যার উপর অবস্থার প্রেক্ষিতে বৈধ বলে বিবেচিত হবে তার হজ্জ পালন করা। -(মিশকাত- কিতাবুল ঈমানঃ ১১পৃঃ)

জিব্রাঈল (আঃ) বললেন সঠিক বলেছেন ---- অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) পুনঃ প্রশ্ন করলেন, 'ফাখবেরুনি আনিল ঈমান' ------ অর্থাৎ ঈমানের সংজ্ঞা কি আমাকে তা জ্ঞাত করুন। রসূলে করীম (সাঃ) তখন উত্তরে বললেনঃ

اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ *

(১) অনুবাদঃ ঈমান বলতে ইহাই বুঝায় যে,আল্লাহ্‌, তাঁর ফেরেশ্‌তা, তাঁর কেতাবসমূহ তাঁর রসূলগণ ও পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস আনয়ন করা এবং

আল্লাহ্‌তা'লার কাযায়ে কদরের মঙ্গলামঙ্গলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। জিব্রাঈল (আঃ) ইহা শুনে বললেন, ---- 'আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন।"

(২) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ـ وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ ـ وَرَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ ٭ —(بخارى و مشكوٰة)

অনুবাদঃ "আমাদের মত যে ব্যক্তি নামায আদায় করে, আমাদের কেবলামুখী হয়ে এবাদত করে, আমাদের (পদ্ধতিতে) যবাই করা মাংস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই মুসলমান। এরূপ লোকের জান-মালের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের উপর অর্পিত। সুতরাং এ জিম্মাদারীকে (দায়িত্বকে) তোমরা ভঙ্গ করো না। —(বোখারী ও মিশকাত)

ইসলাম তথা মুসলমানের সংজ্ঞা সম্বলিত উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহে বিষয়টিতে যেরূপ সুস্পষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে, মুসলিম শরীফের হাদীসেও একই অভিমতের সমর্থনে সেরূপ আরও বহু রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে।

হানাফি ফিকাহ্ অনুযায়ী ইসলামের সংজ্ঞা

(১) হানাফি সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত ইমাম হযরত মোল্লা আলী কারী (রাহঃ) প্রণীত ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কেতাব 'শরাহ ফিকাহ্ আকবর' নামক গ্রন্থে ইসলামের সংজ্ঞা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاَهْلُ التَّوْحِيْدِ وَمَا يَصِحُّ الْاِعْتِقَادُ عَلَيْهِ يَجِبُ اَنْ يَّقُوْلَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْحِسَابُ وَالْمِيْزَانُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ كُلُّهٗ ٭

—(شرح فقه اكبر ـ ص ١٢-١٠ مصرى چهاپه)

অনুবাদ ঃ তৌহীদের মূল ভিত্তি এবং মৌলিক বিশ্বাস যার উপর আস্থাবান হওয়ায় একজন মুসলমানের এতেকাদ সহী বলে গণ্য করা হবে তা হচ্ছে, যে কোন সাবালক ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাসের ঘোষণা দেবে, "আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র উপর, আল্লাহ্‌র রসূলগণের উপর, তাঁর নাযেলকৃত কিতাবসমূহ এবং ফেরেশ্‌তাদের উপর এবং ঘোষণা করবে যে, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান হবে এবং বিশ্বাস করবে যে, ভালমন্দ খোদার এখতিয়ারে আছে (অর্থাৎ কাযায়ে কদরের উপর)। সে ঘোষণা করে যে, দোযখ ও বেহেশ্‌তের উপর আর আল্লাহ্‌র দ্বারা চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ নেওয়ার উপরেও সে পূর্ণ আস্থাবান।"

একজন মুসলমান হওয়ার জন্য বা থাকার জন্য ইহাই হবে প্রকৃত সংজ্ঞা।

(২) উক্ত ফিকার কিতাবেরই আরও একটা শরাহ হতে আল্লামা আবু মনসুর মোহাম্মদ বিন হানাফী মাতবেদি সমরকন্দি একটি শরাহ লিখেছেন। ইহা 'দারাতুল মায়ারেফ' নামক পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছে।

উক্ত কিতাবের ৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ بِلِسَانِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَصَدَّقَ بِقَلْبِهِ مَعْنَاهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْفَرَائِضَ وَالْمُحَرَّمَاتِ *

অনুবাদ ঃ "মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছা পোষণকারী যে কোন ব্যক্তি বুঝে-শুনে তার জবান ও হৃদয় উভয় হতেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র' উপর পূর্ণভাবে আস্থাবান হওয়ার ঘোষণা করলে সে অবশ্যই মোমেন বলে স্বীকৃত হবে এবং এমতাবস্থায় যদি সে ইসলামের যাবতীয় 'ফারায়েয' (অবশ্য কর্তব্যসমূহ) এবং মোহাররামাত (নিষিদ্ধ কাজসমূহ) সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনে সক্ষম না-ও হয়, তথাপি সে মোমেন বলেই গণ্য হবে।"

পবিত্র কোরআন এবং হানাফী ফিকাহ্‌সমূহের আলোকে নির্ণীত হয়েছে যে, মুসলমান বলে গণ্য হওয়ার জন্য দেশ, জাতি,প্রাচ্য-প্রতীচ্য, বংশ বা গোত্র নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি যদি মনে-প্রাণে কলেমা তৈয়্যব-**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্**-এর উপর ঈমান আনে ও নামায-রোযা ইত্যাদি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের উপরেও পূর্ণ আস্থাবান থাকে তবেই সে মুসলমান।

ব্যাপক ভিত্তিক ধর্মবিশ্বাস এবং আহমদীয়া জামা'ত

(১) আহমদীয়া জামা'ত এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ্ যেরূপ হাইয়্যুল কাইয়্যুম বা চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী ঠিক তাঁর গুণাবলীও চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী। আল্লাহ্র কোন সিফাতই কোন সময় রহিত হয়নি আর রহিত হবেও না। তাঁর গুণাবলী সর্বকালের জন্যই অক্ষুণ্ন অটুট, এক কথায় চিরন্তন বা শাশ্বত।

(২) আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এরশাদ ফরমায়েছেন ঃ

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ

অর্থাৎ এ নশ্বর জীবনে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে সুসমাচার দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ এ আয়াতে করীমার আলোকে আহমদীয়া জামাত এ দৃঢ়বিশ্বাসই পরিপোষণ করে যে, সুসমাচার দেওয়ার এ নীতির কোন পরিবর্তন বা নিষ্ক্রিয়তা নেই বরং সর্বযুগেই আল্লাহ্র এ নীতি ক্রিয়াশীল, কোন যুগেই আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে বাক্যালাপের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত রাখেন নি বরং ইলহামের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় বান্দাগণের নিকটে স্বীয় ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, আল্লাহ্তা'লা মূসা (আঃ)-এর মাতা এবং ঈসা (আঃ)-এর মাতার সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। সর্বশেষ ইসলামী শরীয়তের অনুসারী বুযুর্গানে-দীনদের মধ্যে এমন অনেক মহাপুরুষই এসেছেন, যেমন হযরত বড়পীর সাহেব (রাহঃ), হযরত মহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রাহঃ), হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী সৈয়্যদ আহমদ সরহিন্দি (রাহঃ), যাঁরা ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লার সুসমাচার লাভ করেছিলেন। এরূপ ইলহামপ্রাপ্ত আরও বহু বুযুর্গ গুজরে গিয়েছেন এবং এ যুগেও বিদ্যমান রয়েছেন। সুতরাং আহমদীয়া জামাতের একটি দ্বিধাহীন স্বচ্ছ আকিদা যে, আল্লাহ্ সর্বদাই তাঁর প্রিয় বান্দাগণের নিকট সুসমাচার নাযিলের সিলসিলা যেভাবে পূর্বে জারি রেখেছিলেন বর্তমানেও অপরিবর্তনীয়ভাবে সে সিলসিলা অব্যাহত রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও তা রাখবেন।

এতদ্ব্যতিরেকে যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহ্তা'লা কোন কোন অলীকে পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের মধ্য হতে কোন কোন আয়াতের আসল ব্যাখ্যা এবং অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বসমূহও ইলহামের মাধ্যমেই জ্ঞাত করে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ কোরআন শরীফে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ 'আমার নিকটে প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনার জবাব দিব' – (সূরা মোমেনঃ ৬১ আয়াত)। আহমদীয়া জামাত এ আয়াতে করীমার উপর পূর্ণভাবে আস্থাবান। যখনই কোন মানুষের বিশেষতঃ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণের কোন বিপদ বা সমস্যা দেখা দেয়, তখনই দোয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ সাহায্য করে থাকেন। আহমদীয়া জামাতের সদস্যবৃন্দ ফলতঃ এমনই এক জিন্দা খোদার উপর

বিশ্বাস স্থাপন করেছে যে, যিনি বান্দার ডাক শ্রবণ করে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ জ্ঞানানুসারে দোয়া কবুলিয়তের এমন ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে যে, তা বর্ণনা করতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থেও স্থান সংকুলান হবে না।

সুসমাচার লাভ সম্পর্কে আঁ হযরত (দঃ)-এর এক হাদীসেও আছে

لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ * —(ترمزی)

অর্থাৎ "আল্লাহ্ হতে ফযিলতস্বরূপ সুসমাচার ব্যতিরেকে নবুওয়তের আর কোন অংশই বাকী রইল না।"

পরিতাপের বিষয় যে, মধ্যযুগের কোন কোন অপরিণামদর্শী অন্ধ বিশ্বাসী কোরআন শরীফের নাসেখ-মনসুখের প্রশ্ন উঠিয়েছিল। কিন্তু আহমদীয়া জামাত দৃঢ় আকিদা পোষণ করে যে, بِسْمِ اللّٰهِ-এর ب (বে) থেকে আরম্ভ করে সূরা النَّاس-এর শেষ অক্ষর س (সিন) পর্যন্ত প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি বাক্য, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র তরফ হতে যেভাবে এসেছিল সেভাবেই আছে; এবং তা সর্বাবস্থায় অপরিবর্তনীয়, অক্ষুণ্ণ এবং অটুট থেকে যাবে। কোন সময়েই এবং কোন অবস্থাতেই কালামুল্লাহ্‌র মাধ্যমে নাযিলকৃত কোরআনের কোন শব্দ, বাক্য, হুকুম-আহকাম গত ১৪০০ বৎসরের ভিতরে মনসুখ হয়নি এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা মনসুখ হবেও না। *

(৪) আহমদীয়া জামাত কেয়ামতের উপর, রোজ-হাশর, হাশর-নাশরের উপর এবং বেহেশ্‌ত-দোযখের উপর পূর্ণ ঈমান রাখে।

তারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে যে, মৃত্যুর পরে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার ভাল-মন্দ সব কাজের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে অবশ্যই জবাবদিহি হতে হবে। নেক আমল করলে মর্যাদা অনুযায়ী বেহেশ্‌ত লাভ করবে এবং মন্দ কাজ করলে দোযখে নিপতিত হবে।

(৫) বেহেশ্‌ত সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন শরীফে এরশাদ করছেন----

وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۝ অর্থাৎ " এবং উহা হইতে তাহারা (বেহেশ্‌বাসীগণ) বহিষ্কৃতও হইবে না "(১৫:৪৯)। সুতরাং পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে করীমার আলোকে আহমদীয়া জামাত এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস করে থাকে যে, বেহেশ্‌ত চিরস্থায়ী এবং বেহেশ্‌তবাসিগণ অনন্তকাল সেখানে বাস করবে।

---

* টীকাঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেনঃ 'আফালা ইয়াতা দাব্বারুনাল কোরআনা ওয়ালাউ কানা মিন্ ইন্দি গায়রিল্লাহি লা-ওয়াজাদু ফীহে এখতেলাফান কাসীরা'। যদি এ কোরআন স্বয়ং আল্লাহ্ হতে নাযিল না হত তাহলে এর মধ্যে বহু এখতেলাফ বা সামঞ্জস্যবিহীন উক্তি থেকে যেত।
—(নেসাঃ ১১ রুকু)

কিন্তু দোযখবাসী সম্পর্কে আহমদীয়া জামাত এ বিশ্বাসই রাখে যে, অনন্তকাল কেউই দোযখে থাকবে না। যেমন হাদীস শরীফে আছে ঃ

يَأْتِي عَلَى جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ وَنَسِيمُ الصَّبَاءِ تُحَرِّكُ أَبْوَابَهَا. —(تفسير معالم التنزيل)

এ হাদীসটির আলোকে আহমদীয়া জামাত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌র অযাচিত অনুগ্রহ এবং করুণার কারণে দোযখে নিক্ষিপ্ত পাপীগণকে একদিন ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং উপরোক্ত হাদীসের ভাষায় বলা হয়েছে যে, ক্রমান্বয়ে এক জামানা আসবে যখন সবাই দোযখ হতে বহিষ্কার হয়ে যাবে এবং প্রাতঃকালীন শীতল সমীরণ প্রবাহিত হয়ে উহার (দোযখের) দরজাগুলোকে হিলায়ে দেবে।

-(তফসীর মায়ালে মুত্তান্‌যিল "কানযুল্ উম্মাল"-২৪০ পৃঃ)

(৬) আহমদীয়া জামাত এ বিষয়েও দৃঢ় প্রত্যয় রাখে যে, এ বিশ্বজগতের সর্ব মানবের ও সর্ব জাতির জন্য সর্ব এলাকাতেই যুগোপযোগী হেদায়াতের জন্য নবী এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে যখনই এ পৃথিবী পাপ, অন্যায়, অত্যাচার, অশান্তি ও ব্যভিচারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তখনই শয়তানের কবল হতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে রক্ষা করার জন্য নবী-রসূল আবির্ভূত হয়েছেন। এতদ্বিষয়ে কোরআন শরীফে আল্লাহ্ এরশাদ ফরমায়েছেন ঃ

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ —(فاطر ر ٣)

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ.

অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিতে, দেশ ও মহাদেশে আল্লাহ্‌র তরফ হতে পথ প্রদর্শনকারী এসেছেন।

(৭) 'আহমদীয়া জামা'ত এ দৃঢ়বিশ্বাস রাখে যে, মুসলমানগণ যখন আখেরী জামানাতে বহুদলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে শতধা-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং মোসলেম সংহতি বিলুপ্ত হয়ে বিশ্বের সব মুসলমান কোণঠাঁসা হয়ে পড়বে এবং পবিত্র কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক যখন 'ওয়াতাসিমু বে হাবলিল্লাহে জামিয়া' মোতাবেক আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (আল্লাহ্‌র মনোনীত খেলাফতকে) মজবুত করে ধরে একতাবদ্ধ না হয়ে পরস্পর মতবিরোধের বেড়াজালে আটকিয়ে অধঃপতনের চরম অবস্থায় উপনীত হবে এবং দুর্বলতার সুযোগে ইসলাম যখন মোশরেক ও ত্রিত্ববাদিতার আক্রমণে জর্জরিত হওয়ার উপক্রম হবে তখন মুসলমানদেরকে খাঁটি ইসলামে পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হতে একজন ইমাম বা 'মামুর মিনাল্লাহ্' অবতীর্ণ হবেন। যিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এরই অনুসারী হবেন এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর পূর্ণ ও কামেল পায়রবীর

ফলশ্রুতিতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কুওয়তে ফয়জান হতে রূহানী নূর হাসেল করে শতধা-বিচ্ছিন্ন মুসলমান জাতিকে খাঁটি ইসলামের উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন।

হুযূর (সাঃ) এ সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন ঃ

كَيْفَ تَهْلِكُ اُمَّتِيْ اَنَا اَوَّلُهَا وَالْمَهْدِيُّ فِيْ اٰخِرِهَا -

(كنز العمال)-

অনুবাদঃ "আমার উম্মত কীরূপে ধ্বংস হতে পারে যার প্রথমে আমি এবং শেষভাগে মাহ্‌দী (আঃ)।"

আহ্‌মদীয়া জামা'তের আকায়েদের বৈষম্য

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে এ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বনী ইস্রাঈল বংশের নবী ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) সশরীরে আকাশে আরোহণ করেছিলেন এবং বিগত প্রায় দুই সহস্র বৎসর যাবত জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্‌র আরশের দক্ষিণ পার্শে উপবিষ্ট আছেন। তারা এরূপ আকিদাও পরিপোষণ করে থাকেন যে, মুসলমানদের হেদায়াত করবার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) আখেরী জামানাতে আকাশ হতে অবতরণ করবেন।

কিন্তু আহমদীয়া জামাত এ আকিদাকে ভ্রান্ত বলে মনে করে। কারণ, ইহা কোরআন-সুন্নাহ্‌ এবং হাদীসের পরিপন্থী। আহমদীরা পবিত্র কোরআনের আয়াতে করীমা كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ "প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে"(৩ঃ১৮৬)। মোতাবেক বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্‌তা'লার কাযায়ে কদরের অধীনে যেভাবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এমন কি সরওয়ারে কায়েনাত খাতামান্‌--নাবীঈন রসূল করীম (সাঃ)-ও এন্তেকাল করেছেন, সে ভাবেই মসীহ্‌ নাসেরী (আঃ)-ও এন্তেকাল করেছেন।

ইহাও আহমদীদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, আখেরী জামানাতে মসীহ্‌-নাসেরী (আঃ)-এর এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আগমনের অর্থ হচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদীয়ারই অন্তর্ভুক্ত কোন বুযুর্গ ব্যক্তি মসীহ্‌-নাসেরী (আঃ)-এর সাদৃশ গুণাবলীতে-অলঙ্কৃত হয়ে (মোহাম্মদী মসীহ্‌ হিসেবে) আগমন করবেন। অন্য উম্মতের কোন নবী এসে বা পুনরাগমন করে উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে হেদায়াত করার প্রশ্নই উঠে না।

প্রণিধানযোগ্য যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করছেন ঃ

لَوْ كَانَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى حَيَّيْنِ لَمَا وَسِعَهُمَا اِلَّا اتِّبَاعِيْ ০

(اليواقيت والجواهر - امام شعرانی - جلد ۲ - ص ۲۲)—

যদি মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার আনুগত্য স্বীকার ছাড়া অর্থাৎ আমার উম্মত হওয়া ব্যতিরেকে তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে, মূসা (আঃ)-এর মত ঈসা (আঃ)-এরও মৃত্যু হয়েছে।

–(ইমাম শেরানী রচিত পুস্তক 'আল্-ইউয়াকিত ওয়াল জোয়াহের' দ্বিতীয় জিলদঃ ২২ পৃঃ)

(২) মুসলমান সমাজে সর্বসম্মত এরূপ আকিদা প্রচলিত আছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) সর্বশেষে নবী, অতঃপর কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে আর কোন নবীর আগমন হবে না। পক্ষান্তরে এরূপ জোরালো আকিদাটির সঙ্গে তারা যুগপৎ এ আকিদাও পোষণ করে আসছেন যে, বনী ইস্রাঈল কওমের জন্য প্রেরিত নবী ঈসা (আঃ) (রাসূলান ইলা বনী ইস্রাঈলা), রসূলে করীম (সাঃ)-এর পরে উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে হেদায়াত করবার জন্য আকাশ থেকে নেমে আসবেন। এ হলো পরস্পরবিরোধী আকিদা। কেননা ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র সনদপ্রাপ্ত একজন নবী কেয়ামতের পূর্বে এ দুনিয়ায় পুনরায় গমন করলে ঈসা (আঃ)-ই শেষ নবী বলে গণ্য হবেন। সুতরাং এ আকিদা রসূলে করীম (সাঃ)-এর শান ও পদমর্যদার পরিপন্থী।

পক্ষান্তরে আহমদীয়া জামাত এ দৃঢ়বিশ্বাস রাখে যে, রসূলে করীম (সাঃ) রাহমাতুল্লিল আলামিন, খাতামান্-নাবীঈন, নবীগণের মোহর তথা নবীগণেরও নবী,এক কথায় নবী সম্রাট। তাঁর পদমর্যাদা অদ্বিতীয়, সর্বশেষ শরীয়তদাতা, কোরআনের ভাষায় 'আল্ ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম' অনুসারে পূর্ণ শরীয়তদাতা নবী, অতঃপর কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন শরীয়ত নাযিল হবে না।

তবে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণ পায়রবি তাঁরই (সাঃ) ফয়েয, কুওয়তে কুদসী এবং নূর হতে রূহানী আলোক আহরণ করে তদীয় উম্মতের মধ্য হতেই 'উম্মতি নবী' হেদায়াতের জন্য আসতে পারেন। এরূপ উম্মতি নবী হবেন রসূলে করীম (সাঃ)-এর শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী। উম্মতি নবীর * নিজস্ব কোন কলেমা ও শরীয়ত থাকবে না। বরং রসূলে করীম (সাঃ)-এর কলেমাই হবে তাঁর কলেমা এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর শরীয়তই হবে তাঁর শরীয়ত।

বিষয়টিতে আরও আলোকপাত করবার জন্য কোরআন শরীফের সূরা হাদীসের দ্বিতীয় রুকূ এবং সূরা নেসার নবম রুকূতে উল্লিখিত আয়াতে করীমাসমূহের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

---

* টীকাঃ দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা কাসেম সাহেব নানূতভী সাহেবেরও এরূপ একই আকিদা ছিল। অপর একজন প্রখ্যাত দেওবন্দী আলেম ক্বারী মোহাম্মদ তৈয়্যব সাহেবও তাঁর পুস্তক 'আফতাবে নবুওয়তে কামেলে' লিখেছেনঃ

"হুযূর কি শান, মেহেজ নবুওয়ত হি নেহি নবুওয়ত বাখ্শ্ভি নিকালতি হ্যায়। জো ভি 'নবুওয়ত কি ইস্তেদআ পায়া হুয়া ফারদ' আপকে সামনে আগিয়া, নবী হো গিয়া আওর উছকা নূরে নবুওয়ত আপহিসে চালা আওর আপহি পার লাউট কার খাতাম হো গিয়া।"

আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ

"যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক এবং শহীদগণের পর্যায়ভুক্ত" (৫৭ঃ২০)।

অর্থাৎ এ আয়াতে করীমা দ্বারা আল্লাহ্তা'লা ইহাই জানাচ্ছেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণের পায়রবি করে উচ্চতম রূহানী মর্যাদা হিসেবে মানুষ কেবল সিদ্দীক এবং শহীদের দরজাই লাভ করত। ঐ নবীগণে অনুসরণের ফলশ্রুতিতে কেউই নবুওয়তের দরজা পর্যন্ত পৌছুতে সমর্থ হত না। কিন্তু সরওয়ারে কায়েনাত রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুসারীগণের মর্যাদা লাভ প্রসঙ্গে আল্লাহ্তা'লা এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝

অনুবাদঃ "এবং যাহারা আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐসকল লোকের মধ্যে শামিল হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন–নবী এবং সিদ্দীক এবং শহীদ এবং সালেহ্গণের মধ্যে। এবং ইহারাই সঙ্গী হিসেবে উত্তম। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বিশেষ ফযল ; এবং সর্বজ্ঞানী হিসেবে আল্লাহ্ যথেষ্ট" (সূরা নেসা-৭০-৭১ আয়াত)।

এ আয়াতে করীমার আলোকে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হচ্ছে যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে উম্মতি নবীর মর্যাদা পাওয়া সরওয়ারে কায়েনাত 'খাতামান্-নাবীঈন' (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচায়ক এবং এতে খাতামান্-নাবীঈনের মোহর ভঙ্গ হয় না বরং এরূপ হওয়াতে আঁ হযরত (সাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা অধিক হতে অধিকতর বুলন্দ হয় এবং তিনি নবীগণের উপরে নবী বা নবীসম্রাটের মর্যাদা পান। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দুনিয়াবি দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজার উপরে রাজাকে আমরা রাজাধিরাজ বা সম্রাট আখ্যা দিয়ে থাকি। ইহাই খাতামান্-নাবীঈনের প্রকৃত তাৎপর্য।

আহমদীয়া জামাত এ দৃঢ় আকিদা পোষণ করে থাকে যে, কোরআনের ভাষায় ঃ --

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে" (৩ঃ১১১)।

অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে পূর্ববর্তী অন্য সব নবীর উম্মতদের চেয়ে উম্মতে মোহাম্মদীয়া উত্তম (উৎকৃষ্টতম)। সুতরাং এ উৎকৃষ্টতম উম্মত হতে 'উম্মতী নবীর' আবির্ভাব না হয়ে এ উম্মতের হেদায়াতের জন্য যদি বনী ইস্রাঈল উম্মতের একজন সাধারণ কওমী নবী এখন দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয় বা আকাশ হতে অবতরণের জন্য তাঁকে পুনরাদেশ করা হয় তবে সেটা একদিকে যেমন হবে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতা বিরোধী অপরদিকে তেমনি খাতামান্-নাবীঈনের মোহরটিও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে (নাউযুবিল্লাহ্)।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর সহচরগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিশেষ অধিকারিণী তদীয় পবিত্র সহধর্মিণী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা বয়ান করতে যেয়ে আঁ হযরত (সাঃ) এরশাদ করছেনঃ "দীনের শিক্ষালাভ করতে হলে তোমরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে দীনের অর্ধেক লাভ করতে পার।" সেই আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেন ঃ

قُولُوا إِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ۝

—(تكملة مجمع البحار - ص ٥٨)

অনুবাদ ঃ "তোমরা বলো যে, নিশ্চয় তিনি (সাঃ) খাতামুল আম্বিয়া, কিন্তু একথা বলো না যে, তাঁর পরে কোন নবী নাই।"

-(তাকমেলা মাজমাউল বেহারঃ ৫৮ পৃঃ) *

(আল্লামা মোহাম্মদ তাহের গুজরাতী প্রণীত)

বস্তুতঃ, এখানে আঁ হযরত (সাঃ)-এর অনুগামী হয়ে 'সর্বশেষ শরীয়ত কোরআনের অধীন শরীয়তবিহীন নবীর আগমনের দরজা খোলা আছে বলেই বিবি আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) একথা বলেছেন।

উম্মতে মোহাম্মাদীয়াতে 'উম্মতী নবীর' আবির্ভাব সংক্রান্ত বিষয়টিতে আলোকপাত করতে যেয়ে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা অতীব স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

"নবীকুল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর পূর্ণ পায়রবির ফলশ্রুতিতেই আমার জন্য এ সম্মান লাভ সম্ভবপর হয়েছে। নতুবা মোটেই তা সম্ভবপর ছিল না। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উম্মত না হয়ে এবং তাঁর (সাঃ) অনুসরণ না করে, আমার ব্যক্তিগত পুণ্য কর্মসমূহের উচ্চতা ও ওজন এমন কি যদি এ বিশ্বের সমগ্র পর্বতমালার সমষ্টিগত উচ্চতা এবং ওজনেরও সমতুল্য হত, তাহলেও আল্লাহ্‌তা'লার

* টীকাঃ বিবি আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীসটি 'তফসীরে দুররে মানসুর' ৫ম জিলদ ১০৪ পৃষ্ঠায়ও (মিশরে মুদ্রিত) উল্লেখ আছে।

বাণী লাভে আশিসযুক্ত হওয়ার মত মর্যাদার অধিকারী আমি হতে পারতাম না। এর একমাত্র কারণ ইহাই যে, মোহাম্মদী নবুওয়ত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুওয়তের দরজা বিলকুল বন্ধ হয়ে গেছে। নববিধান সহ আর কোন নবী আসতে পারে না। কিন্তু যদি মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর অনুগামী হয়, তাহলে অনুগামীদের মধ্য হতে বিধানবিহীন নবীর আগমন হতে পারে। বস্তুতপক্ষে আঁ হযরত (সাঃ)-এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কামেল এতায়াত বা পায়রবীর ফলেই আমি একাধারে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত এবং নবীও।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আরও বলেনঃ "আল্লাহ্‌র বাণী দ্বারা আশিসযুক্ত হয়ে আমার নবুওয়ত লাভ প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়তেরই যিল্লী বা প্রতিবিম্বসদৃশ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। তাঁর (সাঃ) নবুওয়তকে বাদ দিলে আমার ' এ নবুওয়তের' কোন অস্তিত্বই বিদ্যমান থাকবে না । প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্পূর্ণরূপে সেই মুহাম্মদী নবুওয়ত যা আমার মাধ্যমে পূর্ণভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে মাত্র । যেহেতু আমি উম্মতি (এবং উম্মত হওয়ার কারণে) তাঁরই প্রতিবিম্ব বা জিল্লীস্বরূপ, সে কারণে এতে মোটেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্মানের কোন হানি ঘটেনি।"

–(তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া–বাংলা অনুবাদঃ ২৮ পৃঃ)

(৩) আকায়েদের বৈষম্যসমূহের মধ্যে আরও একটি বিশেষ মাসাআলা হচ্ছে নাসেখ ও মনসুখের মাসাআলা। পবিত্র কোরআন শরীফ মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণ বিধান হিসেবে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য মুসলমানগণ এরূপ একটা মারাত্মক বিভ্রান্তিকর আকিদাও পোষণ করেন যে, কোরআনের আয়াতসমূহে ' নাসেখ ও মনসুখ' বিদ্যমান আছে। কারও মতে পবিত্র কোরানের পাঁচশত আয়াত, কারও মতে ২০০ আয়াত মনসুখ হয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ্‌)। কিন্তু আহমদীয়া জামাত এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় রাখে যে, যেহেতু পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌র পাক কালাম অর্থাৎ 'কালামুল্লাহ্‌' সে জন্য এর কোন আয়াত বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম অংশবিশেষও মনসুখ হয়নি এবং মনসুখ হবেও না। কেননা, ইহা সর্বপ্রকার দুর্বলতামুক্ত আল্লাহ্‌ পাকের বাণী।

তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে 'নাসেখ ও মনসুখের' মত মারাত্মক আকিদার গোড়া কোথায়। ইহা সর্বজনবিদিত যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর আগমনের জামানা হতে শুরু করে প্রথম ৩০০ বৎসরের যুগকে 'খায়রুল কারন্‌'-এর যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐ যুগে নাসেখ-মনসুখের নাম-গন্ধও ছিল না।

রসূলে করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেনঃ আমার খায়রুল কারন্‌-এর যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইসলামের পবিত্র এবং নির্ভেজাল আকিদাসমূহ বিকৃত হয়ে যাবে। বস্তুতঃ তাই ঘটেছে। হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আখের পর্যন্ত এ দীর্ঘ এক হাজার বৎসরে যুগকে হাদীসে 'ফাইজে আওয়াজ' বা 'বক্রযুগ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ যুগেই কতিপয় অপরিপক্ক, অদূরদর্শী রূহানী জ্ঞানশূন্য

লেখক কোরআন শরীফের গভীর তত্ত্ব এবং তথ্যসমৃদ্ধ আয়াতসমূহের প্রকৃত কর্ম উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়ে অথবা এক আয়াতে করীমার মূল্যবান ভাষ্য এবং অনুশাসনের সঙ্গে অপর মূল্যবান আয়াতে করীমাসমূহের ভাষ্য এবং অনুশাসনসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করতে অক্ষম হয়ে যখন অজ্ঞানতার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এক আয়াতকে নাসেখ অপর আয়াতকে মনসুখ ঘোষণা করতে থাকেন। কেউ কেউ এরূপ আয়াতের সংখ্যা ৫০০ বলেও উল্লেখ করেছেন।

'নাসেখ-মনসুখ' সম্পর্কে (ক) ইমাম ইবনে হাজিম আলফারসী, (খ) ইমাম মোহাম্মদ বিন হাজিম এবং (গ) ইমাম ইবনে সালমার প্রণীত 'আন্ নাসেখ ওয়াল মনসুখ' দ্রষ্টব্য।

ইমাম ইবনে হাজিম আলফারসী প্রণীত 'আন্ নাসেখু ওয়াল মনসুখু' কেতাবে লিখেছেন ঃ

اَلْمَكْتُوْبُ الْمَتْرُوْكُ حُكْمُهٗ وَالْعَمَلُ بِهٖ *

অর্থাৎ তাঁর মতে কোরআনের মনসুখ আয়াত উহাকেই বলা হয় যা কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু তার উপর আমল করা পরিত্যক্ত হয়েছে।

ইসলাম জগতের প্রখ্যাত ইমাম এবং মোজাদ্দেদ হযরত শাহ্ অলীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রাহ্ঃ) নাসেখ-মনসুখের মাসআলা নিয়ে গভীর গবেষণায় লিপ্ত হন। তাঁর রূহানী গবেষণার ফলশ্রুতিতে পূর্ববর্তী উলামাগণের ৫০০ পাঁচশত আয়াত মনসুখ হওয়ার অভিমতকে অযৌক্তিকপূর্ণ বলেই ঘোষণা করেন এবং তাঁদের ভ্রান্ত আকিদাকে নাকচ করে দিতে সমর্থ হন। এক আয়াতে করীমার ভাষ্যের সাথে অপর আয়াতে করীমায় উল্লিখিত ভাষ্যসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করে প্রকৃত মর্ম উদঘাটন করে শেষ পর্যন্ত তিনি এ সিদ্ধান্তেই নীত হন যে, মাত্র ৫টি আয়াতের মর্মে সামঞ্জস্য বিধান করতে যেয়ে যৎসামান্য গরমিল পরিলক্ষিত হয় বটে। আর বাদবাকী ৪৯৫টি আয়াতই সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়েছে। তিনি আরবীতে মন্তব্য করেছেন ঃ

لَا يَتَعَيَّنُ النَّسْخُ اِلَّا فِىْ خَمْسِ اٰيَاتٍ ٥

(تفسير فوز الكبير) –

অর্থাৎ মোহাদ্দেস দেহলভী (রাহ্ঃ)- তাহকীক অনুযায়ী মাত্র ৫টি আয়াত মনসুখ বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। –(তফসীরে ফওযুল কবীর)

শেষ পর্যন্ত কাদিয়ানে আবির্ভূত হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহ্তা'লা হতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করলেন ঃ

حق یہی ہے کہ حقیقی نسخ اور حقیقی زیادت

قران میں جائز نہیں - کیونکہ اس سے اس کی تکذیب لازم آتی ہے * —(الحق لدھیانہ ص ۹۱)

অর্থাৎ কোরআন শরীফে কোন আয়াতের সত্যিকার মনসুখ হওয়ার বা কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হওয়ার কোন অবকাশ নেই। যদি তাই হয় তবে (নাউযুবিল্লাহ্) কোরআন মিথ্যা সাব্যস্ত হয়ে যায়। —(আল্ হাকি; লুধিয়ানা (পাঞ্জাব)ঃ ৯১ পৃঃ)

এ কারণেই আহমদীয়া জামাত কোরআন শরীফে নাসেখ-মনসুখের আকিদার উপরে বিশ্বাস রাখে না। *

---

* টীকাঃ (১) আল্লামা জালালুদ্দিন সাইওতী (রাহ্ঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীর ইতকানেও (اتقان) পবিত্র কোরআনে নাসেখ ও মনসুখ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করে গেছেন এবং এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী উলামাদের ভ্রান্ত ধারণার খন্ডন করে গেছেন।

(১) ইদানিং উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত আলেম মৌলানা ওমর আহমদ ওসমানী পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে 'ফিকহুল কোরআন' নামক একখানা পুস্তক প্রকাশ করেছেন। উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় খন্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

برا ہو ہمارے شوق نسخ و تبدیل کا کہ ہم نے اپنی تفسیروں سے قران کی بے شمار آیات کو ایک دوسرے کا مخالف بنا چھوڑا ہے - اس طرح ہم نے قریبا آدھے قران کو منسوخ کر رکھا ہے - ناسخ و منسوخ کے متعلق کتابوں میں کئی سو منسوخ آیات کی نشاندہی کرتے ہوئے مولانا نے اس کی مدلل تردید کی ہے - —(فقہ القران - جلد ۲ - ص ۷۴)

অনুবাদঃ নিপাত যাক সেই শ্রেণীর মুসলমানরা যারা কোরআন শরীফের মধ্যে নাসেখ ও মনসুখ প্রমাণ করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন এবং এভাবে তারা স্বীয় তফসীরসমূহের মধ্যে কোরআন শরীফের অজস্র আয়াতকে এক আয়াত অপর আয়াতের মোখালেফ বা বিরোধাত্মক সাব্যস্ত করে, প্রায় অর্ধ কোরআন শরীফকেই মনসুখ সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, কোরআন শরীফের একটি আয়াতও মনসুখ নয়।

জেহাদ

'জেহাদ' অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে বর্তমান যুগের মুসলমানদের মধ্যে এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতেই তরবারির যুদ্ধে পরাজিত অমুসলমানদেরকে কলেমা পাঠ করিয়ে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হত। এটা একেবারে অমূলক, ভিত্তিহীন এবং প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আঁ হযরত (সাঃ)-এর জীবনে এরূপ ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত আছে যে, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে যেসব অমুসলমান বন্দী হত তাদিগকে স্ব-স্ব ধর্মমতে অক্ষুণ্ন রেখেই তদানীন্তন যুদ্ধ-বন্দি মুক্তির প্রচলিত নিয়ম মাফিক মুক্তি দেওয়া হত। বন্দিগণকে স্বীয় মুজাহেদগণের সঙ্গে নিয়মমাফিক সমপরিমাণ খাবার পরিবেষণ করা হত। একদা এমনও ঘটেছিল যে, এক যুদ্ধে বন্দিগণসহ শিবিরের সকল মুজাহিদগণের জন্য খাদ্যের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে রসূলে করীম (সাঃ)-এর আদেশে বন্দিগণকে প্রথমে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পরিবেষণ করা হয়েছিল। অতঃপর মুজাহিদগণ অবশিষ্ট খাদ্য জনপ্রতি যৎকিঞ্চিতহারেবন্টন করে সন্তুষ্টচিত্তে আহার করেন। কখনও কোন বন্দিকে অতিরিক্ত খাটান হয়নি, উত্যক্তও করা হয়নি, ধর্মান্তরিত করার জন্য ও কোন প্রচেষ্টা চালান হয়নি। *

বর্তমান মুসলমান সমাজে বিশেষতঃ উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতির অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন ভ্রান্ত আকিদার প্রচলন আছে যে, অমুসলমানদেরকে বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষা করাতে সমর্থ হলেই জেহাদের পুণ্য অর্জিত হয়। কিন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করছেন ঃ لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ অর্থাৎ "ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই "(২ঃ২৫৭)।

আসল কথা হচ্ছে যে, মধ্যযুগের লাগামহীন, সামঞ্জস্যহীন বিবরণীতে পূর্ণ পাঞ্জে পুঁথির অতিরঞ্জিত কিচ্ছা-কাহিনী হতেই জেহাদ সম্পর্কে ইসলাম বিরোধী এসব বিভ্রান্তিকর আকিদার সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এসব মতবাদের সুযোগে বিধর্মীরা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করার সুযোগ পেয়েছিল। বিশেষতঃ 'খৃষ্টান মিশনারীগণ' এরূপ ঘৃণ্য অপবাদ প্রচার করতে প্রয়াস পেয়েছিল যে, (নাউযুবিল্লাহ্) মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এক বিরাট দুর্ধর্ষ অস্ত্রধারী বাহিনীর নেতৃত্ব করতেন এবং তথাকথিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সেজে এক হাতে কোরআন ও অপর হাতে তরবারি ধারণ করে মানুষকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত রসূলে করীম (সাঃ)-এর পূতপবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে প্রমাণ করেছে যে,

---

* টীকাঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে এ অতুলনীয় মানবতাবোধ এবং মানবাধিকার রক্ষার যে মহান আদর্শের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন তা লক্ষ্য করেই মহামতি বার্নার্ডশ মন্তব্য করেছিলেন 'Humanity would have been incomplete without Mohammad.'

রসূলে করীম (সাঃ) এবং তদীয় সম্মানিত সহচরবর্গের অতুলনীয় রূহানী প্রভাব এবং দোয়ার মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত ও সম্প্রসারিত হয়েছিল। বলপূর্বক কাকেও ধর্মান্তরিত করণের আকিদাকে আহমদীয়া জামা'ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ইসলাম বিরোধী বলে গণ্য করে। আল্লাহ্‌তা'লা আরো এরশাদ করেছেন ঃ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

অর্থাৎ "সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক" (১৮ঃ৩০)। এতে দেখা যাচ্ছে ধর্ম গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে অমুসলমানদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

তবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ এ-ও এরশাদ করছেন ঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟

"যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল। কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে" (২২ঃ৪০)।

অর্থাৎ কাফেরগণ যখন ইসলামকে দুনিয়া হতে উৎপাটিত করার জন্য মুসলমানদের উপর চড়াও হয়েছিল তখন কেবল আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তা না হলে একত্ববাদ তথা তৌহীদকে টিকিয়ে রাখাই দুরূহ হয়ে উঠতো।

সুতরাং কোরআন শরীফের আলোকে আহমদীগণ এ আকিদা পোষণ করে থাকে যে, কাফের ও মুশরেকদের সঙ্গে নবী করীম (সাঃ)-এর যেসব যুদ্ধ হয়েছিল সেসব যুদ্ধ নিছক আত্মরক্ষামূলক ছিল। হুযূর (সাঃ) এসব যুদ্ধকে 'জেহাদে আসগর' অর্থাৎ ছোট জেহাদ বলে আখ্যায়িত করতেন। আঁ হযরত (সাঃ)-এর জামানায় এসব অস্ত্রযুদ্ধকে কখনও 'জেহাদে আকবর' বা জেহাদে কবীর' বলা হয়নি। তিরমীযি শরীফের হাদীসে আছে 'জঙ্গে তাবুক' থেকে ফিরে আসার পর আঁ হযরত (সাঃ) বলেছিলেনঃ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ ٥

অর্থাৎ আমরা ক্ষুদ্র জেহাদ হতে জেহাদে আকবরের (নফসের জেহাদ বা আত্মসংশোধনমূলক জেহাদের) দিকে ফিরে এসেছি।

কলমের জেহাদ

হযরত মির্যা সাহেব (সাঃ) বলেছেন ঃ

'দুশমনের সারি আমি পদদলিত করেছি

অসীর কর্ম আমি মসীতে সেধেছি।'

-(দুর্‌রে সামীন)

মধ্যযুগে খৃষ্টানদের ইসলামের বিরুদ্ধে বহুবার অস্ত্রযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ ঐসব যুদ্ধকে 'ক্রুসেড' নামে অভিহিত করেছেন। মুসলমানগণ ঐসব যুদ্ধসমূহের মোকাবেলা করেছিলেন অস্ত্র দ্বারাই।

কিন্তু বর্তমান যুগে ঐসব মধ্যযুগীয় আক্রমণ হতেও সহস্রগুণ প্রচন্ড আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছে ইসলাম। এ প্রচন্ড আক্রমণ চলছে কলমের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজ্যহারা, শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে শোচনীয়ভাবে অনগ্রসর মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে খৃষ্টান মিশনারীগণ ইসলাম এবং ইসলামের নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে অবান্তর ভিত্তিহীন কুৎসা রচনা করে বিষোদগার করতেছিল। পাদ্রীদের এসব কার্যক্রম ছিল প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম এবং চাতুর্যপূর্ণ এক নবপদ্ধতির ক্রুসেড। এরূপ মারাত্মক অভিনব পদ্ধতির ধর্ম যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের অস্তিত্ব যখন টলটলায়মান ছিল, তখন কলমের মাধ্যমে আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য মির্যা সাহেব (আঃ) 'কলমের জেহাদে'ই আত্মনিয়োগ করলেন।

হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বলেছেন, জেহাদ আমি মনসুখ করিনি বরং সাময়িকভাবে 'অস্ত্রযুদ্ধ স্থগিত' করেছি মাত্র। এ সম্পর্কে তিনি কবিতার ছন্দে বলেছেনঃ

فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ

عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دیگا التوا ٥

অর্থাৎ, সৈয়্যদে কাওনায়নে মুস্তাফা (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহের সময় তিনি তরবারি যুদ্ধকে স্থগিত করবে – রদ করবেন না।

–(দুর্‌রে সামীন)

সুতরাং অস্ত্রযুদ্ধের জেহাদ স্থগিত রাখা আর রদ করা এক কথা নহে। বিরুদ্ধবাদীগণ ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উঠিয়েছিল তা খন্ডন করতে যেয়ে মির্যা সাহেব (আঃ) তাঁর মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবির পূর্বেই জীবনের প্রথমে 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামক এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করে (প্রথমতঃ ৪র্থ এবং সর্বশেষে পঞ্চম খন্ডে সমাপ্ত করেন) তার মধ্যে খৃষ্টান মিশনারী এবং আর্য সমাজি পন্ডিতগণের উত্থাপিত ইসলাম বিরোধী আপত্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে সারা জীবনে তিনি ইসলামের সপক্ষে বহু পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌তা'লা হতে এ মর্মে ইলহামপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, তিনি 'সুলতানুল কলম' অর্থাৎ 'কলম সম্রাট'। এ সম্পর্কে তৎপ্রণীত চশমায়ে মারেফাতের ৮৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন ঃ

"مسیح موعود کے لئے "یضع الحرب" کا حکم آیا۔
یعنی جنگ کی ممانعت ہوگئی۔ اور تلواروں کی
لڑائیاں موقوف ہوگئیں۔ اور اب قلمی لڑائیوں کا
وقت ہے۔ اور چونکہ ہم قلمی لڑائیوں کے لئے آئے
ہیں۔ اس لئے بجائے لوہے کی تلوار کے لوہے کی
قلمیں ہمیں ملی ہیں۔ اور نیز کتابوں کے چھاپنے
اور دور دراز ملکوں تک ان تالیفات کے شائع کرنے کے
ایسے سہل اور آسان سامان ہمیں میسر آگئے ہیں کہ
گذشتہ زمانوں میں سے کسی زمانہ میں ان کی نظیر
پائی نہیں جاتی۔" —(چشمۂ معرفت - ص ۸۵)

অনুবাদ ঃ "হাদীস শরীফে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্য 'ইয়াজায়ুল হারবা' অর্থাৎ তারবারি যুদ্ধ রহিতকরণ আদেশ আছে। অর্থাৎ তারই মাধ্যমে তরবারিযুদ্ধ মওকুফ বা স্থগিত ঘোষণা করা হবে।" তিনি আরও লিখছেন যে, "এখন কলমের যুদ্ধের যুগ এবং আমাকে আল্লাহ্তা'লা এ উদ্দেশ্যেই কলমের যুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য পাঠিয়েছেন। সুতরাং লৌহনির্মিত তরবারির পরিবর্তে আমাকে লৌহনির্মিত কলম দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান যুগে পুস্তকাদি এবং প্রচার পত্রাদি ছাপাবার এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে ঐ-গুলো দূর-দূরান্তরে (দেশ-দেশান্তরে, ভিন্ন ভিন্ন জনপদসমূহে) পাঠানোর জন্য যেসব সহজতম এবং অনুকূল সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে ইতোপূর্বে আর কোন যুগে তা এরূপ সুযোগ সুবিধার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

তিনি আরও বলেনঃ ইসলামের উপর কলমের মাধ্যমে আক্রমণকারী পাদ্রীদের মোকাবিলায় আমাদের অলস বসে থাকা উচিত নহে। তবে মনে রাখতে হবে যে, তাদের সংগ্রামের মোকাবিলায় আমাদের সংগ্রাম 'হামরং' অর্থাৎ একই রং-এর একই ধরনের হওয়া উচিত। তারা (খৃষ্টান মিশনারীগণ) যে প্রকারের অস্ত্রের সাহায্যে তোমাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছে, তোমাদেরকেও ঠিক সেরূপ অস্ত্র নিয়েই তাদের মোকাবিলা করতে হবে। সেই অস্ত্র হচ্ছে 'কলমের অস্ত্র'। এ কারণেই ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা আমার নাম সুলতানুল কলম سلطان القلم রেখেছেন এবং আমার কলমকে আল্লাহ্তা'লা জুলফিকারে আলী ذوالفقار علی আখ্যা দিয়েছেন।
–(মলফুযাত, প্রথম জিলদ, ২২৪পৃঃ)

'জুলফিকারে আলী' সদৃশ এ কলম সম্পর্কে মির্যা সাহেব (আঃ) তাঁর রচিত কবিতায় ঘোষণা করছেন ঃ

صف د شمن کو کیا ہم نے بحجّت پا مال *
سیف کا کام قلم سے ہی د کھایا ہم نے -
نور د کھلا کے تہرا سب کو کیا ملزم و خوار *
سب کا د ل آتشی سوزاں سے جلا یا ہم نے ٥
(د رثمین)—

অর্থাৎ "ইসলামের শত্রুগণকে আমি পবিত্র কোরআন শরীফের অকাট্য যুক্তিরূপ ধারাল অস্ত্র দ্বারা হেস্তনেস্ত করে দিয়েছি এবং ইসলামের নূরকে কলমের মাধ্যমে প্রদর্শন করে সবাইকে অপরাধী সাব্যস্ত করে লাঞ্ছিতের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছি এবং এভাবেই ইসলামের সকল শত্রুর অন্তরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছি।

পবিত্র কোরআনের অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের সাদাকাত ও সত্যতা প্রকাশ করা একটা মহৎ কাজ। এ মহৎ কাজকেই কোরআনে 'জেহাদে কবীর' বলা হয়েছে, অস্ত্রযুদ্ধকে জেহাদে কবীর বলা হয়নি।

এরূপ সায়েফি ফাতাহ্ বা অস্ত্রযুদ্ধের মাধ্যমে কোনপ্রকার বিজয়ের অসারতা আলোচনা করতে যেয়ে মির্যা সাহেব (আঃ) 'এযালায়ে আওহামের' দ্বিতীয় খন্ড ৩৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

سیفی فتح کچھ چیز نہیں ... ... سچی اور
حقیقی فتح وہ ہے جو معارف اور حقائق اور کامل
صداقتوں کے لشکر کے ساتھ حاصل ہوں - سو یہ وہ فتح ہے
جو اب اسلام کو نصیب ہو رہی ہیں بلا شبہ یہ پیشگوئی
اسی زمانہ کے حق میں ہے ٥

অনুবাদ ঃ অস্ত্রযুদ্ধের বিজয়ে প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন সার্থকতা নেই। প্রকৃত মাআরেফ এবং হাকায়েকের (অন্তর্নিহিত তত্ত্বের) মাধ্যমে সত্যিকার রূহানী কামালত হাসেলকারী মোজাহেদগণ দ্বারা মানব হৃদয়ের উপর রূহানী প্রভাব বিস্তার করে যে বিজয় সংঘটিত হয়,উহাই প্রকৃত বিজয়। ইসলামের জন্য বর্তমানে যে এরূপ রূহানী বিজয় হতে চলেছে, তা দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 'ইয়াজাওল হারবা' ভবিষ্যদ্বাণীটি বর্তমান যুগের জন্যই করা হয়েছিল।

মোজাদ্দেদ ও ইসলাম প্রচার

ইসলাম প্রচার এবং জাতি হিসেবে এক কওম গঠনই ছিল রসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবনে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মতৎপরতা। সুতরাং নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শ ও সুন্নাহ্‌র প্রকৃত অনুসরণ বলতে প্রধানতঃ সারা বিশ্বের অমুসলিম সমাজে ইসলাম প্রচার এবং জাতিকে সুসংগঠিত করে বিশ্ব মুসলিমের সেবা করাকেই বুঝায়। এ কার্যক্রমের প্রতি যারা পরাণ্মুখ নিশ্চয়ই তারা আহলে সুন্নাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করতে পারে না

রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۭ

অনুবাদ ঃ "হে রসূল ! তোমার প্রভূর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে তাহা (লোকদের নিকট) পৌঁছাইয়া দাও, এবং যদি তুমি এইরূপ না কর তাহা হইলে তুমি তাঁহার পয়গাম আদৌ পৌঁছাইলে না"(৫ঃ৬৮)।

এ কারণেই রসূলে মকবুল (সাঃ) মহান কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য স্বীয় আরাম-আয়েস সব কিছু বিসর্জন দিয়ে, দিনরাত কেবল দোয়ায় মশগুল থাকতেন আর অবিরাম কঠোর পরিশ্রমে দিনাতিপাত করতেন। তৌহীদের প্রচার এবং বিশ্বমানব সমাজে ইসলামের সম্প্রসারণের নিমিত্ত রসূলে করীম (সাঃ)-এর উৎকণ্ঠাময় জীবনের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝

"অতএব, যদি তাহারা এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর উপর ঈমান না আনে তাহা হইলে কি তুমি তাহাদের জন্য দুঃখে আত্ম বিনাশ করিয়া ফেলিবে " (১৮ঃ৭) ? এতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কার্যক্রমই ছিল হুযুর (সাঃ)-এর জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য।

পবিত্র কোরআনে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌তা'লা এরশাদ করছেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ "এবং তোমাদের মধ্যে (সদা) এমন এক জামাত থাকা দরকার যাহারা কল্যাণের দিকে আহবান করিবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজ হইতে নিষেধ করিবে। বস্তুতঃ ইহারাই সফলকাম হইবে"

–(আলে এমরান ঃ ১০৫ আয়াত)।

সার্বজনীন ধর্ম ইসলামকে প্রচারের জন্য সর্বপ্রথম অবশ্য-কর্তব্য হচ্ছে কোরআন ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন ও যথাযথভাবে উহার সঠিক অনুশীলন করা। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় এ আবশ্যকতা পূরণ সহজ ছিল। কারণ, তিনি (সাঃ) তা বাস্তবায়ন করে দেখাতেন। লোকে নিঃসন্দেহে তাঁর (সাঃ) আদর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু সে অবস্থা পাল্টে গিয়ে এখন অন্যরূপ ধারণ করেছে। বর্তমান যুগে শত শত মাযহাবের অগণিত আলেম ইসলামের দোহাই দিয়ে পরস্পর বিরোধী কথা প্রচার করছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আলেমগণ নিজস্ব অভিমত অনুযায়ী হাদীসের ব্যাখ্যা করে বিবদমান অপরাপর মাযহাবগুলোকে কাফের বা গুমরাহ্ আখ্যা দিতেছেন। এমতাবস্থায় কার কথা গ্রহণ করব? কার কথাই বা বর্জন করব? বস্তুতপক্ষে বিবদমান মাযহাবের মধ্যে প্রত্যেকের একই আস্ফালন যে তারাই একমাত্র খাঁটি মুসলমান আর অন্যেরা সব ভ্রান্ত, গোমরাহ্, এমনকি কাফেরও।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

অনুবাদঃ "প্রত্যেকটি দলই তাহাদের নিকট যাহাকিছু আছে উহা লইয়া আনন্দিত"(৩০ঃ৩২)। আমরা এখন কীরূপে উহাদের দাবির সত্যতা যাচাই করতে সমর্থ হব? আসল কথা হচ্ছে, যখনই জগতে এরূপ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তখনই আল্লাহ্ কোন হোদায়াতকারী পাঠিয়ে জগদ্বাসীকে তাঁর সত্য পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে কোরআন শরীফে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾

অর্থাৎ "এবং ইহাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীগণের অধিকাংশ বিপথগামী হইয়াছিল। এবং অবশ্যই আমরা তাহাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠাইয়াছিলাম"-(৩৭ঃ ৭২-৭৩)।

ইসলাম প্রচারের কাজ প্রকৃতপক্ষে বিরাট কাজ। এক-দুইজন বা দশ-বিশজন মুসলমানের পক্ষে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে কার্য পরিচালনা মাটেই সম্ভব নহে। এর জন্য চাই ইসলাম বিশ্বাসীদের অকৃত্রিম সংহতি এবং তাক্ওয়া ও তাওয়াক্কাল আলাল্লাহের রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে বিপুল কর্মপ্রচেষ্টা। বস্তুতঃ সংহতির মূল কথা হল ব্যক্তিত্ব। মহান ব্যক্তিত্বের (এলাহি মদদপুষ্ট ব্যক্তিসত্তার) আকর্ষণ ব্যতিরেকে সংহতিও গড়ে উঠতে পারে না।

সত্যিকার ইসলাম প্রচারের জন্য সত্যিকার মানুষ চাই, যাদের দৃষ্টিশক্তি আছে, চিন্তাশক্তি আছে, অনুভূতি আছে, প্রেরণা আছে। প্রকৃতপক্ষে নেতার দৃষ্টিশক্তিই অনুসারীকে দৃষ্টিশক্তি দিতে পারে। নেতার চিন্তাশক্তিই তাদের চিন্তাশক্তি জাগ্রত করতে পারে। নেতার অনুভূতি তাদের মধ্যে প্রেরণা আনতে পারে। ইসলাম প্রচার করতে হলে প্রথমে চাই নেতা বা ইমাম। তবেই ইসলাম প্রচার সম্ভব হবে- অন্যথায় নহে।

পুরাতন তফসীরসমূহ (মধ্যযুগীয় তফসীর) যারা মুখস্থ করেছেন, ইসলামের আরকান ও আহকাম যারা কণ্ঠস্থ করেছেন এবং যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে যারা আমাদেরকে এ সমুদয় আহকাম শুনাচ্ছেন, তাঁদের নিকট নিশ্চয়ই আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রতি তাঁরা বহু দয়া করেছেন। তাঁরা এরূপ দয়া না করলে আজ হয়ত ইসলামের এ দেহটাও আমরা পেতাম না। তবে ইসলামের দেহটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নহে। আমরা চাই ইসলামের শক্তি, আমরা চাই ইসলামের প্রেরণা, আমাদের দেহ, মন ও মস্তিষ্কে চাই ইসলামের প্রবাহ। ইসলামের পবিত্র প্রবাহে আমাদের দেহ, মন ও মস্তিষ্ক পবিত্র করতে চাই। আমরা পবিত্র হব, মানবসমাজকে পবিত্র করব। ইনশাআল্লাহ্।

পুরাতন তফসীরসমূহ এবং ইসলামের বাহ্যিক আরকান ও আহকামের তালিকা এ শক্তি দিতে পারেনি, পারছে না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। পুরান-পন্থী আলেম সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করি না। তাঁদের প্রতি আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখি। কেননা, তাঁদের নিকট থেকে যা পাচ্ছি যথাসম্ভব তা গ্রহণ করছি। তাঁদের নিকট থেকে যা পাই না তা অন্বেষণ করতে হবে। সত্য কথা হলো যে, বহুকাল পূর্ব হতেই পুরাতন-পন্থী আলেমগণ নেতৃত্বের আসন হারিয়েছেন। তাঁদের কথায় আসর নেই। লোকেরা এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে তা বের করে দেয়। ইসলাম প্রচার তাদের কাজ নহে। তা তারা করছেন না, করার যোগ্যতাও রাখেন না

আমার উপরোক্ত বক্তব্য মূল্যায়ন করার জন্য আমি একটি সত্য ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না, দেশ বিভাগের পূর্বে একবার ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশসমূহে ইসলামের তবলীগ প্রসঙ্গে মহাদেশের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, দৈনিক জমীন্দার পত্রিকার মালিক এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার অন্যতম সদস্য মৌলানা যাফর আলী খান সাহেবের সভাতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি গোলটেবিল আলোচনার কথা উল্লেখ করছি।

একদা মৌলানা যাফর আলী খান সাহেবের সভাপতিত্বে ইউরোপে ইসলামের তবলীগের জন্য মোবাল্লেগ পাঠানোর প্রসঙ্গে একটি বিশেষ আলোচনা সভা লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত সভায় দেশের বড় বড় নেতা ও দৈনিক পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিকগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মৌলানা চেরাগ হাসান হাসরাত, মৌলানা গোলাম রসূল মেহের এবং মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত সভায় বহু আলোচনা ও বাদানুবাদের পর স্থির করা হলো যে,ইউরোপে ইসলামের তবলীগের জন্য মৌলানা যাফর আলী খানকে লন্ডনে, মৌলানা আবুল কালাম আযাদ সাহেবকে ফ্রান্স ও জার্মানীতে এবং আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবালকে চীন দেশে প্রেরণ করা হবে।

অতঃপর এ মহান তবলীগের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের বিষয়ও উক্ত সভায় আলোচনা করা হলো। আলোচনায় স্থির হলো যে, উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমানের নিকট হতে অন্ততঃ দশলক্ষ টাকা সংগ্রহ করা যেতে পারে। আর এ দশলক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে হলে কমপক্ষে আরো একলক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে তখন উপস্থিত

একজন বর্ষীয়ান নেতা বলে উঠেন যে, যদি এ একলক্ষ টাকা তারা তার হাতে জমা দিয়ে দেন তাহলে তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিকট হতে দশলক্ষ চাঁদা সংগ্রহ করার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছেন।

ঐ মুহূর্তে উক্ত সভায় 'পিন পতন' নীরবতা বিরাজমান ছিল। তখন মৌলানা যাফর আলী খান তাঁর ফর্‌সী হুক্কায় গুড় গুড় টান দিতে দিতে আক্ষেপের সাথে বলে উঠলেন- "হ্যাঁ ভাই, ইয়েহি ত মুশকিল হ্যাঁ" অর্থাৎ এ কাজটাতো বড় কঠিন।

অতঃপর উক্ত সভার সব কার্যক্রমের এখানেই সমাপ্তি ঘটলো, আর ইউরোপে ইসলামের তবলীগের মহা-পরিকল্পনা মৌলানা সাহেবের হুক্কায় ধোঁয়ার কুন্ডলীর মতই নিমিষে বিলীন হয়ে গেল।

-(মৌলানা চিরাগ হাসান হাসরাত রচিত 'মারদামে দিদা' পুস্তকঃ ১৫২ পৃঃ)

বস্তুতঃ এরূপ কাজের জন্য চাই উপযুক্ত নেতা; উপযুক্ত নেতার অধীনে চাই উপযুক্ত প্রচারক বাহিনী। এরূপ প্রচারক বাহিনীর সুশৃঙখল কার্যনির্বাহের জন্য চাই প্রয়োজনীয় সংগঠন।

বর্তমান জামানায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বব্যাপী আদম সন্তানের দ্বারে দ্বারে ইসলাম প্রচারের মহান কার্য পরিচালনায় যোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার অধীনে একমাত্র আহমদীয়া জামাত ব্যতিরেকে দ্বিতীয় আর কোন সংগঠন কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইসলামই আল্লাহ্‌তা'লার মনোনীত ধর্ম। আল্লাহ্‌তা'লা কেয়ামত পর্যন্ত এ ধর্মকে বলবৎ রাখবেন এবং প্রয়োজন মত মুসলমানদের মধ্যে তিনি ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের উদ্ভব করতে থাকবেন। এ উম্মতের মোজাদ্দেদের আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীসে আল্লাহ্‌তা'লার এ ওয়াদাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বলতে কি বুঝায়? ইসলামের অন্যতম মূল কথা হচ্ছে 'ঐশী বাণীবাদ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট হতে ঐশী বাণী বা ওহী-এলহাম পাওয়া। যিনি যে পরিমাণে ও যতটা স্পষ্টভাবে ঐশী বাণী পাবেন তাঁর ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও ততটা প্রসারিত হবে। যিনি ওহী-এলহাম পান না বা পাবেন না, তিনি যত বড় আলেমই হউন না কেন, ইসলামের জন্য উচ্চ ব্যক্তিত্ব নহেন।

প্রচুর পরিমাণে সুস্পষ্ট ওহী ইলহাম পাওয়া নবী-রসূলের বৈশিষ্ট্য। যারা নবী-রসূল নন, ওহী-ইলহাম পাওয়া তাদের পক্ষেও অসম্ভব নহে।

এ কথা সুনিশ্চিত যে, এ উম্মতের জন্য ওহী-ইলহামের দ্বার অবারিত রয়েছে। অবশ্যই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে, পবিত্র কোরআন সর্বশেষ বিধান, পরিপূর্ণ জীবন-বিধান এক কথায় আখেরী শরীয়ত। কেয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের কোন-রূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংশোধন হবে না। তবে এ কথার এই অর্থ নহে যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর আর কারও উপর আল্লাহ্‌র ওহী এলহাম নাযিল হবে না। কোরআন ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আলেমগণের মধ্যে যেসব ব্যাপারে মতান্তর সৃষ্টি হয়েছে ও হয়ে চলেছে, আল্লাহ্‌তা'লা হতে ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে অপর কেউ সেসব এখতেলাফ নিরসনের জন্য সন্দেহমুক্ত নির্ভেজাল মীমাংসা করবে কি প্রকারে?

অতীতে এ উম্মতের বহু অলী ও বুযুর্গানে-দীন ওহী-এলহাম লাভ করেছেন। হযরত সৈয়্যদ আবদুল কাদির জিলানী, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি, হযরত ইমাম গাজ্জালি, একাদশ শতাব্দির মোজাদ্দেদ মোজাদ্দেদে আলফেসানী বলে খ্যাত সৈয়্যদ আহ্‌মদ সরহিন্দি এবং দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত শাহ অলী-উল্লাহ্‌ মোহাদ্দেস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহে আলায়হিম) প্রমুখ বুযুর্গগণ এলহাম প্রাপ্তদের তথা সাহেবে এলহামের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এছাড়াও এই 'খায়েরে উম্মতে' সাহেবে এলহাম বুযুর্গানের আরও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কোন কোন পুরাতন পন্থী মৌলবী-মৌলানা সাহেব জিদের বশবর্তী হয়ে সরল প্রকৃতির জনসাধারণের সমক্ষে জোর গলায় এরূপ প্রচারে মেতে উঠেছেন যে, ওহী-এলহামের দ্বার একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং প্রহেলিকা বৈ আর কিছুই নহে।

(১) মোসলেম শরীফের হাদীসে হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ শেষ জামানায় আগমনকারী ঈসা (আঃ) এ দুনিয়াতে আবির্ভূত হওয়ার পর তাঁর উপর ওহী নাযেল হবে। যথাঃ

أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى أَنْ حَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ *

—(مسلم شريف)

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌ ঈসা (আঃ)-কে ওহী করবেন যে আমার বান্দাগণকে طُور (তুর) পর্বতের দিকে নিয়ে যাও।"

—(মোসলেম শরীফ এবং আলামতে বায়না ইয়াদিস্‌-সাআতে)

(মিশকাত শরীফঃ ৪৭৩ পৃঃ)

(২) প্রখ্যাত মোফাসসেরে কোরআন . . . . । আল্লামা আলোসী (রাহঃ) প্রণীত বিখ্যাত 'তফসীরে রূহুল মায়ানীতে' লিখেছেনঃ এরূপ একটি ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত জনসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুর পরে জিব্রাইল (আঃ) এ পৃথিবীতে আর কোন ওহী নিয়ে আসবেন না।

"لَا أَصْلَ لَهُ" অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আল্লামা আলোসী (রাহঃ) আরও বলেছেন ঃ

يُوحَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحْيَ حَقِيقِيٍّ ـ

—(تفسير روح المعانى - جلد ٧)

(مصرى چهاپه - ٦٥ ر ٥)

অর্থাৎ আগমনকারী মসীহ্-মাওউদ (আঃ)-এর উপর হাকীকি ওহী নাযিল হবে।

উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার অন্তর্ভুক্ত উপরোক্ত সাহেবে ইলহাম (ইলহামপ্রাপ্ত) বুযুর্গগণেরই অনুরূপ কাদিয়ানে (পাঞ্জাবে) আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহ্তা'লার তরফ থেকে ওহী-ইলহামপ্রাপ্ত হয়েই চতুর্দশ হিজরীর মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবি করেছেন।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত মানবসমাজে এযুগের মুসলমান জাতি ধর্মীয়ভাবে শতধা বিচ্ছিন্ন এবং একেবারে সহায়-সম্বলহীন। তাদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামের হুকুম-আহকামসমূহের অনুশীলন ও বিশ্বজোড়া তা প্রচারের ব্যবস্থা করা সহজ ব্যাপার নহে। এ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সমাধা করা তাঁর পক্ষেই হবে সম্ভব যাঁর উপরে প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট ওহী-এলহাম নাযিল করে আত্মিক জ্ঞানে এবং অভিজ্ঞতায় আল্লাহ্ যাকে অতীতের নবীদের তুল্যই শক্তিশালী করেন। হাদীসেও এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে ঃ

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ -

অর্থাৎ আমার উম্মতের সত্যিকার আলেমগণ বনী ইস্রাঈলের নবীদের তুল্য হবেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবিও ইহাই যে 'খাতামান্-নাবীঈন' রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুসারী হওয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্তা'লা তাঁকে অতীতের নবীদেরই তুল্য রূহানী শক্তি দ্বারা আশীষযুক্ত করেছেন। তিনি নবীসদৃশ রূহানী শক্তির অধিকারী হয়েও কোন নতুন শরীয়তদাতা নহেন এবং প্রচলিত ইসলামী শরীয়তের তথা 'আল্-কোরআনের' শিক্ষার পরিবর্তনকারী, পরিবর্ধনকারী বা সংশোধনকারী নহেন। বরং কোরআনে মূল ও খাঁটি শিক্ষা প্রচার করাই তাঁর কাজ এবং একমাত্র এ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই এ যুগে আল্লাহ্ তাঁকে প্রত্যাদিষ্ট তথা মামুর করেছেন। তাঁর উপর আল্লাহ্র এরূপ এক ওহী নাযেল হয়েছে ঃ

يُحْيِي الدِّينَ وَيُقِيمُ الشَّرِيعَةَ - (تذكرة)

অর্থাৎ দীন-ইসলামকে জিন্দা করা ও শরীয়তকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই তাঁর প্রধান কাজ অন্য কথায় কোরআনের ভাষায় ঃ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী" (৪ঃ৬০)।

মোতাবেক এযুগে তিনিই একমাত্র 'উলিল আমর' (কাবেলে এতায়াত নেতা)। সুতরাং মুসলমানদেরকে সংগঠনের জন্য এবং অমুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য এ যুগে তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করাই প্রত্যেক মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ)–এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে ঃ

ثُمَّ تَكُونُ الْخِلَافَةُ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ۔

—(مشكوٰة ۔ كتاب الفتن ص ۴۶۱)

অতঃপর নবুওয়তের তরীকায় খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

–(মিশকাত-কেতাবুল ফিতনঃ ৪৬১ পৃঃ)

এ হাদীসটির আলোকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লা হতে এ মর্মে ইলহামপ্রাপ্ত হন যে,তাঁর ওফাতের পর নবুওয়তের কায়দায় বা পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। ভবিষ্যদ্বাণীরূপে তিনি একথা প্রচারও করেন। তদনুযায়ী খেলাফতও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত এ ঐশী খেলাফত অব্যাহত গতিতে চলবে ইনশাল্লাহ্‌। অতএব ঐ খেলাফতের রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা এবং বিচ্ছিন্নতা হতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখাই হবে প্রকৃত মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

আলফে আখেরের মোজাদ্দেদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, "খোদাতা'লা চাচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে, তাঁরা ইউরোপেই বাস করুন, বা এশিয়াতেই বাস করুন, তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত দাসগণকে, এক ধর্মে আনয়ন করেন। ইহাই খোদাতা'লার অভিপ্রায় বা মানশায়ে এলাহি। এ কাজের জন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।"

–(আল্‌-ওসীয়্যত- বঙ্গানুবাদঃ ১০ পৃঃ)

মসীহ্‌ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইসলামের পুনরুত্থান এবং নবজাগরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লা হতে ইলহামপ্রাপ্ত হয়ে যেসব সুসংবাদ লাভ করেছেন, তন্মধ্যে গুটিকতক নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

"بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید ۔
و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد ۔"

—(تذکرہ)

অনুবাদ ঃ "আনন্দিত হও, তোমার বিজয়কাল সমুপস্থিত। মুহাম্মদীয়গণের পদ মিনারোপরি উচ্চ শিখরে সংস্থাপিত হয়েছে।"

(২) I shall give you a large party of Islam.

(৩)

میں تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا ۔

অনুবাদ ঃ "আমি তোমার নামকে তথা যশকে দুনিয়ার কিনারা (প্রত্যন্তাঞ্চল) পর্যন্ত পৌছিয়ে দেব।"

(৪) ”میں دیکھتا ہوں کہ بڑا بھرا زخّار کی طرح

دریا ہے ۔ جو سانپ کی طرح بل پیچ کھاتا ہوا مشرق سے

مغرب کی طرف جا رہا ہے ۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے

سمت بدل کر مغرب سے مشرق کو اُلٹا بہنے لگا ۔“

অনুবাদঃ “আমি কাশ্‌ফী অবস্থায় দিব্য দর্শনে দেখলাম, কোন এক উত্তাল তরঙ্গময় প্রবহমান নদী সাপের মত বাঁক খেতে খেতে পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এবং দেখতে দেখতে সে অবস্থাতেই উহা দিক পরিবর্তন করে পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে উল্টা প্রবাহিত হতে লাগল।”

এ দিব্য-দর্শনের তাৎপর্য ইহাই যে, পাশ্চাত্যের লোক আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান রূপ প্রস্রবণের দিকে আকৃষ্ট হয়ে প্রাচ্যের লোক যেভাবে পাশ্চাত্যের দিকে ধাবমান ছিল, অদূর ভবিষ্যতে তা পাল্‌টে যাবে এবং দেখতে দেখতে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত জাতিসমূহ ইসলাম ও আহমদীয়তের রূহানী জ্ঞানরূপ প্রস্রবণ হতে জ্ঞান আহরণের জন্য (مشرق کی طرف) প্রাচ্যের দিকে ছুটে আসতে থাকবে।

(খ) এরূপ আশ্চর্যজনক অভূতপূর্ব আবর্তন-বিবর্তনের ফলে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সেই মশহুর ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণতা লাভ করবে যাতে হুজুর এরশাদ ফরমায়েছিলেন ঃ

”تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ ۔“ —(حدیث)

অর্থাৎ ইসলামের সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদয় হবে।

গ) পশ্চিম দিক হতে ইসলামের সূর্য উদয় সম্পর্কে হযরত মসীহ-মাউদ (আঃ)-এর একটি উল্লেখযোগ্য রুইয়া তৎপ্রণীত মশহুর কেতাব ‘এযালায়ে আওহামে’ লিপিবদ্ধ আছে ঃ

”طلوع شمس کا جو مغرب کی طرف سے ہوگا ۔ ہم

اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں ۔ لیکن اس عاجز پر

جو ایک رویاء میں ظاہر کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو مغرب کی

طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک

مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر و ضلالت میں ہیں ۔

آفتاب صداقت سے منوّر کئے جائیں گے ۔ اور ان کو

اسلام سے حصہ ملیگا ۔“

'আখেরী জামানাতে পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় হওয়ার যে কথা আছে এর উপর আমি পূর্ণ ঈমান রাখি। এ সম্পর্কে একটি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা আমার কাছে যা প্রকাশ করেছেন তা হলোঃ مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا "পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হবে"

'পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় কথাটির তাৎপর্য ইহাই রাখে যে, সুদীর্ঘকাল যাবত কুফরী এবং গুমরাহির অন্ধকারে নিপতিত পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিবাসীরা আফতাবে সিদক্ তথা সত্যের সূর্য হতে অর্থাৎ ইসলামের সত্যতার আলোকবর্তিকা হতে রূহানী নূর আহরণ করে আলোকিত হবে অর্থাৎ পবিত্র ইসলামে দীক্ষিত হবেন।

-(তাযকেরাঃ ১৮৩ পৃঃ)

(৫) এ সম্পর্কে তাঁর আরও একটি রুইয়ার বিষয়ে তিনি লিখেছেনঃ

"میں نے رویاء میں دیکھا کہ میں شہر لنڈن میں
منبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت
مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔
بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے
چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ان کے
رنگ سفید تھے۔ اور شاید تیتر کے جسم کے
موافق ان کا جسم ہوگا۔ سو میں نے اس کی یہ تعبیر کی
کہ اگرچہ میں نہیں۔ مگر میری تحریریں ان لوگوں
میں پھیلیں گی اور بہت سے راستباز انگریز صداقت کا
شکار ہو جائیں گے۔"
—(ازالہ اوہام - ص ۵۱۵-۵۱۶)

অনুবাদ ঃ "স্বপ্নে দর্শন করলাম যেন লন্ডন শহরের এক মিম্বরের উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি এবং ইসলামে সত্যতা সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় একটি যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি প্রদান করছি। অতঃপর আমি বহু পাখী ধরেছি এবং সব পাখী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে বসেছিল ও উহাদের রং ছিল সাদা; সম্ভবতঃ ঐ পাখীগুলোর আকৃতি তিতর পাখীর আকৃতিসদৃশ ছিল।

সুতরাং এ রুইয়াটির তাবিরও আমি ইহা করতেছি যে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি সেখানে না-ও যেতে পারি তবুও ইসলামের দিকে আহ্বান সম্বলিত আমার

প্রকাশনাসমূহ তাদের মধ্যে প্রচারিত হবে এবং বহুসংখ্যক সৎ স্বভাবাপন্ন ইংরেজ ইসলামের সত্যতার শিকার হবে।" —(এযালায়ে আওহামঃ ৫১৬ পৃঃ)

(৬) তাযকেরা ৪৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হযরত মসীহ্ মাওউদ-এর এরূপ আরও একটি এলহামের উল্লেখ রয়েছে ঃ

اِنِّی مَلَکْتُ الشَّرْقَ وَالْغَرْبَ — (تذکرہ۔ صر ۴۹۳)

"আমি মশরেক এবং মগরেবের মালিক হয়েছি" অর্থাৎ "প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এ উভয় এলাকার দেশসমূহে আমার মিশন প্রচারিত এবং প্রসারিত হবে।"

(৭) শুধু প্রাচ্য-প্রতীচ্যই নহে বরং পৃথিবীর প্রতিটি জনপদের প্রতিটি এলাকাতেই ইসলাম তথা আহমদীয়তের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়ে পড়বে। মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লা এলহাম যোগে জ্ঞাত করেছেন ঃ

دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا۔
مگر خدا اسے قبول کریگا۔ اور بڑے زور آور حملوں
سے اس کی سچائی ظاہر کر دیگا۔"

অনুবাদঃ "পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাঁর সত্যতা জগতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরূপ আরও একটি এলহামঃ

"میں تجھے برکت پر برکت نازل کروں گا۔ یہاں تک
کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت حاصل کریں گے۔"

(تذکرہ) —

"তোমার প্রতি আমি এমনই উপর্যুপরি রূহানী আশীষসমূহ বর্ষণ করতে থাকব যে, বাদশাহ্‌গণ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।"

(৮) (ক) ইসলামের পুনরুত্থান বা আহমদীয়তের ভবিষ্যত প্রগতি প্রসঙ্গে অধিকতর আলোকপাত করতে যেয়ে মির্যা সাহেব (আঃ) বলেছেনঃ

"মামুর (মামুর মিনাল্লাহ্) বা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে এ পৃথিবীতে আমার আবির্ভাব হওয়ার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মানুষ এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তা'লার মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে যেরূপ শোচনীয় নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীভূত করে মানবজাতি এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ ভালবাসার সম্পর্ককে পুনঃ সংস্থাপিত করে দেওয়া এবং প্রকৃত সত্যতার বিকাশ সাধন করে পরস্পর কলহ-বিবাদে মত্ত বিবদমান সম্প্রদায়গুলোর মতবিরোধ এবং ঝগড়া-ফাসাদ সমূলে উৎপাটিত করে

তদস্থলে প্রেম-প্রীতি এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমঝোতা ও পরিবেশ আনয়ন করা এবং পৃথিবীর মানুষের জ্ঞানচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত ধর্মের অন্তর্নিহিত সুপ্ত মৌলিক সত্যসমূহ পুনরুদ্ধার করা। বর্তমান যুগের বস্তুবাদিতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত মানুষের হৃদয় হতে অপসারিত এবং সম্পূর্ণ বিলুপ্ত রূহানী শক্তিসমূহকে আল্লাহ্ প্রদত্ত জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বিকাশ সাধন করা; এবং পুরাতন বানওয়াট কিচ্ছা-কাহিনী ও ভিত্তিহীন প্রচলিত কিংবদন্তিসমূহের মন্দ প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালনের ফলশ্রুতিতে এবং দোয়ার মাধ্যমে লব্ধ খাঁটি ধর্মজ্ঞানের প্রকৃত ব্যাখ্যা বর্ণনা করা; এবং ধরাপৃষ্ঠ হতে অধুনালুপ্ত খাঁটি তৌহীদকে পুনরায় মানব সমাজের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠাকল্পে রূহানী বীজ বপন করে দেওয়া; তবে এরূপ মহান কার্য আমার ব্যক্তিগত শক্তি দ্বারা সম্ভব নহে। বরং ইহা সেই খোদাপ্রদত্ত শক্তি দ্বারাই সাধিত হবে যিনি আসমান ও জমীনের খোদা।"

–('লেকচার লাহোর'-১৯০৪ সনঃ ৪৭ পৃঃ)

(খ) তদনুরূপ হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক ফতেহ্ ইসলামে (বঙ্গানুবাদ ১৩-১৪ পৃঃ) এ সম্পর্কে আরও বিবৃতি দিতেছেনঃ সত্যের বিজয় হবে এবং ইসলামের জন্য পুনরায় সে সজীবতা ও উজ্জ্বলতার দিন এসে যাবে যা পূর্বে বিদ্যমান ছিল; এবং পুনরায় সে সূর্য স্বীয় পূর্ণ প্রতাপ সহকারে উদিত হবে যেমন পূর্বে উদিত হয়েছিল। কিন্তু এখনও এরূপ হয়নি। যে পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমে আমাদের রক্ত জলে পরিণত না হবে; আমরা আমাদের যাবতীয় আরাম তাঁর বিকাশের জন্য বর্জন না করব এবং ইসলামের গৌরবের জন্য সকল অপমান বরণ না করব, সে পর্যন্ত আকাশ সেই সূর্যের উদয় স্থগিত রাখবে। ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট হতে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়; উহা কী? উহা এ পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। এ মৃত্যুর উপরেই ইসলামের জীবন, মুলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমার বিকাশ নির্ভর করে। বস্তুতঃ ইহারই অপর নাম ইসলাম। খোদাতা'লা এ ইসলামকে সঞ্জীবিত করতে ইচ্ছা করেন। এ সুমহান কার্য সাধনে জন্য তাঁর তরফ হতে এক মহা পরিকল্পনা (যা সকল দিক দিয়ে ফলপ্রদ হয়) প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ছিল। তাই সেই মহাজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান খোদা জগদ্বাসীর সংস্কারের জন্য এ অধমকে প্রেরিত করে, তাই করেছেন। –(ফতেহ ইসলাম)

আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয়

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমনকারী মোজাদ্দেদ এবং ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সিলসিলায়ে আলিয়া আহমদীয়া-এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে 'ইসলামের বিশ্ব-বিজয়'। এ উম্মতের প্রখ্যাত মোফাস্‌সেরে কোরআন বুযুর্গগণ পবিত্র কোরআনের আয়াতে করীমা "লেইয়ুযহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহির' ব্যাখ্যা করতে যেয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একই অভিমত পোষণ করছেন যে, ইসলামের আলমগীর গালবা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী বিজয়, আগমনকারী ইমাম মাহদী (আঃ) দ্বারাই সংঘটিত হবে। ইহা আল্লাহ্‌ তালার চিরন্তন নীতি যে,হেদায়াতের প্রাথমিক যুগ অর্থাৎ আদম (আঃ)-এর যুগ হতে আমাদের সরওয়ারে কায়েনাত রসূলে করীম (সাঃ) পর্যন্ত যত নবী এসেছেন, প্রত্যেক নবীকেই শত শত দ্বন্দ্ব-ক্লেশ আর বিড়ম্বনাময় জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। তবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সর্বশেষ পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে, আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র মামুরই বিজয় লাভ করেছেন। কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌ এরশাদ করছেন ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ

"আল্লাহ্‌ ফয়সালা করিয়া লইয়াছেন ঃ নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূল বিজয়ী হইব " –(৫৮ঃ২২)।

তবে ইহাও আল্লাহ্‌তা'লার শাশ্বত বিধান যে, কোন কোন নবীর বিজয় আসে ত্বরিত গতিতে, আবার কোন নবীর বিজয় আসে মন্থর গতিতে, অগণিত ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে। ক্ষিপ্র গতিতে বিজয়ের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না বলে কেউ কেউ এমন প্রশ্নও করে থাকেন যে, মাত্র ৫০/৫৫ বৎসরের ভিতরেই যেখানে অজস্র ঝড়-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বিরামহীন ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমনই বিরাট বিজয় এসে গিয়েছিল এবং আশ্চর্যরূপে তখনকার পরিচিত দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ ইসলামের করতলগত হয়ে গিয়েছিল, এমন কি আল্লাহ্‌র বিশেষ ফযলে তদানীন্তন দুনিয়ার দুই বৃহৎ রাজশক্তি পারস্য এবং রোম ইসলামের নিকট মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছিল, সেখানে মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর দাবির পর আজ প্রায় শতবর্ষ যাবত অগণিত মোখালেফাতের মোকাবিলায় অমানুষিক অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিপীড়ন অতিক্রম করে, কোরবানীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের পরেও বিজয় সুদূর পরাহত বলে মনে হচ্ছে। কারণ, ক্ষিপ্র গতিতে মোখালেফাতের তৎপরতা বৃদ্ধি চতুর্দিকে বাতেল খেয়ালাত তথা বস্তুতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাসমূহের সম্প্রসারণ,তৌহীদ বিরোধী সংস্থাসমূহের ক্রমাগত শ্রীবৃদ্ধি, সমাজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পলিদ (অপবিত্র) কার্যক্রমের ছড়াছড়ি এবং চাকচিক্য দৃষ্টে এ মহল ঘাবরিয়ে যাচ্ছেন এবং বলেছেন 'মাতা নাসরুল্লাহ্‌' -আল্লাহ্‌র সাহায্য কোথায়? জামালি শানে আবির্ভূত এলাহি মোসলেহ্‌ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিলসিলার অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাবেই তাঁদের এ হতাশাব্যঞ্জক মনোবেদনার কারণ।

কেউ কেউ এরূপ বদ্ধমূল ধারণাই পোষণ করতেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হওয়া মাত্রই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ন্যায় দ্রুতগতিতে সারা দুনিয়ায় ইসলামের আলমগীর গালবা এসে যাবে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বিভিন্ন ধর্ম সংস্কারককে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়াকেফহাল না থাকার কারণেই কোন কোন মহলে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, রূহানী মোসলেহ বা ধর্ম সংস্কারক দু'প্রকারে হয়ে থাকেঃ (১) জালালি (جلالی) এবং (২) জামালি (جمالی)। এমন নবী-রসূল যাঁরা নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন তাঁরা জালালি (শক্তি প্রকাশক)। যেমন হযরত মূসা (আঃ) এবং মসীলে মূসা (মূসার সদৃশ) সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) (১) শরীয়তধারী মোসলেহ সাধারণতঃ এরূপ হয়ে থাকেন যে, তাঁরা 'জালালি' শান নিয়ে আসেন। তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত এমনই এক প্রকারে বিদ্যুতের ঝলসানি এবং বজ্রপাতের হুঙ্কারসদৃশ রূহানী আলোকে তেজোদ্দীপ্ত হয়ে আসেন যে, তাঁদের দাবির দিবস থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি মুহূর্তে প্রগতির স্রোত প্রবহমান থাকে যে, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁদের পতিষ্ঠিত সিলসিলাকে অসম্ভবরূপে এবং অভিনব ও কল্পনাতীত পদ্ধতিতে সাফল্যমন্ডিত করে জগতে রেখে যান। যেরূপ সংঘটিত হয়েছিল হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সময়।

(২) পক্ষান্তরে, অপর এক প্রকারে মুসলেহ হচ্ছেন 'জামালি' (সৌন্দর্য বিকাশক) নবী। যাঁরা নিজস্ব কোন শরীয়ত নিয়ে আসেন না বরং পূর্বের কোন প্রচলিত শরীয়তকে পরিচালিত করবার জন্য আগমন করেন, যেমন হযরত ঈসা (আঃ)। এরূপ জামালি ভূষণে বিভূষিত হয়ে যাঁরা বিধান-বিহীন নবী হন এবং পূর্ববর্তী শরীয়তকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে আসেন, জালালি নবীদের মত এত ক্ষিপ্র গতিতে তাঁদের কার্য সাধিত হয় না। যেমন, হযরত ঈসা (আঃ) মূসায়ী শরীয়তের অধীনে আগমন করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতকে সুদীর্ঘ ৩০০ বৎসর পর্যন্ত উপর্যুপরি উৎপীড়ন, নিপীড়ন, অমানুষিক যুলুম-অত্যাচার এবং বিভীষিকাময় হত্যাকান্ডের শিকার হতে হয়েছিল। তিনশত বৎসর ধরে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার পর কৃতকার্যতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। সূরা 'কাহ্ফে' উল্লেখিত 'আসহাবে কাহ্ফের' ঘটনা পর্যালোচনা করলে এর সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় যে, মসীহ্-নাসেরীর অনুসারীগণকে লোকালয় হতে বহু দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের পার্বত্য গুহাসমূহে দীর্ঘকাল যাবত দিনাতিপাত করতে হয়েছিল।

বাইবেলের মথি পুস্তকের ৮ অধ্যায় ২১ নং আয়াতে উল্লেখ আছে, "শৃগালদের বসবাসের জন্যও গর্ত আছে এবং আকাশের পক্ষীকুলেরও নীড় আছে। কিন্তু মনুষপুত্রের (অর্থাৎ যীশুর) মাথা গুজারও ঠাঁই নাই।" বাইবেলের এ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্ নাসেরী যতদিন জীবিত ছিলেন পৃথিবীতে তাঁর ও তাঁর শিষ্যবর্গের কোথাও বসবাসের কোন স্থান নির্ধারিত ছিল না। তদনুরূপ আঁ হযরত (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শরীয়তের অধীনে বিধান বিহীন 'উম্মতি নবী' হয়ে এসেছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। সুতরাং আঁ হযরত (সাঃ)-এর শরীয়তকে কৃতকার্যতার সহিত সর্ব

মানব সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সূরা 'সাফের' ২য় রুকূতে এবং সূরা 'ফাতাহ্'-এর ৪র্থ রুকূতে উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা শরীয়তধারী এবং শরীয়তবিহীন নবীর পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

অনুবাদঃ "তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন" (৬১ঃ১০)। এরূপ, সূরা 'ফাতাহ্'-এ আল্লাহ্ এরশাদ করছেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

অনুবাদ ঃ "মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল, এবং যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে আছে, তাহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়াদ্রচিত্ত। তুমি তাহাদিগকে রুকূ ও সেজদারত দেখিতে পাইবে, তাহারা সর্বদা আল্লাহ্র ফযল ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যত্নবান থাকে। সেজদার চিহ্নের দরুন তাহাদের চেহারায় তাহাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রহিয়াছে। তাহাদের এই বিবরণ তওরাতে আছে, এবং ইঞ্জিলেও আছে তাহাদের বিবরণ, এক শস্য ক্ষেত্রের ন্যায়, যাহা নিজ অঙ্কুর নির্গত করে, অতঃপর উহাকে সুদৃঢ় করে ফলে উহা আরও পুষ্ট হয়, অতঃপর উহা স্বীয় কান্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা কৃষককে আনন্দিত করে, যেন তিনি তাহাদের (মো'মেনদের উন্নতি) দ্বারা কাফেরদিগকে ক্রোধান্বিত করেন" – (সূরা আল্ ফাতাহ্-৩০ আয়াত)।

বস্তুতপক্ষে, পবিত্র কোরআনে এ সুন্দর উপমাটি মধ্যে আল্লাহ্তা'লা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর বেসাতের (আবির্ভাবের) সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন অর্থাৎ আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রথম আগমন হবে, জালালি (শক্তির বিকাশক) রূপে। যেমন তৌরাত কিতাবে তাঁর (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, সে-ই শ্রেষ্ঠতম রসূল, সে কোণের প্রস্তর সদৃশ। সে কোণে প্রস্তর যার উপরে পতিত হতে তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে এবং যে এ প্রস্তরের উপর পতিত হবে সে-ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে; অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে কঠোর শক্তির প্রকাশক হবেন। তবে কোরআনের ভাষায় তাঁরা হবেন 'রুহামায়ু বাইনাহুম' অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে তাঁরা হবেন পরস্পর দয়াপরবশ এবং সহানুভূতিশীল।

অপরদিকে শরীয়তবিহীন নবী ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত ইঞ্জিল কেতাবে সেই শস্যবীজের তুল্য বর্ণনা করা হয়েছে, কৃষক যা মাটিতে বপন করে; এবং ধীরে ধীরে

সবল হয়ে সে বীজ আপন চারা বের করে। অবশেষে তা মোটা ও মজবুত হয় আপন কান্ডের উপর দাঁড়ায় এবং বপনকারীকে আনন্দ দান করে, কিন্তু ইহা দেখে কাফেররা বিক্ষুব্ধ হয়।

এ দৃষ্টান্তের মধ্যে মসীহ্-এর জামালি তথা সৌন্দর্য বিকাশক আগমনের কথাই বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে নম্রতা, বিনয় এবং শিষ্টাচারের লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হবে।

বিষয়টিতে আরও আলোকপাত করার জন্য পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে পবিত্র কোরআন শরীফে মূসা (আঃ)-এর 'সদৃশ নবী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন ঃ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٦﴾

অর্থাৎ, "যেরূপে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম একজন রসূল"(৭৩ঃ১৬)।

সুতরাং, মূসা (আঃ)-এর ১৩০০ (তেরশত) বৎসর পরে তাঁর উম্মতের মধ্যে যেরূপ 'জামালি' শানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব হয়েছিল, সেরূপ মসীলে মূসা (মূসা সদৃশ) নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এরও তের শত বৎসর পরে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যেও অনুরূপভাবে ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ জামালি শানে বিভূষিত হয়ে এক মহাপুরুষ আগমন করবেন। যেমন সূরা জুমুআর আয়াতে করীমা ঃ

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

"এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্যদের মধ্যেও যাহারা এখনও পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"(৬২ঃ৪)।

এর মধ্যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাব বা দুই বেসাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতেরই আলোকে নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামগণের (রাঃ) একাধিকার প্রশ্নোত্থাপনের জওয়াবে এরশাদ করেছিলেন ঃ

"لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ"

(কোন কোন রেওয়ায়াতে هٰؤُلَاءِ ও বর্ণিত আছে।)

(مشكوٰة كتاب التفسير)—

অর্থাৎ, আখেরী জামানায় ঈমান যদি সপ্তর্ষি মন্ডলেও উঠে যায় তথাপি পারস্য বংশোদ্ভূত এমন এক বা একাধিক ব্যক্তি আগমন করবেন, যাঁর বা যাঁদের মাধ্যমে পৃথিবীতে পুনরায় ঈমান প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রণিধানযোগ্য যে, আধুনিক বস্তুবাদিতার যুগে ধর্মের প্রতি মানুষের উদাসীনতা, নাস্তিকতার দিকে মানুষের প্রবল আকর্ষণ, অপবিত্র কার্যক্রমের দিকে মানুষের ঝোঁক এবং মারাত্মক-নগ্নতার বাড়াবাড়িতে যেভাবে মানব সমাজ কলুষিত হচ্ছে তাতে সহসা কি কোন বিবর্তন আশা করা যায়? অবশ্য পারস্য বংশোদ্ভূত যুগ-ইমাম হযরত মির্যা

গোলাম আহমদ (আঃ) ইলহামযোগে আল্লাহ্ হতে জ্ঞান লাভ করে জগদ্বাসীকে অবহিত করেছেন, "বিশ্বব্যাপী ইসলামের পূর্ণ বিজয় সংঘটিত হবে তিনশত বৎসরের মধ্যে।" তিনি ইহাও বলেছেন যে, আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ সাহায্যেই এ সাফল্য আসবে; এবং ইলহাম মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে অবহিত করেছেন ঃ

"عالم کشف میں میں دیکھتا ہوں کہ میں نے نئی
زمین اور نیا آسمان بنایا ہے ٥"

(ক) অর্থাৎ খোদাতা'লা আমাকে অবহিত করেছেন, 'আমি এখন নতুন আকাশ ও নতুন জমিন সৃষ্টি করব'। এ উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে পৃথিবী এখন মৃত অর্থাৎ মানুষ খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং ধর্ম জ্ঞানহীন। খোদার চেহারা দর্শন না করার কারণেই জগদ্বাসীর হৃদয় কঠিন হয়ে পড়েছে; অতীতের ঐশী নির্দশনমালা এখন কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। অতএব, খোদা নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছেন। কি সেই নতুন পৃথিবী? এবং কি সেই নতুন আকাশ? সেই পবিত্র হৃদয়ই নতুন পৃথিবী খোদা যা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। এ পবিত্র হৃদয়ের বিকাশ হবে খোদা হতে এবং খোদার বিকাশ হবে এ পবিত্র হৃদয় হতে। নতুন আকাশ বলতে সে নিদর্শনমালা বুঝতে হবে, এ দাসের মাধ্যমে খোদার অনুমতিক্রমে যা কিছু প্রকাশিত হচ্ছে।

–(কিশ্‌তিয়ে নূহ-বঙ্গানুবাদঃ ১০পৃঃ)

তাঁরই হাতে বয়াত গ্রহণকারীগণকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন ঃ

"তোমরা খোদার স্বহস্তে রোপিত এক বীজবিশেষ বা ভূপৃষ্ঠে বপন করা হয়েছে। ইলহামের মাধ্যমে খোদাতা'লা আমাকে অবহিত করেছেনঃ এ বীজ বর্ধিত হবে, পুষ্প প্রদান করবে, এর শাখা-প্রশাখা সর্বদিকে প্রসারিত হবে এবং ইহা এক মহামহীরূহে পরিণত হবে। সুতরাং ধন্য তাঁরা, যাঁরা খোদার বাক্যে ঈমান রাখেন; এবং মধ্যবর্তীকালীন বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কেননা, বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক; যেন খোদাতা'লা তোমাদের পরীক্ষা করেন তামাদের মধ্যে কে স্বীয় বয়াতের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। –(আল্ ওসীয়্যাত-বঙ্গানুবাদঃ ১৩ পৃঃ)

(খ) তিনি (আঃ) বলেনঃ "আমার হাতে একটি দেদীপ্যমান প্রদীপ আছে। যে ব্যক্তিই আমার নিকট আসবে, সে অবশ্যই সে আলোক হতে অংশ লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কু-ধারণা এবং সন্দেহবশতঃ দূরে সরে পড়বে সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে। এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করবে সে চোর, দস্যু এবং হিংস্র জন্তু হতে নিজ প্রাণ বাঁচাবে। কিন্তু আমার প্রাচীর হতে যে ব্যক্তি দূরে থাকবে চতুর্দিক হতে মৃত্যু তাকে গ্রাস করবে এমন কি তার 'শবও' শান্তিতে থাকবে না"।

–(ফতেহ ইসলাম-বঙ্গানুবাদঃ ৫৪ পৃঃ)

(৩) তাঁকে (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঃ

"میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا ۔" —(الوصیت ۔ صر ۸)

অনুবাদঃ "তোমার অনুসরণকারী জামাতকে আমি কেয়ামত পর্যন্ত অন্যদের উপরে প্রাধান্য দান করব।" —(আল্ ওসীয়্যত-বঙ্গানুবাদঃ ৮ পৃঃ)

(৪) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঘোষণা করেছেনঃ দেখ সেই সময় অত্যাসন্ন, যখন এ জামাতকে খোদাতা'লা এ দুনিয়াতে এক বিরাট আকারের জনপ্রিয়তা প্রদান করবেন; এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে, উত্তর ও দক্ষিণে এ জামাতকে সম্প্রসারিত করবেন এবং ইসলাম বলতে পৃথিবীতে একমাত্র এ জামাতকেই (জামাতে আহমদীয়াকেই) বুঝাবে। ইহা সেই খোদার ওহী যার নিকট কোন কিছুই অসম্ভব নহে।

—(তোহফায়ে গুলড়াবিয়াঃ ৫৬ পৃঃ)

খৃষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেনঃ একজন মানুষকে (মরিয়ম পুত্র যীশুকে) যারা খোদা মনে করছে তাদেরও ধ্বংস সুনিশ্চিত। ধন্য তাঁরা, যাঁরা আমাকে চিনতে পেরেছে। আমি খোদার শেষ পথ, তাঁর শেষ জ্যোতিঃ। যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে সে হতভাগ্য, তার সবই অন্ধকার।

—('কিশ্‌তিয়ে নূহ' পুস্তক-বঙ্গানুবাদঃ ৮১ পৃঃ)

শেষ যুগে ইসলামে পুনরুত্থান এবং বিশ্ব বিজয়ের ব্যাপারে রসূলে করীম (সাঃ) উম্মতকে এ বলে সংবাদ দিয়ে গেছেন ঃ

"إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِ أَوَّلِهِمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ ۔" —(مشکوٰۃ ۔ صر ۵۸۴)

অনুবাদ ঃ শেষ যুগে আমারই উম্মতের মধ্যে এমন এক কওমের উদ্ভব হবে যারা আমার যামানার সাহাবীদের তুল্য পুরস্কারের অধিকারী হবে। তাদের বড় লক্ষণ হবেঃ 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার।' অর্থাৎ তাঁরা অপরকে নেক কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন ও অন্যায় কাজ হতে বারণ করবেন এবং 'ফয়েজে আওজের' যুগের ফিতনা সৃষ্টিকারী লোকদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হবেন।

—(রাওয়াহুল বায়হাকি ফি দালায়েলেন নবুওয়তে, মিশকাতঃ ৫৮৪ পৃঃ)

ইসলামের শেষযুগ সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ)-এর এরূপ সুসংবাদও আছে ঃ

"مَثَلُ اُمَّتِیْ كَمَثَلِ مَطَرٍ لَا يُدْرٰى اَوَّلُهٗ خَيْرٌ اَمْ اٰخِرُهٗ o"

(مشكوٰة - كتاب الفتن)

অনুবাদ ঃ আমার উম্মতের অবস্থা এমন এক বারিধারা বর্ষণস্বরূপ যার প্রথমভাগ উত্তম কি শেষভাগ উত্তম হবে তা বর্ণনা করা মুস্কিল। -(তিবরানী ও মিশকাত)

মরহুম মৌলানা আবুল কালাম আযাদ সাহেব এ হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করেছেনঃ "এ হাদীসে এবং এরূপ আরও অন্যান্য বহু সংখ্যক হাদীসে ইসলামের জন্য পরবর্তী একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুগের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। সেই পরবর্তী যুগের কল্যাণ ও বৈশিষ্ট্য ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগকে জীবন্ত করে তুলবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগই উত্তম ছিল, না অনাগত পরবর্তী যুগই উত্তম হবে তা বলা সম্ভবপর নহে।" -(মাসালায়ে খেলাফত ঃ মৌলানা আবুল কালাম আযাদ)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হুযূর (সাঃ) স্বল্প সংখ্যক দরিদ্র ও অনুল্লেখযোগ্য নিবেদিতপ্রাণ কর্মী নিয়েই তৌহীদের প্রচার এবং প্রসার কার্য শুরু করছিলেন। তদনুরূপ ইসলামের শেষ যুগেও 'লেইউযহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহির' মিশনটিও এক সংখ্যালঘিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ কর্মী দ্বারাই সম্প্রসারিত হতে থাকবে।

(৪) এ প্রসঙ্গেই আঁ হযরত (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

بَدَءَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا . وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَءَ - فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ o

অনুবাদ ঃ "প্রাথমিক যুগে যেরূপ ইসলামের অত্যল্প সংখ্যক দরিদ্র ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিল, তেমনই শেষযুগেও ইসলামের একটি ক্ষুদ্র দরিদ্র দলই থাকবে, তবে সেই অল্পসংখ্যক ত্যাগী মুসলমানই ধন্য।"

এ হাদীস দ্বারা একটা চিরন্তন মৌলিক সত্যেরই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। প্রাথমিক যুগে যেরূপ ইসলামের বিজয়পথে কোন রাজা-বাদশাহ্ বা সমাজের উচ্চ স্তরের হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিবর্গের আত্মত্যাগের কোন আদর্শ পরিলক্ষিত হয়নি, বরং অতি সাধারণ লোকের ঐকান্তিক কোরবানী দ্বারাই সাফল্য অর্জিত হয়েছিল, তদনুরূপ এ আখেরি জামানাতেও নগণ্যসংখ্যক আত্মোৎসর্গকারী একটি দল 'কাবেলে এতায়াত' ঐশী সাহায্যপুষ্ট ইমামের নিয়ন্ত্রণাধীনে মমত্ববোধ এবং মানবপ্রেম ও অকুণ্ঠ দোয়ার মাধ্যমে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর দ্বারে দ্বারে ইসলামের তবলীগ পৌঁছাবে। সমুদয় ধর্মের উপরে ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য তাঁরা এমনই বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন যে, তাঁদের এরূপ অতুলনীয় আত্মত্যাগের ফলশ্রুতিতেই 'লেইউযহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহির' ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে।

ফলতঃ বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আখেরী যামানাতে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার প্রসারের মহান কাজ মুসলিম জাহানের রাজা-বাদশাহ্দের কোটি কোটি ডলারের মালিক হয়ে আধুনিক জগতের বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় মগ্ন রাজপুরুষগণ জাঁক-জমকের হাঁক দিয়ে যতই কৃতিত্ব প্রদর্শন করুক না কেন তাদের দ্বারা ইসলাম প্রচার এবং প্রসারের মত মহান কার্য সাধিত হওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। বরং এ মহৎ কার্য সুসাধিত করার কাজ আল্লাহ্তা'লা আখেরী জামানাতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র জামাতের ভাগ্যেই নির্ধারিত করেছেন।

এ সম্পর্কে আহমদীয়া জামাতের তৃতীয় খলীফা হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহ্মদ (রাহঃ) তাঁর এক জুমুআর খুৎবায় ব্যক্ত করেছেনঃ

"স্বর্ণ, চান্দি, হীরা-জাওয়াহেরাত অথবা সোনা-চান্দির ষ্টার্লিং পাউণ্ড আমাদের সম্পদ নয়। আমেরিকান বা কানাডিয়ান ডলারও আমাদের কাম্য সম্পদ নহে। বরং মোখলেস আহমদী মুসলিমদের প্রতিটি অন্তর, যা তাঁদের বক্ষেঃ স্পন্দনরত, তাই হচ্ছে আমাদের জন্য প্রকৃত সম্পদ। যতদিন পর্যন্ত (ইসলামের স্বার্থে কোরবানীতে মগ্ন) এরূপ নিবেদিত প্রাণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, ততদিন আমাদের কিসের পরওয়া? যদি সম্পদের আরও প্রয়োজন হয় তবে আল্লাহ্তা'লা আমাদের জন্য আকাশ হতে সম্পদ বর্ষণ করবেন এবং জমিনও আমাদের জন্য তার অভ্যন্তরীণ সম্পদ উগলিয়ে দেবে।"

– (২১শে নভেম্বর, ১৯৭৫ সনে প্রদত্তঃ জুমুআর খুতবা)

বস্তুতপক্ষে রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসের সারমর্ম ইহাই যে, 'বাদায়াল ইসলামু গারিবান ওয়া সাইয়াউদু কামা বাদায়া ফাতুবা লিল গোরাবায়ে' অর্থাৎ ইসলামের প্রচারের কৃতকার্যতা সাধনের নিমিত্ত ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায়ই শেষ যুগেও একটি ক্ষুদ্র, নগণ্য, অনুল্লেখযোগ্য ও স্বল্পসংখ্যক দরিদ্র দলই থাকবে।

আলমগীর ধর্ম তথা বিশ্ববিজয়ী ধর্মের মাপকাঠি হিসেবে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করতে যেয়েও হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর রচিত কেতাবাদির মধ্যে জগদ্বাসীর সামনে এমন ধরনের কিছু মাপকাঠি পেশ করেছেন যেগুলো একমাত্র ইসলাম ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মেই নেই। কামেল, জিন্দা, শ্রেষ্ঠ এবং সার্বজনীন (আন্তর্জাতিক) ধর্ম হিসেবে গৃহীত হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে তিনি নিম্নলিখিত ৬টি বিভিন্ন মাপকাঠির দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেনঃ

(১) প্রথম মাপকাঠি হলো, দাবীকারককে তাঁর ধর্মের স্বপক্ষে সেই ধর্মের নিজস্ব গ্রন্থ হতেই দলিল-প্রমাণাদি উপস্থাপিত করতে হবে। তা না হলে উহার শ্রেষ্ঠত্ব আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বরং সেটা হবে ঐ প্রবাদবাক্যসদৃশ যেমন 'বাদী নীরব সাক্ষী মুখর'।

(২) দ্বিতীয়তঃ জিন্দা এবং আলমগীর ধর্মকে এরূপ খাঁটি সার্বজনীন শিক্ষা পেশ করতে হবে যা কোন নির্দিষ্ট সময়, জাতি গোত্র বা এলাকার জন্য সীমাবদ্ধ নহে বরং সে শিক্ষাটা হতে হবে জাতি-উপজাতি, দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য; এবং এর শিক্ষা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় এরূপ উৎকৃষ্টতর ধরনের হবে যা বিশ্বমানব রূপ বৃক্ষের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় রূহানী পানি সিঞ্চনের যোগ্য হয় এবং উহার সার্বজনীন শিক্ষা সর্বকালের সব মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থেকে যায় এবং এ ধর্মের অনুশাসনসমূহ আল্লাহ্‌র স্বীয় হেফাযতে অক্ষুণ্ন থাকবে ও কেয়ামত পর্যন্ত যে কোন তাহরীফ (হস্তক্ষেপ দ্বারা পরিবর্তিত-পরিবর্দ্ধিত) হতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং নিরাপদ থাকবে।

(৩) তৃতীয়তঃ জিন্দা মযহাবের দাবীদারের জন্য অবশ্যই এরূপ প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে যে, মূল ধর্ম প্রবর্তকের মধ্যে যে রূহানী শক্তি বিরাজিত ছিল বর্তমানে অনুসারীগণের মধ্যেও যেন (মোজেযা কেরামতের) সে রূহানী শক্তি মজুদ থাকে; এবং তাদের ধর্ম পুস্তকের মধ্যে উল্লেখিত খাঁটি মোমেন এবং বিশ্বাসীদের জন্য যে সকল নির্দশনসমূহ প্রদর্শনের শক্তি পূর্বে বিরাজিত ছিল তদনুরূপ বর্তমানেও যেন উহা অক্ষুণ্ন রয়েছে বলে পরিদৃষ্ট হয়।

(৪) চতুর্থ মাপকাঠি এরূপ হবে যে, সাচ্চা, জিন্দা এবং কামেল নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এবং উহা প্রমাণের জন্য অত্যাবশ্যক যে, সে নবীর ব্যক্তিগত কথা, কাজ ও চরিত্র বা আকওয়াল, আমল ও আখলাক যেন এমনই উচ্চাঙ্গের হয় যদ্বারা তিনি এমন একটি পূর্ণ আদর্শ স্থানে উপনীত হন যে, উহার মাকাম অন্যান্যদের নাগালের এবং ঐ মাকামে গিয়ে স্বীয় কুওতে কুদসীর অর্থাৎ পবিত্রকরণ শক্তির বলে অপরকেও তিনি রূহানীভাবে পবিত্র করে 'মুলহাম' (আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্ত) বানাতে সক্ষম হন।

(৫) পঞ্চমতঃ প্রত্যেক সত্য ধর্মের যাচাইয়ের জন্য এবং জিন্দা ধর্ম হিসেবে পেশ করার জন্য ইহাও একটি মাপকাঠি যে, ঐ ধর্মের অনুসরণকারীগণের মধ্যে সদা-সর্বদাই সেইরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হতে থাকবে যাঁরা তাঁদের পূর্বসূরী (পেশরৌ) পথপ্রদর্শক এবং রসূলের স্থলাভিষিক্ত হবেন। যার ফলে ইহা প্রমাণিত হবে যে, সেই নবী স্বীয় রূহানী বরকতসমূহের মাধ্যমে জিন্দা রয়েছেন (অর্থাৎ রূহানীভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেননি)।

(৬) ষষ্ঠ মাপকাঠি এ হবে যে, মাত্র ঐ ধর্মই 'জিন্দা ধর্ম' বলে গৃহীত হতে পারে যার মধ্যে প্রত্যেক জামাতেই ঐশী নির্দশনাবলী প্রকাশ করার মত রূহানীভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি মজুদ থাকে (শূন্যতা সৃষ্টি হয় না)। তাঁরা যেন স্বীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বা তাদের ধর্ম জিন্দা প্রমাণ করার জন্য কেবল পূর্বসূরীদের মোজেযা কেরামত এবং নিশানসমূহের কিচ্ছা-কাহিনীকেই তাঁদের একমাত্র পুঁজি বলে মনে না করেন।

জিন্দা ধর্ম জিন্দা নবী

ধর্মের অস্তিত্ব এবং ধর্ম পালনে মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বান্দা এবং সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং ঐ সম্পর্কের ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন। ধর্ম মৃত কিংবা জীবিত তা নির্ধারিত হবে ধর্ম পালনকরী ও আল্লাহ্‌র মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা। একটি নির্দিষ্ট ধর্মমন্ডলীর আত্মসমর্পণকারী এবাদতগুজার বান্দার সঙ্গে খোদাতা'লার সম্পর্ক স্থাপন দ্বারাই নির্ণীত হবে সেই ধর্মের সজীবতা। যেমন প্রবাদবাক্য আছ, "বৃক্ষ ফলেন পরিচয়তে"। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন রুদ্ধদ্বার কক্ষে কেউ রয়েছেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী অনবরত ডাকাডাকি করে, যদি কোন সাড়া না পায় তবে, মানুষের সাধারণ বুদ্ধি অনুযায়ী সে এরূপ এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, প্রকৃতপক্ষে গৃহাভ্যন্তরে কেউ নেই। তদনুরূপ দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ শত শত বৎসরব্যাপী খোদাকে আকুল আহ্বান করেও যদি শেষ পর্যন্ত কেউই কোন জওয়াব না পায় তাহলে নাস্তিকতার প্রচারণাই জয়লাভ করবে এবং ধর্ম মৃত বলেই বিঘোষিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে বান্দার ডাকে আল্লাহ্‌র সাড়া দেওয়া এবং মোজেযা কারামতের বিদ্যমানতাই জীবন্ত ধর্মের একমাত্র চিহ্ন। এ চিহ্নই ধর্মকে জিন্দা রাখে। উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে দোয়া কবুলিয়তের চিহ্নাবলী ও নিদর্শন অহরহ প্রকাশিত হচ্ছে। তাই ইসলাম আল্লাহ্‌র অনুমোদিত জিন্দা ধর্ম। কিন্তু অপরাপর ধর্মে দোয়ার কবুলিয়ত বলে কিছুই নেই এবং মোজেযা কারামত প্রদর্শনকারী খোদাপ্রাপ্ত সাধু লোকের বিদ্যমানতা দ্বারা সমৃদ্ধও নহে। কাজেই ঐসব ধর্ম মৃত। ঐ ধর্মগুলোর মধ্যে কোন জীবনীশক্তি নেই। কেননা, ঐ ধর্মগুলো বিকৃত হয়ে আল্লাহ্‌তা'লার অনুমোদন হারিয়ে ফেলেছে।

নবী, রসূল, অলী, মুহাদ্দেস এবং উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মুজাদ্দেদগণের বুযুর্গীর মাপকাঠি হিসেবে কাকে আল্লাহ্ কোন্ অবস্থায় কীভাবে কি পরিমাণ অলৌকিক সাহায্য এবং মোজেযা কারামতের শক্তি দ্বারা আশীষযুক্ত করেছেন তা লক্ষ্য করেই ধর্মের প্রতি আমাদের মনপ্রাণ আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বস্তুবাদিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তখন থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, খোদার সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া, এবাদতগুজারের প্রার্থনা শ্রবণে খোদাতা'লার রহমত পাওয়া বা সরাসরি জওয়াব পাওয়া, রুইয়া, (সত্য-স্বপ্ন) কাশ্‌ফ বা ওহী-ইলহামের মাধ্যমে খাস বান্দাদের মোজেযা কারামত প্রকাশিত হওয়াটা মানুষ আর বিশ্বাস করতে চান না। সুতরাং আসল জিন্দা ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে বর্তমান যুগে ধর্ম হয়ে গেছে আরব্য উপন্যাসেরই মত কিচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর।

একজন খৃষ্টান তিনি পাদ্রী হন বা যতবড় বিশপ আর্চ বিশপই হন না কেন মোজেযা কারামত সম্পর্কে জ্ঞাত হতে উৎসুক প্রশ্নকারীকে একথা বলেই সান্ত্বনা দিতে চান যে, সদাপ্রভু দুই সহস্র বৎসর পূর্বে কেবল যীশুর সঙ্গে আর তাঁরই মাতা মরিয়মের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন; মোজেযা কারামত প্রদর্শনের জন্য সদাপ্রভু কেবল যীশুর জন্যই মদদ যোগায়েছিলেন। অতঃপর যীশুর মৃত্যুর পরে সদাপ্রভু আর কারও সঙ্গে কথা বলেন না। তৌরিত কেতাবের বিশেষজ্ঞ আলেম ইহুদী পন্ডিতও একই কথা বলে থাকেন, সদাপ্রভু কেবল 'মোশীর' সঙ্গে কথা বলতেন, অতঃপর মোশীর মৃত্যুর পর

বিগত তিন হাজার তিনশত বৎসর যাবত বাক্যালাপ বন্ধ রয়েছে। হিন্দুদের বেদ উপনিষদ শাস্ত্রদ্বয়ের বিশেষজ্ঞ পন্ডিত মহোদয়গণেরও এ বিশ্বাস যে, বহুকাল পূর্বে বৈদিকযুগে কেবল মুনি-ঋষিদের উপরে ঐশীবাণী অবতীর্ণ হত অতঃপর পুরাকাল থেকেই ঈশ্বরের বাণী অবতরণ বন্ধ হয়ে গেছে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ঐসব মৃত ধর্মের অনুসারীদের ন্যায় মুসলমানদের মধ্যেও বর্তমান যুগে এ বদ্ধমূল ধারণারই সৃষ্টি হয়েছে যে,নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর পরবর্তী যুগের অলী মুহাদ্দাস বুযুর্গানে দীনের উপর আল্লাহ্‌তা'লার ওহী-ইলহাম নাযিল হত। কিন্তু এযুগে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। বস্তুতঃ এ ধরনের বিভ্রান্তিকর আকিদাটি মৃত ধর্মাবলম্বীগণের মধ্য হতেই মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে।

১৮৯৬ সনে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক সর্বধর্ম সম্মেলনে ইসলাম ধর্মের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে যেয়ে ভারত উপমহাদেশের একজন জার্নালিষ্ট এবং প্রখ্যাত আলেম 'এশায়াতুস্ সুন্নাহ্' নামক পত্রিকায় সম্পাদক মৌলানা মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী সাহেব এরূপ স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে,"ইহা এমনই এক সময় যে, লোকেরা আমাদের ধর্মের মোজেযার নিদর্শন সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টা করে থাকে। কেননা, প্রত্যক্ষভাবে তারা কোন মোজেযা বা কেরামতের ফল দেখতে পায় না।" তিনি আরও বলেন যে, "পূর্বের সব নবী, সব বুযুর্গান মৃত্যুবরণ করেছেন; এ উম্মতের সাহেবে কারামাতগণ দুনিয়া হতে ক্রমান্বয়ে বিদায় গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মোজেযা কারামত প্রদর্শনকারী কোন বুযুর্গই এযুগে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কাজেই ইসলাম ধর্মে মোজেযা কারামত প্রদর্শনকারী দেখাতে হলে অতীতের হাওয়ালা উল্লেখ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আমরা মোজেযা কারামত দেখাতে অপারগ, সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।"

–(সর্বধর্ম সম্মেলনের রিপোর্টঃ লাহোর ১৮৯৭ সন)

পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী 'কালামুল্লাহ্'। হাইয়্যুন কাইয়্যুম, চিরস্থায়ী-চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞাত-সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্ কোরআনে এরশাদ করেছেন ঃ

أُدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব (৪০ঃ৬১)। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে আরও এরশাদ করেছেন ঃ

"وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ" —(بقرة - ايت ١٨٧)

অনুবাদ ঃ এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। –(সূরা বাকারাঃ ১৮৭ আয়াত)

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর এবাদতকারী বান্দার নিবিড় সম্পর্ক, প্রার্থনা শ্রবণ করা ও মঞ্জুর করার ব্যাপারে এ খায়রে উম্মতের বুযুর্গানের মধ্যে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রূহানী জানশূন্য অন্ধগণ এ অপপ্রচারে মেতে উঠেছেন যে, খোদা পূর্বে কথা বলতেন এখন আর বলেন না। বস্তুতঃ এরূপ প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে কোরআনের বাণীর পরিপন্থী।

সর্বজ্ঞাত-সর্বদ্রষ্টা, হাইয়্যুন-কাইয়্যুম, আল্লাহ্‌র সিফাতসমূহ চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী, চির অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত। তাঁর গুণাবলীর পরিবর্তন হতেই পারে না। অতএব, তিনি পূর্বে যেরূপ বান্দার সঙ্গে কথা বলতেন এখনও তদনুরূপ তার খাস এবাদতগুজার বান্দাকে বাক্যালাপ দ্বারা সম্ভাষণ করেন। এরূপ সম্ভাষণ অব্যাহত গতিতে চালু রয়েছে বলেই ইসলাম জিন্দা ধর্ম এবং ইসলামের নবী খাতামুল মুরসালীন ও জিন্দা নবী। *

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইসলামের মধ্যে মোজেযা কারামতের প্রাপ্তি ও প্রকাশের অপারগতার স্বীকারোক্তির ফলে সারা বিশ্বের বিশেষতঃ তদানীন্তন বৃটিশ শাসিত পাক-ভারত উপমহাদেশের খৃষ্টান মিশনারিগণের এবং আর্যসমাজী পন্ডিতগণের জন্য ইসলামের উপর নানাবিধ আপত্তি উঠাবার পন্থা সুগম করে দেওয়া হল। তাছাড়া, ধর্ম বিরোধী ও খোদার অস্তিত্বের অস্বীকারকারীগণও এ সুযোগে নাস্তিকতা প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠল।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহ্‌ হতে ইলহামযোগে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে খৃষ্টান মিশনারি, আর্যসমাজী পন্ডিত এবং সমাজতন্ত্রী ও বস্তুবাদিতা মনোভাবাপন্ন খোদার অস্তিত্বের সন্দিহান লোকে সম্বোধন করে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

(১) ইসলাম জিন্দা মযহাব

(২) কোরাআন জিন্দা কেতাব

(৩) মুহাম্মদ (সাঃ) হি ছেরফ জিন্দা নবী

(৪) ইসলাম মোজেযা কারামত কা সামুন্দার হ্যাঁ;

(৫) আওর মোজেযাত মুহাম্মদিয়া কা ম্যাঁ জিন্দা নিশান হুঁ।

তিনি তাঁর রচিত পারসি কবিতায় বলেছেন ঃ

---

* টীকাঃ মির্যা সাহেব (আঃ) ঘোষণা করেছেন যে, আমাদের খোদা সেই খোদা যিনি এখনও তেমনই জীবিত, যেমন তিনি পূর্বে জীবিত ছিলেন; তিনি এখনও তেমনি কথা বলেন, যেমন পুরাকালে কথা বলতেন; তিনি এখনও তেমনি শুনেন, যেমন তিনি পুরাকালে শুনতেন। ইহা এক অলীক-ভিত্তিহীন ধারণা যে, এযুগে তিনি শুনেন, কিন্তু তিনি কথা বলেন না। বস্তুতঃ তিনি শুনেন এবং কথাও বলেন। তাঁর যাবতীয় সিফাত অনাদি ও অনন্ত। তাঁর কোন সিফাতই বেকার নয় এবং এরূপ কখনও হবে না। – (আল্ ওসীয়্যতঃ ১৪ পৃঃ)

ع - کرامت گرچہ بے نام ونشاں است -

بیا بنگر زِ غلامانِ محمد ○

—(درثمین)

অনুবাদ ঃ এ যুগে যেখানে মোজেযা কারামতের চিহ্ন জগত হতে বিলুপ্ত প্রায় (তখন হে অবিশ্বাসীগণ!) আমার দিকে ছুটে এস, যেখানে (আমার মত) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একজন সাধারণ গোলাম মোজেযা কারামতসমূহ দেখাতে সক্ষম।

(ক) ইসলামের সপক্ষে রচিত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর কেতাবাদি, সাময়িকী প্রকাশনা, লেকচার, পাবলিক মিটিং ও বিতর্ক সভা-সমিতিসমূহের মাধ্যমে যুক্তি দ্বারা ইসলাম ধর্মের বৈরীভাবাপন্ন মহলের সৃষ্ট আপত্তিসমূহের খন্ডন করতে লাগলেন এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অস্বীকারকারী ও ধর্মবিরোধীগণের উত্থাপিত ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের 'ঠুন্‌কো' যুক্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে লাগলেন এবং ঘোষণা করলেনঃ

(১) ইসলামই একমাত্র জিন্দা ধর্ম, (২) কোরআন শরীফই একমাত্র জিন্দা কেতাব, (৩) মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-ই একমাত্র জিন্দা রসূল। আমি আসমান-জমীনকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করেছি যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কলেমার মধ্যে যে খোদার কথা বিঘোষিত হয়েছে তিনিই একমাত্র খোদা।

–(মজমুয়ায়ে এস্তেহারাত-৩য় জিলদঃ ৬৭পৃঃ)

(খ) তিনি জোরালো ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন যে, একমাত্র ইসলামই মানবজাতিকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে,খোদা অতীব সন্নিকটবর্তী হয়ে তাঁর বান্দার সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রার্থনার মাধ্যমে বান্দার কাকুতি-মিনতি তথা গিরিয়াজারি শ্রবণ করে তিনি তাঁর অনুকম্পার হস্ত প্রসারিত করেন। মানুষের প্রাণে আল্লাহ্‌ তাঁর তখ্‌ত্‌ বা সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং বান্দাকে আকাশের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং তাকে সর্বপ্রকারের নেয়ামতসমূহ প্রদান করেন, বা পূর্ববর্তী লোকেদেরকেও দেওয়া হয়েছিল।

–(ইসলামী উসূল কি ফিলাসফি)

(গ) এরূপ মোজেযা বা অলৌকিক ক্রিয়াকান্ডের ব্যাপারে ইসলামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে মির্যা সাহেব (আঃ) 'হাকীকাতুল ওহী' গ্রন্থে এ বিষয়-বস্তুটিকে আরও বিস্তারিত ও বিশদ ব্যাখ্যাসহ পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখছেনঃ"ইসলাম হচ্ছে আকাশের নেয়ামতসমূহের মধ্যে সমুদ্রস্বরূপ। আমাদের নবী করীম (সাঃ) দ্বারা যত অধিক মোজেযা বা অলৌকিক ক্রিয়াকান্ডসমূহ প্রকাশিত হয়েছে দুনিয়ার অন্য কোন নবী দ্বারা তা সম্ভবপর হয়নি। পূর্ববর্তী নবীগণের মোজেযা ও কারামতসমূহ তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ দুনিয়া হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের সরওয়ারে কায়েনাত নবী (সাঃ)-এর মোজেযাসমূহ এখন পর্যন্ত বিকাশ লাভ করছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

"দ্বিতীয়তঃ আমার সপক্ষে এ যুগে যেসব অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে ঐ সব আঁ হযরত (সাঃ)-এর মোজেযা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোথায় সে খৃষ্টান, পাদ্রী , ইহুদী এবং অন্যান্য জাতি যারা আমার সপক্ষের এসব নিশান-সমূহের মোকাবিলায় নিশান দেখাতে সমর্থ হবে? কখনও না, কখনও না, কখনও না। (হারগেয নিহি, হারগেয নিহি, হারগেয নিহি)।"

– (হাকীকাতুল, ওহী, তাতিম্মাঃ ৩৫ পৃঃ)

(ঘ) অতঃপর তিনি আরও ঘোষণা করলেনঃ "আমি বারংবার জগদ্বাসীকে অবগত করে আসছি যে,এ পৃথিবীতে জিন্দা মযহাব বলতে একমাত্র ইসলামকেই বলা যেতে পারে। বাকী ধর্মগুলো অলীক কিচ্ছা-কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

– (চশমায়ে মারেফাত ঃ ৩২৬পৃঃ)

(ঙ) তিনি আরও বলেনঃ "আমি দেখছি যে, একমাত্র ইসলাম ব্যতীত সকল মযহাবই মৃত, তাঁদের খোদা মুর্দা, তাদের অনুসারীরাও মুর্দা; এবং তাদের জন্য ইসলাম গ্রহণ ব্যতিরেকে খোদাতা'লার সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করা আদৌ সম্ভব নহে।

অতঃপর তিনি অন্যান্য সব মযহাবের অনুসারীবর্গকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে নাদানগণ (অজ্ঞ লোকগণ)! মুর্দা-পরস্তির বা মৃতের উপাসনার মধ্যে তোমরা কি আস্বাদ পাচ্ছ? **"আমার নিকট এস, আমি তোমাদের সন্ধান দিব জিন্দা খোদা কোথায় এবং কোন্ জাতির সঙ্গে আছেন। এ যুগে ইসলাম মূসা (আঃ)-এর 'তূর' সদৃশ, যেখানে এখন খোদা কথা বলছেন। সেই খোদা যিনি অতীতের নবীদের সঙ্গে কালাম করতেন। অতঃপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন, সে খোদাই অদ্য এক মুসলমানের অন্তরে কালাম নাযেল করছেন। তোমাদের মধ্যে কি কারও এমন কোন কৌতুহল নেই যে, আমার নিকট এসে ইহা যাচাই করে দেখ?"**

– (আন্‌জামে আথম-শেষাংশঃ ৩৪৬ পৃঃ)

(চ) আলমে ইসলামের সকল মুসলমানকে সম্বোধন করে তিনি আরও ঘোষণা করেন ঃ

"হে মুসলমান! হুশিয়ার হয়ে যাও। জেনে রাখ যে, মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেছে এরূপ ধারণা করা সরাসরি মূর্খতা এবং ডাহা জাহেলিয়ত বৈ আর কিছুই নয়। ইসলাম যদি প্রকৃতই এরূপ মুর্দা মযহাবই (নাউযুবিল্লাহ্) হয়ে থাকে, তবে তোমরা এ মুর্দা ইসলাম ধর্ম নিয়ে কোন জাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে সাহস পাবে?

"তোমরা কি এ মৃত মজহাবস্বরূপ লাশকে নিয়ে জাপান যাবে ? অথবা ইউরোপের জাতিগণের সামনে পেম করবে ? আর দুনিয়াতে এমন কে বা কোন্ অর্বাচীন 'বেওয়াকুফ' ব্যক্তি আছে যে এ মুর্দা মজহাবের প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে ? যা (যে মজহাবটি) অতীতের অন্যান্য সব (মুর্দা) মজহাবের ন্যায় বরকত এবং রূহানীয়ত হতে বঞ্চিত ?"

তিনি আরও বলেন "অতীতের মযহাবসমূহের মধ্যে কোন কোন স্ত্রীলোকের উপরেও এলহাম নাযিল হয়েছিল। মূসা (আঃ)-এর মাতা এবং ঈসা (আঃ)-এর মাতা

বিবি মরিয়মের উপর এলহাম নাযিল হওয়ার বিষয় কোরআনে উল্লেখ আছে। অতএব তোমরা কি পুরুষ হয়েও ঐসব বনী ইস্রাঈলী মহিলাদের তুল্যও নও? প্রকৃতপক্ষে প্রাগৈসলামিক যুগের নবীদের ফয়েযান (অপরকে পবিত্রকরণ শক্তি) এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অতিক্রম করে দুনিয়া হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং ঐসব কওমের মযহাবসমূহ এখন বাতেল অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মৃত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে ধর্মের কোন জীবনী শক্তি নেই।

পক্ষান্তরে, আমাদের সরওয়ারে কায়েনাত আঁ হযরত (সাঃ)-এর 'রূহানী ফয়যান' বলবৎ আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ থাকবে। এখন আঁ হযরত (সাঃ)-এর রূহানী ছায়া দ্বারা রূহানীভাবে প্রতিপালিত একজন অতীব সাধারণ মানুষকেও তাঁর রূহানী ফয়েযের সংস্পর্শে 'মসীহ্' সদৃশ ব্যক্তিতে পরিণত করতে পারে, যেরূপ তিনি [আঁ হযরত (সাঃ)] আমাকে করেছেন।" – (রূহানী খাযায়েন পুস্তকঃ ৩৮৮ পৃঃ)

হযরত মির্যা সাহেব তাঁর রচিত পারসি কবিতায় বলে গেছেন ঃ

ع - صد ہزاراں یوسفے بینم دریں چاہِ ذقن -
واں مسیحِ ناصری شد از دمِ او بے شمار -

অনুবাদঃ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চিবুকে শত-সহস্র ইউসুফের সৌন্দর্য সুপ্ত রয়েছে; এবং রসূলে পাক (সাঃ)-এর রূহানী ফয়েযানের বলে ঐরূপ মসীহে নাসেরী তুল্য অসংখ্য মসীহে নাসেরী অবশ্যই সৃষ্টি হতে পারে।

(ছ) তৎপ্রণীত মশহুর কেতাব 'তারিয়াকুল কুলুব' নামক গ্রন্থে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জিন্দা নবুওয়তের তাৎপর্য বর্ণনা করতে যেয়ে বলেনঃ

একমাত্র তিনিই হকিকী এবং জিন্দা নবী প্রমাণিত হবেন যিনি স্বীয় কুওয়াতে ফয়যানের বলে অপরকেও এমনই এক রূহানী ছাঁচে গড়ে তুলবেন যেন সেই অনুসারী পবিত্র হয়ে অলৌকিক নিদর্শনসমূহ বিকাশের এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে বাক্যালাপের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন। এবং এ 'কুওয়াতে ফয়যান' ও 'কুওয়াতে কুদসী' হাসেলকারী নবী একমাত্র আমাদের সরওয়ারে কায়েনাত রসূলে করীম (সাঃ) ব্যতিরেকে আর কেউই নন। বস্তুতঃ আমাদের প্রিয় নবী রসূলে আরাবী (সাঃ)-এর মধ্যে ইসলাম এবং কোরআনের যে নূরসমূহ বিদ্যমান ছিল, তাঁর (রসূল-সাঃ) পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হিসেবে আমি এখনও এরূপ নূরের বিকাশ আমার মধ্যে দেখাতে প্রস্তুত আছি। – (১১-১২পৃঃ)

এ যুগে ইসলাম এবং ইসলামের নবী সরওয়ারে কায়েনাত রসূলে করীম (সাঃ)-এর আক্রমণকারী খৃষ্টান মিশনারিগণের মোকাবিলায় এবং আর্যসমাজী পন্ডিত ও নাস্তিকদের ইসলাম বিরোধী বিষোদ্‌গারের সামনে একমাত্র মির্যা সাহেব (আঃ)-ই ইসলামের স্বচ্ছ, খাঁটি, অকৃত্রিম, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন ও তাঁদের ভিত্তিহীন ইসলাম বিরোধী আপত্তি সমূহের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছেন। বস্তুতঃ ইসলাম এবং ইসলামের নবীকে রূহানী ভাবে জিন্দা প্রমাণ করার জন্য যুগে মির্যা সাহেব (আঃ) ব্যতিরেকে এমন দ্বিতীয় আর একজনও ময়দানে অবতীর্ণ হননি।

পবিত্র কোরআনই একমাত্র জিন্দা কেতাব

শানে কোরআনে মজীদ সম্পর্কে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেনঃ

ع (۱) جمال و حسن قرآں نور جان ہر مسلماں ہے -
قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآں ہے -
(۲) نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا -
بھلا کیونکر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے -
(۳) خدا کے قول سے قول بشر کیونکر برابر ہو -
وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے -
—(درثمین)

(১) "অর্থাৎ, পবিত্র কোরআনের সৌন্দর্য হচ্ছে প্রতিটি মুসলমানের প্রাণের জ্যোতিস্বরূপ-অন্যের চাঁদ তো হল চাঁদই বটে, কিন্তু আমাদের চাঁদ হচ্ছে একমাত্র কোরআন।"

(২) অনুসন্ধান করে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, এর কোন দৃষ্টান্তই নেই। আর কেনই বা তা হবে না? উহা স্বয়ং রহমানেরই মুখনিঃসৃত বাণী।"

(৩) "স্বয়ং খোদার বাণীর সঙ্গে মানবরচিত বাক্য কি করেই বা এক হতে পারে? ওখানে কুদরত বিরাজমান আর এখানে রয়েছে ব্যর্থতার সমাহার। অতএব, এরূপ পার্থক্য প্রকৃতই দেদীপ্যমান।" – (দুর্‌রে সামীন)

মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য হেদায়াতের প্রাথমিক যুগ হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে শুরু করে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনপদসমূহে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতিগণের প্রয়োজন মোতাবেক আল্লাহ্‌তা'লার বিধানসমূহের অবতরণ অব্যাহত ছিল। তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতিপয় নবীদের কেতাবের সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। তবে যেহেতু ঐ সব হেদায়াতের বাণী হুবহু অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোরআন শরীফের ন্যায় এমন কোন ঐশী ব্যবস্থা কায়েম রাখার প্রতিশ্রুতি ছিল না, তাই ঐসব কেতাবে তাহ্‌রীফ (হস্তক্ষেপ) হয়েছে অর্থাৎ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। তাছাড়া ঐ সব কেতাব বিশেষ বিশেষ যুগে বিভিন্ন জনপদসমূহের তদানীন্তন অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের সাময়িক চাহিদা পূরণের জন্য নাযেল করা হয়েছিল। সুতরাং ঐসব বিধান সার্বজনীন ছিল না এবং সর্বকালের উপযোগী বিধান হিসাবেও আসেনি। কাজেই খোদাতা'লার পক্ষ হতে ঐসব ধর্মগন্থের হেফাযতেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। অতএব, বিশ্বমানবের সর্বযুগের প্রয়োজন মিটাতে ওগুলো সক্ষম নহে। **ঐসব ধর্মগ্রন্থ কেতাবুল্লাহ্ বটে, কিন্তু 'কালামুল্লাহ্ নহে।** অর্থাৎ ঐ গ্রন্থসমূহের বিষয়াবলী আল্লাহ্‌র তরফ হতে হলেও বাক্যাবলী সরাসরি আল্লাহ্‌র কালাম নহে।

পূর্ববর্তী যুগের সব ধর্মগ্রন্থের মধ্যে পবিত্র কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। নাযেলের মুহূর্ত হতে আরম্ভ করে উহার মধ্যে কোন প্রকার তাহরীফ হয়নি। সুতরাং কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে কোরআন সম্পূর্ণ মুক্ত এবং নিরাপদ রয়েছে। কোরআনই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, উহার হেফাযত আল্লাহ্‌তা'লা নিজের জিম্মায় রেখেছেন। আল্লাহ্ এরশাদ ফরমায়েছেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑨

অর্থাৎ নিশ্চয় আমরাই এই যিক্‌র (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হেফাযতকারী। —(সূরা আল্ হিজর -১ম রুকূঃ ১০ আয়াত)

পবিত্র কোরআনের হেফাযতের জন্য প্রাথমিক হেকমত ইহাই যে, কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরা ইউসুফের প্রথম রুকূতে আল্লাহ্ এরশাদ করছেন ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②

অনুবাদ ঃ নিশ্চয়ই আমরা ইহাকে কুরআন (পুনঃ পুনঃ পঠনীয়) রূপে আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার (১২ঃ৩)। বস্তুতঃ আরবী ভাষার মধ্যে এমনই এক লালিত্য এবং চমকপ্রদ প্রাঞ্জলতা রয়েছে, যা সর্বজাতির , সর্বযুগের, সর্বমানুষের ভাষা ব্যবহারের ফিতরত (প্রকৃতিগত রীতিনীতি) ইহাতে মজুদ আছে। সে কারণে এ ভাষা এতই হৃগয়গ্রাহী হয় ও অতি সহজ উপায়েই উহা মানুষের হৃদয়ঙ্গম হয় এবং মানুষের স্মৃতিপটে সুশৃঙ্খলরূপে সুরক্ষিত হয়ে যায়। হৃদয়গ্রাহী বাক্যবিন্যাস এবং স্বচ্ছরূপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবসমূহ প্রকাশের জন্য পৃথিবীতে আরবী ভাষার জুড়ি নেই। এর ছন্দময়তা হাফেযদের মুখস্থ করার কাজকে সহজ করে দেয়। *

কোরআনের অন্তর্নিহিত অফুরন্ত জ্ঞানভান্ডারকে অক্ষুণ্ন এবং অটুট রাখার ব্যবস্থাও আল্লাহ্ নিজের হাতে রেখেছেন। আল্লাহ্ এরশাদ করছেন ঃ

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ⑰ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ⑱

নিশ্চয় ইহা সংকলন করিবার ও পাঠ করিয়া শুনাইবার দায়িত্ব আমাদের উপর। অতঃপর উহাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমাদের উপর (৭৫ঃ১৮,২০)।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ ব্যবস্থা রেখেছেন যে, পবিত্র কোরআন এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর কুওয়তে ফয়যান ও কুওয়তে কুদসীর পবিত্রকরণ শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে এ উম্মতে মহাপুরুষগণের আবির্ভাবের ধারা এমনভাবে জারি রাখবেন যে, তাঁরা

* টীকা ঃ হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক "মিনানুর রহমান" (منن الرحمن)-এ ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে, 'আরবী ভাষাই সকল ভাষার মূল উৎস'।

কোরআন শরীফের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকথা ও মর্ম উদঘাটন করতে সমর্থ হবেন এবং মানবরচিত ইজমসমূহের ও বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাব-প্রতিপত্তি যা সামনে উপস্থিত হবে কোরআনের গভীর আলোকসম্পাতে তা শোচনীয়ভাবে পরাভূত হতে বাধ্য হবে।

বস্তুতঃ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের তুলনায় ইহা কোরআনের একটি বৈশিষ্ট্য এবং এ ঐশী ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে কোরআনের জন্য একটি মস্তবড় মোজেযা এবং প্রকৃতই যে ইহা 'কালামুল্লাহ্'-এর জ্বলন্ত নিদর্শন। কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করছেন ঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝٢٢

অনুবাদ ঃ এবং এমন কোন বস্তু নাই যাহার (অফুরন্ত) ভান্ডারসমূহ আমাদের নিকট নাই এবং আমরা কেবল নিরূপিত পরিমাণ ব্যতিরেকে উহা অবতীর্ণ করিনা (১৫ঃ২২)।

পবিত্র কোরআনের কালামসমূহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লাহ্তালা এরশাদ করেছেন ঃ

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ۝٢٥ تُؤْتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ একটি পবিত্র বাক্যকে একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় বলিয়া উপমাস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহ আকাশে (বিস্তৃত) রহিয়াছে। উহা স্বীয় প্রভুর আদেশক্রমে সদা ফল দিতেছে। (১৪ঃ২৫-২৬)

এইরূপ তিরমিযি শরীফের হাদীসে পবিত্র কোরআনের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

"بَحْرٌ لَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ" —(ترمذی - باب فضائل قرآن)

অনুবাদ ঃ পবিত্র কোরআন এরূপ এক সমুদ্র যার জ্ঞানভাণ্ডারসমূহ কোন দিনই নিঃশেষ হবে না। (বাবে ফাযায়েলে কোরআন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহ্র নিকট হতে ইলহামের মাধ্যমে সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে বলেছেন যে, পবিত্র কোরআনের ঃ

لَّا يَمَسُّهُٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝٨٠

পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেহ ইহাকে স্পর্শ করিবে না। (৫৬ঃ৮০)

আয়াতে করীমার মর্মানুযায়ী আল্লাহ্তা'লা কোরআনের হাকায়েক এবং মায়ারেফের জ্ঞান দ্বারা আমাকে বিভূষিত করেছেন। —(এযালায়ে আওহামঃ ২৬০ পৃঃ)

অতঃপর তিনি আরও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"میں قرآن شریف کے حقائق اور معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔" — (ضرورت الامام)

অনুবাদ ঃ 'কোরআন শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা ও পবিত্র তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনার অপূর্ব শক্তি আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে নিদর্শনস্বরূপ দান করেছেন। এমন কেহ নেই যে এ বিষয়ে আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে'। 'শাহাদাতুল কোরআনের' ৫২ পৃষ্ঠায় যুগের উদ্ভূত সমস্যাসমূহের প্রেক্ষাপটে কোরআনের জ্ঞানভাণ্ডার বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ

প্রত্যেক জামানাতেই এ উম্মতকে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেহেতু পবিত্র কোরআন জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক যাবতীয় জ্ঞানের উৎস, সে জন্য ইহা জরুরী নহে যে, একই জামানাতে কোরাআনের যাবতীয় এলেম ব্যাপক আকারে একেবারেই পৃথিবীতে প্রকাশ হয়ে যায়। বরং বর্তমান যুগে যে রকম মুশকিলাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে; এবং প্রত্যেক জামানাতে সমসাময়িক মুশকিলাত বা সমস্যা সমূহের যথাযথ সমাধানের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হতে রূহানী শিক্ষাদাতা প্রেরিত হয় এবং তাঁরাই ওয়ারেসে রসূল হয়ে থাকেন।"

কোরআন শরীফকে জিন্দা কেতাব প্রমাণ করতে যেয়ে বলেছেন, 'কোরআন শরীফ' সেই 'আবেহায়াত' যদ্বারা পৃথিবীতেও মানুষ রূহানীভাবে জিন্দা হয়ে যায় এবং পরকালেও সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়।

তিনি এ সম্পর্কে 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলামের' ৫৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"مجھے کشف سے معلوم ہوا کہ 'خطیرۃ القدس' کی سیرابی قرآن کریم کے پانی سے ہو رہی ہے۔ وہ ایک سمندر ہے جس میں 'آب حیات' موجیں مار رہا ہے جو اس میں سے پیتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے بلکہ دوسروں کو زندہ کرنے والا بن جاتا ہے۔"

— (آئینہ کمالات اسلام - ص ۵۴۶)

অনুবাদ ঃ "আলেমে কাশ্‌ফের মাধ্যমে আমি জ্ঞাত হয়েছি যে, কোরআন করীমের পবিত্র (রূহানী) পানি দ্বারা 'খাতিরাতুল কুদুসের' সিঞ্চনকার্য সুসম্পন্ন হচ্ছে। উহা এরূপ এক সমুদ্র যার মধ্যে 'আবেহায়াত' প্রবহমান। যে উহা হতে পান করে সে-ই চিরঞ্জীব হয়ে যায় এবং সে অপরকেও জিন্দা করে দেয়।"

(১) অতঃপর, কোরআনের ফযিলত বর্ণনা করতে যেয়ে মির্যা সাহেব ঘোষণা করলেন ঃ

(ক) কোরআন শরীফের জবরদস্ত শক্তি নিচয়ের মধ্যে একটা শক্তি এই যে, পবিত্র কোরআনের পূর্ণ অনুসরণকারীগণের মধ্যে অলৌকিক প্রভাব এবং মোজেযা ও কারামত প্রদর্শনের শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাঁদেরকে এমনই ব্যাপক ও অলৌকিক শক্তি প্রদান করা হয় যে, কোন দুনিয়াবী শক্তিই উহার মোকাবেলায় দাঁড়াতে সক্ষম নহে; সুতরাং এ দাবি আমিও রাখি। আর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি ঘোষণা করছি যে, যদি দুনিয়ার সমগ্র ইসলাম বিরোধী মহল, তারা প্রাচ্য-প্রতীচ্য যেখানকার অধিবাসীই হউন না কেন, সমবেতভাবে সকলে যদি এ ইসলামের বিরুদ্ধে একই ময়দানে সম্মিলিত হয়ে মোজেযা ও নিদর্শন দ্বারা আমার মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসে তাহলে খোদাতা'লার ফযল এবং তৌফীকের মাধ্যমে একমাত্র আমিই তাদের সকলের উপরে জয়যুক্ত থাকব। আমি এ-ও ঘোষণা করছি যে, এরূপ বিজয় কোন ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফলে নহে বরং প্রকৃতপক্ষে এ বিজয় একমাত্র এ কারণেই সাধিত হবে যে, আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক নাযিলকৃত পবিত্র কোরআনের কালামে এমন জবরদস্ত এক তাকত বা শক্তি নিহিত রয়েছে যে, দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মগ্রন্থেই তা নেই। তাছাড়া আমার বিজয়ের অপর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর রূহানী কুওয়ত ও শক্তি এবং তাঁর উচ্চতম মর্যাদা যেন আমার মাধ্যমে জগতে প্রকাশিত হয়।"

তিনি আরও বলেনঃ (খ) যেহেতু আমি আল্লাহ্‌তা'লার আজিমুশ্‌শান নবী (সাঃ)-এর পুঙ্খাণুপুঙ্খ অনুসারী এবং যেহেতু আমি আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত মহা শক্তিসম্পন্ন কোরআনের পূর্ণ অনুসরণকারী এবং তাঁর সঙ্গে আমি চরমতম মহব্বত পোষণ করে থাকি, সে জন্যই আমার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আমাকে এরূপ তৌফীক প্রদান করা হয়েছে। আমার এ তৌফীক কোন ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে নহে। সুতরাং আল্লাহ্‌র সে কালাম (কালামুল্লাহ্) যার পবিত্র নাম কোরআন শরীফ যা রাব্বানী তাকতসমূহের সমাবেশের পূর্ণ বিকাশ বলে বিঘোষিত হয়েছে, তাতেই আমি পূর্ণ ঈমান এনেছি; এবং কোরআনে উল্লেখিতঃ

(১) লাহুমুল্ বুশরা ফিল হায়াতেদ্দুনিয়া;

(২) আইয়াদুহুম বিরূহি মিনহু;

(৩) ওয়া ইয়াজ আল্‌লাকুম ফোরকানান।

আয়াতে করীমাগুলোর মাধ্যমে প্রদত্ত ওয়াদাসমূহের প্রেক্ষিতেই আমাকে এরূপ পুরস্কারে বিভূষিত করা হয়েছে। – (চশমায়ে মারেফাত-শেষাংশঃ ২৯৫ পৃঃ)

(২) পবিত্র কোরআন শরীফকে 'জিন্দা কেতাব' প্রমাণ করতে যেয়ে তিনি 'এযালায়ে আওহামে' প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ উলামা সম্প্রদায় এবং জড়বাদী দার্শনিকদেরকে সম্বোধন করে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے۔
اور بڑی وجہ اعجاز کی اس میں یہ ہے کہ وہ جامع
حقائق غیر متناہیہ ہے۔ مگر بغیر وقت کے وہ ظاہر
نہیں ہوتے جیسے جیسے وقت کے مشکلات تقاضا کرتی
ہیں وہ معارف خفیہ ظاہر ہوتے جاتے ہیں ... ...
... ... سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ
کھولا گیا ہے اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ تا
قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں
پر ظاہر کرے اب ہم نیم ملاں دشمن اسلام اس ارادہ
کو روک نہیں سکتے۔ اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں
آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے اور قہری طمانچہ
حضرت قہار کا ایسا لگیگا کہ خاک میں مل جائیں گے۔
ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں۔
چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور حقیر
سا نظر آئے۔ لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح
نکلے گا۔ ہاں وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئیگا
اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائیگا اور اپنا غلبہ
دکھائیگا۔ اور لیظہرہ علی الدین کلہ کی پیشگوئی کو
پوری کر دیگا۔"

অনুবাদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, কোরআন করীমই একটি মোজেযাস্বরূপ এবং এ মোজেযার বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, কোরআন শরীফ 'জামে হাকায়েকে গায়ের মুতানাহিয়া হ্যা' অর্থাৎ পবিত্র কোরআন অনন্ত ও অসীম তত্ত্ব এবং তথ্যসমূহে ভরপুর; কিন্তু ঐসব

জ্ঞানরূপ রত্নরাজি সর্বকালে-সর্বাবস্থায় বিকশিত হয় না বরং অবস্থাভেদে সময়ের প্রেক্ষিতে ইসলামের সম্মুখে যেসব সমস্যা উপস্থিত হয় সেগুলোর সামাধানযোগ্য প্রচ্ছন্ন মায়ারেফ বা তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে।"

---------- "সুতরাং নিশ্চিতরূপে অনুধাবন করবে, বর্তমান যুগে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্ম্য বিকাশের নিমিত্তে তোমাদের সাহায্যার্থে সে দরজা উন্মুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা এখন এরাদা করেছেন যে, কোরআন করীমের সুপ্ত জ্ঞানভান্ডার বর্তমান দুনিয়ার অহঙ্কারী দার্শনিকদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়।"--------

---------- তিনি আরও বলেন ঃ

"বর্তমান যুগের নিম মোল্লাগণ এবং ইসলামের অন্যান্য দুষমনগণ আল্লাহ্‌তা'লার এ ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে না। ইসলামের এসব দুষমন যদি তাদের এরূপ একগুঁয়েমি শরারত (দুষ্কর্ম) হতে বিরত না হয় তবে অবশ্যই তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে; এবং তাদের উপরে কাহ্‌হার খোদার কাহ্‌হারী তামাঁচা (ঐশী ক্রোধ) এমনই মারাত্মক আকারে নিপতিত হবে যে, তারা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু এ পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্তমানে এসব নির্বোধ লোকদের একেবারেই কোন দৃষ্টি নেই। কোরআনের মগলুব, কমজোর এবং হাকির বা অপমানিত হওয়াটাই যেন তাদের কাম্য। কিন্তু ইহা তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বর্তমান যুগে পবিত্র কোরআন এক বাহাদুর যোদ্ধার ন্যায়ই বিকশিত হবে; হ্যাঁ, ইহা এক শার্দূল সদৃশ প্রতাপে ময়দানে দন্ডায়মান হবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় দর্শনকে ভেঙ্গেচুরে গিলে ফেলবে ও স্বীয় বিজয় প্রদর্শন করবে। এরূপে কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী 'লেইউযহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহি"-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করবে।" -- (এযালায়ে আওহাম-দ্বিতীয় খন্ডঃ ৩৪০ পৃঃ)

অতঃপর খৃষ্টান-পাদ্রী আর্য সমাজী পন্ডিতদিগকে সম্বোধন করে তিনি বললেনঃ

"مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں
میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق اور معارف کے
سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے - اور اگر
کوئی مولوی مخالف میرے مقابل پر آتا - جیسا
کہ میں نے قرآن کی تفسیر کے لئے بار بار انکو بلایا تو خدا
اس کو ذلیل اور شرمندہ کرتا - پھر تم قرآن جو
مجھکو عطا کیا گیا ہے یہ اللہ جل شانہ کا ایک نشان ہے -
میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ عنقریب دنیا

دیکھ لے گی کہ میں اس بیان میں سچا ہوں -“
(سراج منیر - صہ ۳۵)—

অনুবাদ ঃ “যে খোদার হাতে আমার প্রাণ আমি সেই খোদারই শপথ করে বলছি যে, কোরআনের হাকায়েক ও মায়ারেফ অনুধাবন করার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে প্রত্যেক রূহের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।”

“সুতরাং যে ‘ফাহমে কোরআন’ (কোরআনের তত্ত্বজ্ঞান উদঘাটনে পারদর্শিতা) দ্বারা আমাকে আশিষযুক্তকরা হয়েছে তা আল্লাহ্‌-জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে একটি নিদর্শনস্বরূপ। আল্লাহ্‌র ফযলে এর উপর আমি দৃঢ় প্রত্যয় রাখি, অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়া লক্ষ্য করবে যে, যা আমি বলেছি তা-ই ধ্রুবসত্য।” – (সিরাজে মুনীরঃ ৩৫ পৃঃ)

পবিত্র কোরআনের উচ্চতম রূহানী মর্যাদা সম্পর্কে তিনি ‘আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম’ কেতাবের ৫৪৫ পৃষ্ঠায় আরবী ভাষায় যে মন্তব্য করেছেন তার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

পবিত্র কোরআন হচ্ছে একটি দুর্লভ রত্ন। এর বাহির ও ভিতর আলোকময়। এর উপরে ও নীচে আলোক এবং এর প্রত্যেকটি শব্দ জ্যোতির্ময়। ইহা এমনই ধরনের এক রূহানী বাগান যে, এর পুঞ্জীভূত ফলসমূহ একান্ত সহজলভ্য এবং এর মধ্যেই প্রবাহিত প্রস্রবণ বিদ্যমান। এর মধ্যে সৌভাগ্যের প্রতিটি ফলই সহজলভ্য এবং এর মধ্য হতেই প্রত্যেক প্রকারের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ কোরআনের আলোক এমনইভাবে আমার হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করেছে, যা অন্য কোন উপায়ে অর্জন করতে আমি অক্ষম ছিলাম। আমি যদি পবিত্র কোরআনের আলো না পেতাম তাহলে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমার জীবনে আমার রূহের কোন আনন্দই পেতাম না।

ইহার সৌন্দর্য শত-সহস্র ইউসুফের সৌন্দর্যকেও ম্লান করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এক মহান স্বর্গীয় আকর্ষণে মুগ্ধ হয়েই আমি এর দিকে আকৃষ্ট হয়েছি এবং আমার হৃদয়ে এর সুধা পান করি। কোন শস্য বীজের অঙ্কুরকে যেভাবে লালন-পালন করা হয় ঠিক তদনুরূপই ইহা (কোরআন) আমাকে রূহানীভাবে প্রতিপালন করেছে এবং আমার হৃদয়ে এর এক আশ্চর্যজনক প্রতিফলন ঘটেছে। এর সৌন্দর্য আমার হৃদয় হতে আমাকে টেনে হেঁচরিয়ে নিয়ে আসে। এক দিব্যদর্শনে অর্থাৎ কাশ্‌ফী অবস্থায় আমার নিকট ইহাও প্রকাশিত হয়েছে যে, কোরআনের যে রূহানী পানি দ্বারা ‘খাতিরাতুল কুদুসকে’ (পবিত্রতার বাগানকে) সিঞ্চিত করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে জীবন তো পানির একটি উত্তাল সমুদ্রস্বরূপ। যে ব্যক্তিই এ থেকে (রূহানী) পানি পান করবে সে জীবন তথা রূহানী জীবন লাভ করবে এবং অন্যদের জীবন লাভের কারণ হয়ে যাবে।

– (আয়নায় কামালাতে ইসলাম-ঃ ৫৪৫-৪৬পৃঃ)

এরূপে, ‘মলফুযাত’ দ্বিতীয় জিলদ ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠায় অন্যান্য ধর্ম পুস্তকাদির সঙ্গে কোরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বলেনঃ একমাত্র কোরআন শরীফই এরূপ একটি ঐশী পুস্তক যা নিজের দাবীসমূহের সঙ্গে এর সত্যতার

দলিলও পেশ করে এবং আল্লাহ্‌তা'লার আহকামসমূহকে জবরদস্তি কারও উপর চাপিয়ে দিতে বলে না। বরং স্বীয় সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা (তরীকে এস্তেদালালী) এবং ফিত্‌রী সায়াদতের মাধ্যমে পেশ করে।'

কোরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি অপর এক জায়গায় বলেনঃ **'ইহাও আমার এক দাবী যে, দুনিয়ার সত্যসমূহই কোরআনে নিহিত আছে। যদি কেউ এমন কোন সাদাকাত পেশ করে গর্ববোধ করেন যে, এ মহান সত্যটি কোরআনে মজুদ নেই, তাহলে এরূপ ব্যক্তিকে কোরআন হতে আমি তার সাদাকাত বের করে দেখাতে প্রস্তুত আছি।'** – (মলফুযাতঃ ২৮৫ পৃঃ)

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কোরআনের মর্যাদা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত নাস্তিকতা এবং জড়বাদিতার প্রবল স্রোতে পাক-ভারত উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা সমাজের কোন কোন আলেম এবং ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গও ভেসে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন প্রখ্যাত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান সাহেব। তিনি আধুনিক জড়বাদিতাপ্রসূত মতবাদকে খাঁটি ইসলামের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অপচেষ্টায় কোরআন ও ইসলাম সম্পর্কে কিছু পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। এমন কি 'তফসীরে আহ্‌মদীয়া' নামকরণ করে কোরআনের তফসীরও তিনি প্রকাশ করেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তাঁর প্রকাশনাসমূহেও কোরআনের তফসীরের মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাধান্যই বেশী স্থান পায়। কোরআনের অনুশাসনসমূহ ও ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিধানগুলোকে পাশ্চাত্যের রূহানী জ্ঞানশূন্য জড়বাদী আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য তিনি এমন কতিপয় মনগড়া অপব্যাখ্যা করতে প্রয়াশ পেয়েছেন যদ্বারা ইসলাম ও পবিত্র কোরআনের মর্যাদা সংরক্ষণের পরিবর্তে পরোক্ষভাবে বরং কোরআনের শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। প্রথমতঃ তিনি এরূপ অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র 'মোকালামা-মোখাতাবা বা বাক্য বিনিময় হওয়ার মত কিছুই নেই। দ্বিতীয়তঃ তিনি ইহাও লিপিবদ্ধ করলেন যে, 'আল্লাহ্ মানুষের দোয়া শ্রবণ করেন না।' কবুলও করেন না। সুতরাং দোয়া করা বা মোনাজাতের কোন প্রয়োজনই নেই। তৃতীয়তঃ তিনি এ-ও লিখলেন যে, মোজেযা, কারামত, ফেরেশ্‌তা, রূইয়া, কাশ্‌ফ, ওহী-ইলহাম, এসব কিছুই না (নাউযুবিল্লাহ্)। কোরআনের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি অস্বীকার করে বসলেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) দ্বিধাহীন ভাষায় স্যার সৈয়্যদ আহমদের উপরোক্ত ভিত্তিহীন মতবাদসমূহের খন্ডন করে "بَرَكَاتُ الدُّعَاء" বারাকাতু-দ্দোয়া নামক একখানা পুস্তক প্রকাশ করলেন। এ পুস্তকে তিনি ইসলাম ও "কোরআনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান সাহেবের নতজানু

নীতির তীব্র প্রতিবাদ করলেন" এবং কোরআনের শিক্ষায় ওহী ও এলহামের আবশ্যকতা এবং কবুলিয়তে দোয়া সম্পর্কে তিনি নানাভাবে অজস্র প্রমাণাদি পেশ করে ইসলাম ও কোরআনের খাঁটি শিক্ষাকে জনসমক্ষে তুলে ধরলেন। স্যার সৈয়্যদ আহমদ খানকে সম্বোধন করে তিনি ইসলাম ও কোরআনের মর্যাদাহানিকর মারাত্মক ভ্রান্ত আকিদাসমূহ তাঁকে বর্জন করার জন্য আহ্বান জানালেন।

'বারাকাতুদ্দোয়া' পুস্তকে তিনি স্যার সৈয়্যদ আহমদকে সম্বোধন করে লিখলেন ঃ

"اے کہ گوئی گر دعاہا را اثر بودے کجاست -
سوئے من بشتاب بنمائم ترا چوں آفتاب -"
—(برکات الدعا)

অনুবাদঃ "হে ঐ ব্যক্তি! যিনি একথা প্রচার করে বেড়ান যে, দোয়ার কোন প্রভাব বা প্রয়োজন নেই; তুমি আমার নিকট দৌড়ে এস। আমি অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে সরেজমিনে তোমাকে সূর্যালোকের মতই দোয়ার স্বচ্ছ প্রভাব প্রদর্শন করে দিব।"

অতঃপর তিনি 'আঁয়িনায়ে কামালাতে ইসলামে' স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান সাহেবের এবং একই ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা পোষণকারী সকল নব্য-শিক্ষিত জড়বাদীদের অনুরূপ ইসলাম বিরোধী ধারণাসমূহকে অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে খন্ডন করলেন ও প্রমাণ করে দেখালেন যে, **"ইসলামই একমাত্র জিন্দা ধর্ম এবং ধরাপৃষ্ঠে পবিত্র কোরআনই একমাত্র জিন্দা কেতাব।"**

উপরোক্ত গ্রন্থের ২৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

"অধুনা সৃষ্ট জড়বাদিতা-প্রসূত ধ্যান-ধারণা এবং মযহাবী তথা ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে যে বাকবিতন্ডা চলছে তার দিকে লক্ষ্য করে আমাদের মযহাবী ভাবাপন্ন লোকদের নিরাশ হওয়ার কোন হেতু নেই। **"আপনারা নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করুন যে, জড়বাদিতার এসব লাগামহীন অসার আর ঠুনকো যুক্তিসমেত বাক-বিতন্ডার সংঘর্ষে এ যুগে ইসলামকে অসহায়াবস্থায় আত্মসমর্পণকারী শত্রুসদৃশ রূপে নিরাশ হতে হবে না। বরং ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যেভাবে তাঁর অজেয় শক্তির বাহ্যিক বিকাশ ঘটেছিল, সেভাবেই ইসলাম তাঁর অন্তর্নিহিত রূহানী তাকত বা শক্তিসমূহের মাধ্যমে এ যুগেও সারা বিশ্বে এর অপরিমেয় শক্তির বিকাশ ঘটাবে।"**

"আমার এ ভবিষ্যদ্বাণী তোমরা উত্তমরূপে স্মরণ রেখো যে, ইসলামের শত্রুগণ এ সংগ্রামেও পূর্ববৎ লাঞ্ছিত অবস্থাতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হবে এবং পরিণামে ইসলামই জয়যুক্ত হবে।"

বর্তমান যুগে ইসলামের উপর তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবল আক্রমণ অব্যাহত গতিতে যতই তীব্রতর হোক না কেন এবং ইহাকে তীব্রতর করার জন্য যতই নূতন নূতন মতবাদসমূহের সমাহার হোক না কেন পরিণামে তারাই ইসলামের মোকাবেলায় অবশ্যই শোচনীয়ভাবে পরাভূত হবে

"আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা সহকারে আমি ঘোষণা করছি যে, ইসলামের মোকাবেলায় দাঁড়ানো এসব আধুনিক যুগের নব্য দর্শনসমূহের আক্রমণ থেকে ইসলামকে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারাই সুরক্ষিত করা হবে। শুধু তাই নয়, বরং ইসলামের অন্তর্নিহিত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং পবিত্র কোরআনের অকাট্য যুক্তির ধারাল অস্ত্র দ্বারা এবং দলিলসমূহের মাধ্যমে তাদের তৌহীদ বিরোধী পঙ্গু দর্শন তথা মানবরচিত দর্শনসমূহের অসারতা প্রমাণিত করা হবে এবং এসব জড়বাদিতার সপক্ষে বিতর্কমূলক বিষয়সমূহ যে নিছক অজ্ঞতাপ্রসূত তা অতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেয়া হবে। **তৌহীদের উপর তাদের প্রচন্ড আক্রমণের হিড়িক থাকা সত্ত্বেও ইসলামের প্রতাপান্বিত রূহানী সিংহাসনের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। আমি দিব্যচক্ষে তথা অভিজ্ঞানে অবলোকন করছি যে, ইসলামের গৌরব প্রকাশের দিন অত্যাসন্ন এবং আকাশে ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন হবার নিদর্শন প্রকাশ হতে চলেছে।** "

"প্রকৃতপক্ষে ইসলামের গৌরব ও বিজয় রূহানীভাবে সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ সাহায্যে ও উহার ফলশ্রুতিতে সমুদয় বিরোধী শক্তি ক্রমান্বয়ে সংকুচিত ও নিষ্ক্রিয় হতে হতে পরিণামে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলামঃ ২৫৪-৫৫ পৃঃ)

অতঃপর ইসলাম ধর্মে ওহী-এলহাম, মোজেযা-কারামত এবং দোয়া কবুলিয়তের অস্বীকারকারী 'স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান সাহেবের' অভিমতের উপর 'এতমামে হুজ্জত' করতে যেয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেছেন, "বাহ্যতঃ আপনি (স্যার সৈয়্যদ আহমদ সাহেব) কোরআন সত্য, ইসলাম সত্যধর্ম, ইসলামের রসূল (সাঃ) সত্য বলে স্বীকার করেও ইসলামের মৌলিক বিধানগুলোকে (যথা-মোজেযা, কারামত, ফেরেশ্‌তা এবং দোয়ার কবুলিয়ত ইত্যাদি) 'পাশ্চাত্য দর্শনের' সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টায় মেতে উঠে, ইসলামের চেহারাকে এমনভাবে বিকৃত করেছেন যার কোন অস্তিত্বই কোরআন বা ইসলামে নেই। আপনি ইসলামের মিত্র এবং হিতাকাঙ্খী হিসেবে কলম ধারণ করেছেন বটে, কিন্তু ইসলামের মূল নীতিসমূহকে জলাঞ্জলি দিয়ে জড়বাদী দার্শনিকদের সঙ্গে আপোষ করেছেন এবং এ আপোষ দ্বারা প্রকারান্তরে কোরআন ও ইসলামকেই হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। আপনার প্রকাশনাসমূহ পাঠ করলে আপনার যে রূপ প্রকাশিত হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ উহা এমনই এক 'কিম্ভূতকিমাকার' প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যার মুখাবয়ব মানবের মুখমন্ডলসদৃশ কিন্তু পুচ্ছ বানরের পুচ্ছসদৃশ এবং চামড়াও ছাগলের কিন্তু পাঞ্জা বাঘডাঁসের পাঞ্জাসদৃশ।" তিনি আরও বলেন যে, "আপনার অবস্থা ঐ প্রবাদবাক্যের সঙ্গেই খাপ খাবে যাতে বলা হয়েছেঃ "হাঁতীকা দাঁত দেখানেকা আওর, খানেকা আওর।"

তিনি আরও বলেনঃ "স্যার সৈয়্যদ আহমদ সাহেব, আপনি ইসলামের বন্ধু সেজে ও ইসলামের দুর্গে প্রবেশ করে দুষমনদের সুবিধার্থে দুর্গ-দ্বারসমূহ উম্মুক্ত করে দিলেন এবং দুর্গাভ্যন্তরে ইসলামী সেনাদের হাত-পা বেঁধে রাখারই প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, যেন নির্বিঘ্নে ইসলামের শত্রুগণ ইসলামী দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যথেচ্ছাচারী হতে পারে। সুতরাং আপনার এরূপ কর্মতৎপরতা মুসলমানদেরকে বর্তমান জামানার দাজ্জালী ফেত্না হতে নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।"

তিনি আরও বলেনঃ 'আল্লাহ্তা'লা যেহেতু কোরআন শরীফের হেফাযতের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; যেমনঃ "ইন্না নাহনু নাজ্জাল্নায্যিক্রা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফেযূন।" সুতরাং আল্লাহ্র এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই ঐশী সাহায্যের অপেক্ষায়ই থাকা উচিত ছিল। ইহা আপনার ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, সময়ের স্রোতে ভাসমান "**ইসলামের তরী যত বড় প্রচন্ড ঝড়-তুফানের কবলেই নিপতিত হউক না কেন আল্লাহ্ই আসমানী মদদের ব্যবস্থাপনা করে এ তরীকে অবশ্যই রক্ষা করবেন।** প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আল্লাহ্র মদদের অপেক্ষা না করে তাড়াহুড়া করে আপনি নিজেই ইসলামের কান্ডারি সেজে ইসলামের মূল্যবান সম্পদসমূহ দরিয়াতে নিক্ষেপ করতে প্রয়াশ পেলেন কেন?"

এখন কথা হচ্ছে যেঃ 'হার চে গুজাস্ত গুজাস্ত' 'অর্থাৎ গতস্য শোচনা নাস্তি'। এখন আমি দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করছি ঃ

"اب میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں اور بشارت پہنچاتا ہوں کہ اس خدا نے جو آسمان و زمین کا خدا ہے۔ زمین کے طوفان زدوں کی فریاد سن لی۔ اور جیسا کہ اس نے اپنی پاک کلام میں طوفان کے وقت اپنے جہاز کو بچانے کا وعدہ کیا ہوا تھا وہ وعدہ پورا کیا اور اپنے ایک بندہ کو یعنی اس عاجز کو جو بول رہا ہے۔ اپنی طرف سے مامور کرکے وہ تدبیریں سمجھا دیں جو طوفان پر غالب آویں اور مال و متاع کے صندوقوں کو دریا میں پھینکنے کی حاجت نہ پڑے۔"

—(آئینہ کمالات اسلام - ص ۲۷۱ - حاشیہ)

অনুবাদ ঃ "আপনাদেরকে এখন আমি এ সুসংবাদ দিচ্ছি যে, সেই খোদা যিনি আসমান ও জমীনের খোদা তিনি বর্তমান জামানাতে প্রচন্ড ঝড়-তুফানে নিপতিত ইসলামের তরীকে রক্ষা করবার জন্য আপনাদের (ইসলাম দরদীদের) আকুল প্রার্থনা শ্রবণ করেছেন এবং এ তরীকে ঝড়-তুফান হতে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তাঁর পাক-পবিত্র কালামের মধ্যে যে ওয়াদা করেছিলেন সে অনুসারে আল্লাহ্ আপনাদের করুণ ক্রন্দন কবুল করেছেন এবং আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান এ অধমকে আল্লাহ্‌র তরফ হতে মা'মুররূপে প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁকে (খাকসারকে) ঐসব পন্থাসমূহ জ্ঞাত করেছেন যার ফলে এ তুফান হতে আপনাদিগকে রক্ষা করা যায় এবং ইসলামের মহামূল্যবান রত্নরাজি যেন দরিয়াতে নিক্ষেপ করার প্রয়োজন না হয়।"তিনি ইহাও বলেন ঃ

"اسی طوفان کے وقت خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو مامور کیا اور فرمایا واصنع الفلک باعیننا ووحینا یعنی تو ہمارے حکم سے اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر اس کشتی کو طوفان سے کچھ خطرہ نہ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ اس پر ہوگا۔ سو وہ خالص اسلام کی کشتی یہی ہے جس پر سوار ہونے کے لئے میں لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اگر آپ جاگتے ہو تو اٹھو اور اس کشتی میں جلد سوار ہو جاؤ۔ کہ طوفان زمین پر سخت جوش کر رہا ہے اور ہر ایک جان خطرہ میں ہے۔"
(آئینۂ کمالات اسلام، ص ۲۷۱—۲۷۲ حاشیہ)—

অনুবাদ ঃ 'আল্লাহ্‌তা'লা এ অধমকে মামুর করেছেন এবং ইলহামের মাধ্যমে কোরআনের এ আয়াতটি আমার উপর পুনরায় অবতীর্ণ হয়েছেঃ

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

অনুবাদ ঃ তুমি আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর (১১ঃ৩৮)।

অর্থাৎ আমার ওহী অনুসারে আমার দৃষ্টির সম্মুখে তুমি একটি তরী নির্মাণ কর এবং ঝড়-তুফান হতে এ তরীর ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই; এবং উহার সাহায্যে

আল্লাহ্‌র হাত থাকবে। যে তরীতে আরোহণ করবার জন্য আমি জগদ্বাসীকে আহ্বান করছি ইহাই ইসলামের প্রকৃত তরী। যদি জেগে থাক তবে উঠ এবং ক্ষিপ্রতার সহিত এ কিস্তিতে আরোহণ কর। কারণ জমীনের উপর তুফান প্রচন্ড হতে প্রচন্ডতর আকার ধারণ করেছে এবং প্রতিটি প্রাণীই এখন মারাত্মক বিপদের কবলে নিপতিত।"

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলামঃ পাদটীকা পৃঃ ৬১-৬২)

অবশেষে তিনি স্যার সৈয়্যদ আহমদ খানকে সম্বোধন করে বলেনঃ "আপনি স্মরণ রাখবেন, কোরআনের শিক্ষার উপর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের সকল দর্শনে সম্মিলিত আক্রমণ হতেও কোরআনের প্রথম অক্ষর থেকে শেষ অক্ষর পর্যন্ত অর্থাৎ বিসমিল্লাহ্-এর 'বে' হতে সূরা নাসের 'সীন' পর্যন্ত লেশমাত্রও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন এমন একটি প্রস্তরসদৃশ যে উহার উপর পতিত হবে সে নিজেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তথাপি আপনি পাশ্চাত্য দর্শনের সম্মুখে নতজানু হয়ে তাদের সংগে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন কেন?

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, টীকাঃ ২৫৭ পৃঃ)

তিনি আরও ঘোষণা করলেনঃ "সেই সর্বশক্তিমান খোদা স্বীয় খাস 'মোকালামা'-'মোখাতাবা' দ্বারা আমাকে বিভূষিত করেছেন এবং আমাকে জ্ঞাত করা হয়েছে যে, ইসলাম বিরোধীদের সঙ্গে যে কোন রূহানী বারাকাত এবং ঐশী-মদদের প্রতিযোগিতায় আল্লাহ্‌তা'লা আমার সমর্থনে থাকবেন এবং তিনি আমাকে তাদের উপর গালবা (বিজয়) প্রদান করবেন।"

– (জঙ্গে মোকাদ্দাসঃ ১৭৩-৩৮ পৃঃ)

ইসলামের হেফাযতের প্রয়োজনীয়তা এবং আসমানী সাহায্য

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে তথা খৃষ্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ সময়টা যে ইসলামের ইতিহাসে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটা বড় ঝঞ্ঝাটপূর্ণ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তা সর্বজনস্বীকৃত। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে ত্রিত্ববাদের বাহক খৃষ্টান মিশনারিগণ ইসলাম ও ইসলামের নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বানাওটি ও মিথ্যা অপপ্রচারে মেতে উঠেছিল। তদুপরি আর্যসমাজী পন্ডিত এবং ব্রাহ্মসমাজী বক্তাগণ হয়ে উঠেছিলেন ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর।

এ সম্পর্কে কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেছেনঃ ত্রিত্ববাদিতা বিশ্বাসের সংরক্ষক তথা ব্রিটেনের তদানীন্তন রাণী ও ভারত সম্রাজ্ঞীর সাহায্যপুষ্ট খৃষ্টান মিশনারিগণ ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে ব্যাপক আকারে পুস্তক-প্যাম্ফলেটসমূহ প্রকাশ করে এ উপমহাদেশে প্রচারের এক তুফান বইয়ে দিয়েছিল। মিশনারিগণ ঐ সময়ে ৬ কোটিরও অধিক পুস্তকাদি প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁদের ঐসব পুস্তক, প্যাম্ফলেট, বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্রাদি একত্রে জমাট করে স্তূপাকারে রাখলে উচ্চতায় হিমালয়সদৃশ এক বিরাটকায় পর্বতের আকার ধারণ করবে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ইসলাম ও ইসলামের নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এ সব বিষময় অপপ্রচারের ফলে নিরীহ এবং দারিদ্র্য নিপীড়িত মুসলমানদের মধ্যে মুর্তাদ হওয়ার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এমনকি পাদ্রীদের এ মারাত্মক কার্যক্রমের প্রাথমিক পর্যায়েই প্রায় লক্ষাধিক মুসলমান তৌহীদ বর্জন করে ত্রিত্ববাদী মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। *

আরও পরিতাপের বিষয় যে, ঐ সময়ে শত শত আলে রসূল [রসূলে করীম (সাঃ)-এর বংশোদ্ভূত] ব্যক্তিবর্গও ত্রিত্ববাদিতার মতবাদে দীক্ষা নিয়ে আমাদের প্রিয় সরওয়ারে কায়েনাত রসূলে আরাবী (সাঃ)-এর দুষমনদের কাতারে যোগদান করেছিলেন।

হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ঐ সময়কার ইসলামের শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করে তাঁর পারসি ভাষায় রচিত কবিতায় বলেছিলেনঃ

ع - هر طرف کفرست جوشاں همچو افواج یزید -
دین حق بیمار و بیکس همچو زین العابدین -
(درثمین - فارسی)—

---

* টীকাঃ ঐতিহাসিকদের মতে পরবর্তী সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আরও বহু মুসলমান মুর্তাদ হয়েছিল যাদের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩ লক্ষাধিক।

অনুবাদ ঃ "ইসলামের অস্তিত্ব ছিল তখন জর্জরিত। বস্তুতঃ ঐ সময়টাতে ইসলামের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল কারবালার মাঠে নিঃসহায় এতীম জয়নাল আবেদীনসদৃশ।"

ইসলামের এ নিঃসহায়াবস্থায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা হতে সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে লিখেছেনঃ "আজকাল সর্বধর্মের অনুসারীরাই নিজ নিজ ধর্মকে বিজয়ী করবার জন্য খুবই জোশের বশবর্তী হয়ে পড়েছেন এবং আপনাপন মযহাব সম্প্রসারিত করার জন্য খুবই কর্মতৎপর। খৃষ্টান মিশনারিগণ দাবী করেছেন যে, এখন হতে সারা পৃথিবীতে একমাত্র খৃষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়বে। আর্য সমাজীরা দাবী করছেন যে, তাদের মযহাবই বিশ্বের উপর বিজয়ী হবে। ব্রাহ্মসমাজী বক্তাগণ বাগাড়ম্বর করছেন যে, ব্রাহ্ম মতবাদটাই একমাত্র সার্বজনীন মতবাদ হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং এ ব্রাহ্ম সমাজী ধর্মই সারা বিশ্বে বিস্তারিত হয়ে পড়বে; কিন্ত এরা সব মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের কারও সঙ্গে খোদার সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ্‌তা'লা ইলহামের মাধ্যমে আমাকে জ্ঞাত করেছেন যে, পৃথিবীতে এখন একমাত্র ইসলাম ধর্মই সম্প্রসারিত হতে থাকবে এবং অন্যান্য সব ধর্মই ইসলামের মোকাবেলায় লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হবে।" –(মলফূযাত, দ্বিতীয় জিলদঃ ৩৪৩ পৃঃ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম এবং মুসলমান জাতির শোচনীয় দুরবস্থা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে বর্তমান যুগের একজন প্রখ্যাত আলেম এবং ইসলামী চিন্তাবিদ বলে খ্যাত 'আল্লামা সায়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী' তাঁর পুস্তক 'কাদিয়ানীয়ত-এর ২১৭-২০ পৃষ্ঠা লিখেছেনঃ

"ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষভাগে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটনার পরবর্তী যুগে আলমে ইসলামে কী অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের সম্মুখে কী কী সমস্যাবলী এবং শকিলাত বিদ্যমান ছিল একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই তা বোধগম্য হতে পারে। ইসলামের জন্য এযুগে যতসব ভয়াবহ ঘটনাপ্রবাহ বিরাজমান ছিল কোন ঐতিহাসিক বা ধর্ম সংস্কারকের পক্ষেই তা উপেক্ষনীয় হওয়া সম্ভব নহে। ওসবের উল্লেখ্য প্রবাহ ইহাই যে, আলমে ইসলামের উপর সাধারণভাবে এবং এ উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর বিশেষভাবে ইউরোপ হতে মারাত্মক আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল এবং সে সময় তাদের দ্বারা আমদানীকৃত যে 'নেযামে তালীম' তথা শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে খোদাপরস্তি এবং খোদাসানাসীর (আল্লাহ্‌কে চিনিবার প্রবৃত্তি) রূহ হতে সম্পূর্ণ শূন্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ তাহযীব ছিল জড়বাদিতা এবং নফসপরস্তি বা আমিত্ববাদ দ্বারা ভরপুর।

সে নাজুক সময়টাতে উপমহাদেশের মুসলমানগণ ঈমান-এলেম এবং পার্থিব শক্তিতে দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে সহজেই এ নবজাত সাজ-সরঞ্জাম সুসজ্জিত পাশ্চাত্য শক্তির শিকার হয়ে গেল"। ----------মৌলানা আল্-নদভী আরও মন্তব্য করেনঃ **"ঐ সময়টাতে এরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য এক মহান রূহানী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল**; যিনি ইসলামী জগতে এক রূহে জেহাদ এবং মুসলমানদেরকে সুসংগঠিত করে তুলেন এবং স্বীয় রূহানী শক্তি ও

প্রতিভার মাধ্যমে দীন-ইসলামের মধ্যে কোনরূপ তাহ্‌রীফ না করে ইসলামের শাশ্বত বাণী দ্বারা এযুগের ইসলাম দরদী উৎকণ্ঠাপূর্ণ রূহসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সন্ধি স্থাপনের মহৎ কার্য সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হন এবং পাশ্চাত্যের প্রচন্ড আক্রমণের মোকাবেলায় স্বীয় চক্ষু মিলাতে (মোকাবেলায় দাঁড়াতে) সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।"--------

এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেনঃ "ঐ সময়ে একটি শক্তিশালী তালিমী তাহরীক (শিক্ষা আন্দোলন) এবং দাওয়াতের প্রচারাভিযানের আবশ্যক ছিল। সে সময় প্রয়োজন ছিল নব্য চিন্তাধারা সম্বলিত এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং আবশ্যকতা ছিল ইসলামের স্বপক্ষে আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে এরূপ হৃদয়গ্রাহী এবং মর্মস্পর্শী প্রকাশনাদির প্রকাশ, যেগুলোর ফলশ্রুতিতে এ উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর মযহাবী ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী লোকদের মধ্যে মযহাবী অভিজ্ঞতা, দীন-ই শয়ুর (ধর্মীয় অনুভূতি) এবং যেহনী এতমিনান (বুদ্ধিমত্তার প্রশান্তি) সৃষ্টি করতে সক্ষম। এতদ্ব্যতিরেকে **আলমে ইসলামের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কাজ ইহাও ছিল যে, নবীগণের প্রচারাভিযান পদ্ধতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ উম্মতকে ঈমান, আমলে সালেহ এবং খাঁটি ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা। মুদ্দাকথা এই যে, এই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে বস্তুতপক্ষে কোন দীনে জাদীদের (নতুন ধর্মের) প্রয়োজন ছিল না। বরং ইসলামের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল এক 'ঈমান জাদীদ' তথা নতুন ঈমান।**

'কাদিয়ানীয়ত' পুস্তকের রচয়িতা প্রখ্যাত চিন্তাবিদ অবশেষে এ স্বীকারোক্তিও করেছেন ঃ

"আলমে ইসলামের অন্তর্গত এক শোচনীয় মাকাম হিন্দুস্তানের সমস্ত এলাকাতে যখন শোচনীয় অতীব স্নায়ুবিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক টানা-হেঁচড়া পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, **ঠিক তখনই কাদিয়ানের অধিবাসী মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব স্বীয় দাবী এবং তাঁর নিজস্ব মতবাদ নিয়ে জনসমক্ষে অবতীর্ণ হলেন"।**

– (কাদিয়ানীয়তঃ ২২১ পৃঃ)

জনাব নদভী সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্য হতে বস্তুতপক্ষে ইহাই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হচ্ছে যে, কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পাশ্চাত্যের নব্য জড়বাদিতার আক্রমণ হতে ইসলামকে রক্ষা করার জন্যই ইসলাম ও জাতির সেই ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহ্‌র নির্দেশে আল্লাহ্‌র সাহায্যপুষ্ট হয়ে যথাসময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি (আঃ) ঘোষণা করেন ঃ

وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت
میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔

'সময় তো ছিল মসীহার সময়, অন্য আর কারো সময় নয়, যদি আমি না আসতাম, তবে কেউ না কেউ আসতই'।

ঐ জামানাতে ইসলামের জন্য এরূপ দুর্যোগপূর্ণ এবং বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে মির্যা সাহেব বলেছেনঃ

"চতুর্দিক হতে কীভাবে বালা-মুসীবত ইসলামকে পর্যুদস্ত করে তুলেছে এবং সর্বদিক হতে শত্রুগণ কীরূপে ইসলামের উপর এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করছে যার ফলে কোটি কোটি মানুষের উপরে এরূপ বিষক্রিয়া কার্যকরী হতে চলেছে; সেদিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

বর্তমান জামানার এ এলমী তুফান, ফিলসফীর তুফান, মকর ও ষড়যন্ত্রের তুফান, ফিছ্ক ও ফজুরের তুফান, আবহান ও দাহরিয়াতের তুফান (আত্মম্ভরিতা ও নাস্তিকতার তুফান), শিরক এবং বেদাতের তুফানসমূহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ, এরূপ কোনপ্রকার দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে কখনও পরিলক্ষিত হয়েছিল কি না? যদি তোমাদের শক্তি থাকে তবে কোন দৃষ্টান্ত আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।"

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলামঃ ২৫৩ পৃঃ)

অতঃপর মির্যা সাহেব (আঃ) সে জামানার জনসাধারণের উপর 'এতমামে হুজ্জত' বা প্রমাণাদি পূর্ণরূপে পেশ করতে গিয়ে ঘোষণা করলেনঃ

"এখন আমি এতমামে হুজ্জতের জন্য প্রকাশ করতে চাই যে, এ জামানাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় লক্ষ্য করে এবং দুনিয়াকে গাফলত, কুফরী এবং শিরকে ডুবন্ত ও বিশ্ববাসীর ঈমান, সিদক্, তাকওয়া, এবং সত্যবাদিতার বিলুপ্তির প্রেক্ষিতে তাদের উদ্ধারকল্পে দুনিয়াতে এলমী, আমলী, আখলাকী এবং ঈমানী সত্যতাকে পুনঃ সংস্থাপিত করবার জন্যই আল্লাহ্তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন।"

"এ জামানায় শত্রুগণ যেভাবে দার্শনিক তত্ত্ব, ত্রিত্ববাদ, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং শিরক ও নাস্তিকতার বেশে এলাহি বাগানটিকে (ইসলামকে) ধ্বংস করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সেভাবে উহার পরিত্রাণ কল্পেই আল্লাহ্তা'লা আমাকে এ জামানার জন্য আবির্ভূত করেছেন।"

"সুতরাং হে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ ! তোমরা ভেবে দেখ ইহাই কি সে সময় নহে, যখন ইসলামের জন্য কোন 'আসমানী সাহায্যের আবশ্যকতা' অনুভূত হচ্ছে?"

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলামঃ ২৫১ পৃঃ)

আর্যসমাজীদের সঙ্গে রূহানী মোকাবেলা

যুক্তিতর্কের সংগ্রামে আর্যসমাজীদের বিরুদ্ধে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) কীভাবে জয়ী হয়েছিলেন নিশ্চয়ই তা সবাই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাদের সঙ্গে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর কিছু রূহানী মোকাবেলার দৃষ্টান্তও সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করছি। 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামক প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশ করে ইসলামের উপর আর্যসমাজীদের যাবতীয় আপত্তি-অভিযোগের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়ে পন্ডিতগণকে চ্যালেঞ্জ দেওয়ার পরেও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। ইসলাম সত্য না বৈদিক ধর্ম সত্য এ বিষয়ের উপর স্বামীজীর সঙ্গে বহস-মোবাহেসা উপলক্ষে কয়েক দফা পত্রের আদান প্রদান হয়। কিন্তু আর্যসমাজী পন্ডিতগণের পক্ষ হতে তাদের বৈদিক ধর্মের সত্যতার পক্ষে কোন সময়েই কোন যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞজনোচিত উত্তর পাওয়া যায়নি। বরং ইসলামের উপর হিংসামূলক আক্রমণ, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ছাড়া তথ্যমূলক কোন কিছুই তারা পেশ করতে সক্ষম হননি।

অবশেষে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লা হতে প্রাপ্ত একটি ইলহামের মাধ্যমে দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ অবগত হয়ে তাঁর স্বীয় বাসস্থান কাদিয়ানের অধিবাসী স্থানীয় আর্যসমাজীগণকে জানিয়ে দিলেন। ঠিক সেভাবেই ১৮৮৩ সনে দয়ানন্দ সরস্বতী ইহলীলা ত্যাগ করেন। – (হাকীকাতুল ওহী পুস্তক ঃ ২২১ পৃঃ)

স্বামীজীর পরলোকগমনের পর ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং আর্য সমাজীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, বহস-মোবাহাসায় কিছুকালের জন্য ভাটা পড়ে গেল।

এ বিরতির পর আর্যসমাজী মতবাদের মুখপাত্র হিসেবে দু'জন 'জেনারেল' ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সংগ্রামে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন (১) মুনশী ইন্দ্রমন মোরাদাবাদী, অপর জন ছিলেন (২) পন্ডিত লেখরাম পেশওয়ারী। মুনশী ইন্দ্রমন মোরাদাবাদী বেশ কিছুদিন যাবত হযরত মির্যা সাহেবের (আঃ) সঙ্গে পত্রেযোগে বহস-মোবাহাসায় লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু হযরত সাহেবের পক্ষ হতে যথাযথ যুক্তি পেশ করার ফলে ইন্দ্রমন মোরাদাবাদীর কর্মকান্ড স্তিমিত হয়ে গেল। এ ব্যাপারে মির্যা সাহেবের সঙ্গে চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্যঃ

১৮৮৫ সনে মির্যা সাহেব (আঃ) এক ইস্তাহার মারফত আর্যসমাজীদেরকে শিক্ষিত এবং নেতৃস্থানীয় কোন এক ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে মোজেযা কারামাত অবলোকন করার জন্য কাদিয়ানে এসে এক বৎসর বসবাস করুক; এবং এ-ও ঘোষণা করলেন যে, সংশ্লিষ্ট আর্য সমাজী এক বৎসর থাকাকালীন সময়ে যদি ইসলামের সত্যতার সমর্থনে 'মোজেযা ও নিশানা' দেখতে না পান তদবস্থায় তাঁকে মাসিক ২০০ (দুইশত) টাকা হারে এক বৎসরে মোট ২৪০০ (দুই হাজার চারশত) টাকা প্রদান করা হবে। আর যদি এক বৎসর থাকাকালীন ইসলামের সত্যতা নিরূপণের সপক্ষে কোন মোজেযা ও নিশানা দেখতে পান, তাহলে আমার কাছে তাঁকে দীক্ষা গ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। এ প্রস্তাবটি ঘোষণা করার পরে আর্যসমাজীদের মধ্যে পন্ডিত ইন্দ্রমন মোরদাবাদী ব্যতিরেকে আর কেউই সাড়া দেননি।

ইন্দ্রমন মোরাদাবাদী এ প্রস্তাবকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং বিভিন্ন শহরে প্রচার করতে করতে অবশেষে 'নাবাহ' হতে লাহোর আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, প্রস্তাবিত এক বছরের ভাতা বাবদ যদি একই সময়ে একেবারেই তাকে মোট দুই হাজার চারিশত টাকা প্রদান করা হয় তবে অবশ্যই তিনি মির্যা সাহেবের প্রস্তাব মোতাবেক কাদিয়ান এসে এক বৎসর থাকবেন।

হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) পন্ডিত ইন্দ্রমন মোরাদাবাদী মহাশয়ের উক্ত প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং তাঁর একজন প্রিয় শিষ্য আবদুল্লাহ্ সানাওয়ারী সাহেবকে যথাযথ নির্দেশ প্রদান করে লাহোর পাঠালেন। হযরত মির্যা সাহেবের ভক্তদের নিকট হযরত সাহেবের উপরোক্ত পয়গাম পৌছালেন এবং স্থির সিদ্ধান্ত করলেন যে, পর দিবস সকালেই তাঁরা প্রস্তাবিত টাকা পন্ডিত মহাশয়কে প্রদান করবেন। প্রস্তাবটিতে পন্ডিত মহাশয় সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন এবং পরের দিন সকাল বেলায় টাকা গ্রহণ করতেও রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, কয়েকজন সঙ্গীসহ আবদুল্লাহ্ সানাওয়ারী সাহেব তদনুসারে টাকা নিয়ে পরের দিন সকাল বেলা পন্ডিতজীর বাসভবনে পৌছা মাত্রই জানতে পারলেন যে, তিনি বাসাতে নেই এবং অন্যেরা জানিয়ে দিলেন যে, পন্ডিত মহাশয় গত রাতেই ট্রেনে কোন অনির্দিষ্ট স্থানের জন্য লাহোর ত্যাগ করে চলে গেছেন।

এ ঘটনার পর ইন্দ্রমন মোরাদাবাদী মহাশয় ইসলামের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আর কোন প্রচার তৎপরতা দেখাননি এবং কিছু কালের মধ্যেই তিনিও ইহধাম ত্যাগ করে চলে গেলেন।

বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে তিনি আর্যসমাজীগণকে এবং পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের নেতৃবর্গকে আহ্বানপূর্বক বললেনঃ কোরআন মজীদের যথার্থতা এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য যে সকল যুক্তি তিনি ঐ কেতাবে কোরআন করীম হতে উপস্থাপিত করেছেন, কোন অমুসলমান যদি এর অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশও তাদের ঐশী পুস্তক বা শাস্ত্র হতে প্রদর্শন করতে সমর্থ হন,আর তিনি ইসলামের সপক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করেছেন, একাদিক্রমে (কোন অমুসলমান) যদি ঐগুলোকে খন্ডন করতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁর দশ সহস্র টাকার সম্পত্তি ঐ ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করবেন। কিন্তু প্রস্তাবের মধ্যে এরূপ শর্ত বাধ্যকর থাকবে যে, নির্বাচিত তিনজন জজের একটি সালিশী বোর্ড তথা ট্রাইবুনাল-এ মীমাংসা দেবেন, শর্তাবলী মোতাবেক যথাযথভাবেই জওয়াব লিখিত হবে।

বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের প্রথম খন্ডে মির্যা সাহেবের এরূপ জোরালো চ্যালেঞ্জ ঘোষণা সত্ত্বেও আর্যসমাজীদের জবরদস্ত নেতা বলে স্বীকৃত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় নীরব ভূমিকাই পালন করেছিলেন। পন্ডিত লেখরাম পেশওয়ারী (পিতা রামসিং শর্মা) নামীয় একজন আর্য সমাজী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের একজন শিষ্য ছিলেন। লেখরাম পেশওয়ারী ছিলেন চতুর, কটুভাষী এবং ধৃষ্ট প্রকৃতির লোক। তিনি ছিলেন কট্টর আর্যসমাজী এবং ইসলাম ও ইসলামের নবী করীমের (সাঃ) প্রতি সর্বদাই কটু বাক্যবাণে লিপ্ত থাকতেন। 'তকযীবে বারাহীনে আহ্মদীয়া' নামকরণ করে তিনি হযরত

আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর রচিত প্রখ্যাত 'বারাহীনে আহমদীয়া' কেতাবের বিরুদ্ধে একটি পুস্তক রচনা করেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বারাহীনে আহমদীয়াতে উল্লেখিত তৌহীদ ও ইসলামের সপক্ষে বর্ণিত জ্ঞান-গবেষণামূলক উচ্চমানের যুক্তি, তত্ত্বসমূহ এবং তথ্যসমূহকে পন্ডিতজী পাশ কাটিয়ে গেলেন। কোন প্রকার এলমী গবেষণা বা বিজ্ঞজনোচিত পদক্ষেপ না নিয়ে কেবল রসূল করীম (সাঃ)-এর পূত পবিত্র জীবন এবং তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও বানওয়াট কুৎসা রটনা করে এবং ইসলামের উপর অকথ্য গালিবর্ষণ করেই বইটির সমাপ্তি টানলেন।

প্রকৃতপক্ষে, এ কট্টর আর্যসমাজী পন্ডিত দ্বারা প্রণীত পুস্তকটির যে নামকরণ করা হয়েছিল উহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উহাতে বর্ণিত বিষয়-বস্তুতে কীরূপ অবান্তর আর বাজে বাক্যবাণে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করতে প্রয়াশ পেয়েছিল। কিন্তু তবুও হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)–এর একজন অতীব প্রিয় এবং বিশিষ্ট শিষ্য হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব, যিনি হযরত আকদসের (আঃ) ওফাতের পর প্রথম খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, 'তাসদীকে বারাহীনে আহমদীয়া' নামে পুস্তক লিখে এর এক চমৎকার জওয়াব প্রকাশ করেন। 'তাসদীকে বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকটি ছিল ইসলামের গভীর জ্ঞানপূর্ণ রত্নরাজীতে ভরপুর।

অতঃপর ১৮৮৬ সনের ২০ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এ মর্মে একটি ইশতেহার প্রকাশ করলেন যে, মুনশী ইন্দ্রমন মুরাদাবাদী ও পন্ডিত লেখরাম যদি ইচ্ছা করেন তাহলে বৈদিক ধর্মের মোকাবেলায় ইসলামের সত্যতা যাচাই করার জন্য তাদের কাযায়ে কদরের (অর্থাৎ মৃত্যু সম্পর্কে) কোন ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা যেতে পারে।

ইশতেহার মারফত এ আহ্বান প্রকাশিত হওয়ার পর মুনশী ইন্দ্রমন মোরাদাবাদী মহাশয় একেবারে চুপ হয়ে গেলেন এবং কিছুকাল পরে মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু পন্ডিত লেখরাম পেশওয়ারী উহার উত্তরে ডাকযোগে মির্যা সাহেবকে এক পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে ধৃষ্টতার সাথে জানালেন ঃ

"میری نسبت جو پیشگوئی چاهو شائع کردو۔
میری طرف سے اجازت هے۔"

অনুবাদঃ "আমার সম্পর্কে যা ইচ্ছা ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করুন। এজন্য আমার পক্ষ হতে আপনাকে অনুমতি প্রদান করা হল।"

এ অনুমতি প্রাপ্তির পর হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার হুযূরে দোয়া করতে লাগলেন। অতঃপর হযরত আহমদ কাদিয়ানীর উপর লেখরাম সম্পর্কে ইলহাম হল ঃ

"عِجْلٌ جَسَدٌ لَهُ خُوَارٌ وَّلَهُ نُصْبٌ وَّ عَذَابٌ ٥"

অনুবাদ ঃ "ইহা (অর্থাৎ পন্ডিত লেখরাম) প্রাণহীন গো-বৎস, ইহার ভিতর হতে এক প্রকার ঘৃণিত শব্দ বের হচ্ছে। অমর্যাদাসূচক ব্যবহার এবং কুবাচ্যের প্রতিফলস্বরূপ শাস্তি ও দুঃখ নিরূপিত হয়েছে যা অবশ্যই সে ভোগ করবে।"

– (তবলীগে রেসালতঃ তৃতীয় খন্ড)

এ ইলহাম প্রাপ্তির পর পন্ডিত লেখরামের আযাবের নির্দিষ্ট সময় নির্ণয় করার জন্য হযরত আকদস (আঃ) ১৮৯৩ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আল্লাহ্‌র দরবারে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানরত অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁর নিকট প্রকাশ করলেন ঃ

" آج کی تاریخ سے جو ۲۰ فروری سنہ ۱۸۹۳ ع سے
چھ برس کے عرصہ تک یہ شخص اپنی بد زبانیوں کی سزا
میں یعنی اُن بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہیں -
عذاب شدید میں مبتلا ہو جائیگا -"

(تبلیغ رسالت - جلد ۳)

অনুবাদ ঃ "অদ্যকার তারিখ, ১৮৯৩ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী, হতে ৬ বৎসর সময়ের মধ্যে এ ব্যক্তি তার কুভাষা প্রয়োগ এবং রসূলে করীম (সাঃ) সম্পর্কে যে সকল বেআদবী করেছে ঐসবের শাস্তিস্বরূপ ভীষণ আযাবে পতিত হবে।"

–(তবলীগে রেসালাতঃ তৃতীয় জিলদ)

এ সম্পর্কে হযরত আকদস (আঃ) এ মর্মে আল্লাহ্‌তা'লা হতে আরও একটি ইলহাম প্রাপ্ত হলেন যে, "ইউকযা আমরাহু ফি সিত্তীন" অথাৎ, 'পন্ডিত লেখরামের বিষয়ের সমাপ্তি ছয়-এর মধ্যে নিহিত আছে।

২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩ সনের ইশ্‌তেহারের মারফত পন্ডিত লেখরাম সম্বন্ধে হযরত আকদস (আঃ) দু'টি পারসি বয়াতও প্রকাশ করেছিলেন ঃ

(১)

"آگاہ اے دشمن نادان و بے راہ -
بترس از تیغ بُرّانِ محمد -"

অনুবাদ ঃ "সাবধান! ওহে ইসলামের অজ্ঞ ও বিপথগামী শত্রু, তুমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তীক্ষ্ণ তরবারিকে ভয় কর।"

(২) "کرامت گرچہ بے نام و نشان است -
بیا بنگر ز غلمان محمدؐ -"

অনুবাদ ঃ "যদিও কারামাতের কোন নাম-চিহ্নও নেই, আস মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক সন্তান ও সেবকগণের নিকট উহা দর্শন কর।"

অতঃপর ১৮৯৩ সনের প্রণীত 'কারামাতুস্ সাদেকীন' গ্রন্থে লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর উপর নাযিলকৃত অপর আর একটি আরবী ইলহাম প্রকাশিত হয় ঃ

(ক) "سَتَعْرِفُ يَوْمَ الْعِيْدِ وَالْعِيْدُ اَقْرَبُ"

অনুবাদ ঃ "পন্ডিত লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কে খোদাতা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, শীঘ্রই সে ঈদের দিনের পরিচয় লাভ করবে এবং মুসলমানদের প্রকৃত ঈদের দিনও সে ঈদের নিকটবর্তী হবে।"

অতঃপর ১৮৯৩ সনের ২রা এপ্রিল এক ইশ্‌তেহারের মাধ্যমে হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) জনসমক্ষে ঘোষণা করলেন যে, "আজ ২রা এপ্রিল ১৮৯৩ সন মোতাবেক ১৩১০ হিজরী ১৪ই মাহে রমযান প্রত্যুষে ঈষৎ তন্দ্রাবস্থায় কাশ্‌ফে (দিব্য দর্শনে) আমি দর্শন করলাম যে, একটি বিরাট আয়তনবিশিষ্ট বাড়ীতে উপবিষ্ট আছি। কতিপয় বন্ধুও আমার নিকটেই আছেন। ইতিমধ্যে একজন বিপুলায়তন, বলিষ্ঠ, ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর চেহারা হতে যেন ঝর ঝর করে রক্ত করছে, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তখন আমি চক্ষু তুলে দেখলাম যে, সে একজন অভিনব দেহ ও চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তি। অন্য কথায় সে মানুষ নহে, নির্মম-কঠোর প্রকৃতির ফেরেশ্‌তাগণের অন্যতম। সকলের মনেই তার ভয় অধিকার করল। তার প্রতি আমি তাকানো অবস্থাতেই ছিলাম ; এমতাবস্থায় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লেখরাম কোথায়?' তখন ইহাই আমি বুঝতে পারলাম যে, এ ব্যক্তি লেখরামকে দন্ড দেওয়ার জন্যই নিযুক্ত হয়েছে। – (ইশ্‌তেহারঃ ২রা এপ্রিল, ১৮৯৩)

এ পটভূমির অপর দিকটাও অবশ্য লক্ষ্য করার বিষয়।

পন্ডিত লেখরাম স্বীয় প্রণীত 'খাবতে আহ্‌মদীয়া' নামক পুস্তকের ২৪৪ পৃষ্ঠায় ঘোষণা করলেনঃ "চারটি বেদের উপর আমি পূর্ণ বিশ্বাসী এবং বেদবাক্য স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। এরূপ কোরআন ও উহার অসুলসমূহকে যা বেদের পরিপন্থী উহাকেও আমি ভুল এবং মিথ্যা বলে বিশ্বাস করি।"

'কিন্তু অপরপক্ষে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কোরআনকে খোদার কালাম বলে বিশ্বাস করেন ও উহার সব শিক্ষাকে সত্য বলে বিশ্বাস রাখেন।

হে পরমেশ্বর! আমাদের দু পক্ষের মধ্যেই সত্য এবং মিথ্যার ফয়ছালা করে দাও। কেননা, তুমি পরমেশ্বরের দরবারে মিথ্যা কখনও সত্যের ন্যায় ইজ্জত পেতে পারে না।

– (খাবতে আহমদীয়া ঃ ৩৪০ পৃঃ)

অতঃপর স্বীয় প্রণীত পুস্তক 'তাকযিবে বারাহীনে আহমদীয়া' নামক গ্রন্থের ৩১১ পৃষ্ঠায় পন্ডিত লেখরাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) সম্পর্কে এক পাল্টা ভবিষ্যদ্বাণী করলেনঃ

"আমার ভগবান আমাকে খবর দিয়েছেন যে, এ ব্যক্তি তিন বৎসরের মধ্যে হায়যা তথা বিসূচিকা রোগে মৃত্যুবরণ করবে। কারণ, সে ঘোর মিথ্যাবাদী এবং কায্যাব।"

উক্ত পুস্তকে তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করলেনঃ "আমার ভগবান আমাকে ইহাও খবর দিয়েছেন যে, তিন বৎসরের মধ্যে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং তার সন্তানদের মধ্যেও কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।"

-(১ঃ তাকযিবে বারাহীনে আহমদীয়াঃ ৩১১ পৃঃ)

(২ঃ কুল্লিয়াতে আরিয়া মুসাফেরঃ ৫০১ পৃঃ)

উপরোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী এবং পাল্টা ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ তদানীন্তন উপমহাদেশের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যখন জোরালো ভাষায় বহুল প্রচারিত হচ্ছিল, তখন দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল শিক্ষিত মহলেই এসব খবরে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত কথা অনুযায়ীই **১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ঈদুল ফিতর দিবসের পর দিবস ৬ই মার্চ শনিবার মানব মূর্তিধারী এক ফেরেশ্‌তার হাতে অলৌকিকভাবে লেখরাম নিহত হলেন।** *

সুতরাং এ ঘটনাটি ৬ বৎসরের ভিতরে ঘটে যাওয়া এবং ঈদের সংলগ্ন দিনে হওয়া, হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষর অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেল। এতদ্বারা দিবালোকের মত স্পষ্টতঃই ইহা প্রমাণ হয়ে গেল যে, ইসলামই একমাত্র জিন্দা

---

* টীকাঃ ঘটনাটি ঘটা মাত্রই পন্ডিত লেখরামের মাতাজী স্বচক্ষে হত্যাকারীকে দেখেছিলেন যে, আততায়ী সংলগ্ন কামড়ায় ঢুকে পড়েছে। তাকে আটকিয়ে রাখার জন্য মাতাজী তৎক্ষণাৎ বাহির থেকে শিকল আটকিয়ে দরজা বন্ধ করে পুলিশকে খবর দেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ইংরেজ পুলিশ সুপার ব্যক্তিগতভাবে রিভলবার হাতে কামরায় প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, সেখানে কেউ নেই। পুলিশ সুপার সাহেব 'সুরতে হাল' লিপিবদ্ধ করার সময় এ ঘটনাটিকে একটি অলৌকিক ঘটনা বলেই মন্তব্য করেছিলেন। আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেও অদ্যাবধি রহস্য উদঘাটন সম্ভবপর হয়নি।

ধর্ম, ইসলামের নবী করীম (সাঃ)-ই একমাত্র জিন্দা নবী এবং দুনিয়ার বুকে পবিত্র কোরআনই একমাত্র জিন্দা কেতাব। লেখরাম সম্পর্কীয় এ অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশের পর চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল এবং এ ঘটনাটির ফলশ্রুতিতে ঐ সময় তিন সহস্র লোক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবীর উপর ঈমান এনেছিলেন।

– (তারিয়াকুল কুলুব)

১৮৯৭ সনের ৬ই মার্চ ঈদ দিবসের পরদিবসে পন্ডিত লেখরামের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটা মাত্রই আর্যসমাজী হিন্দু পত্রিকাগুলো এ হত্যাকে মির্যা সাহেবের নিছক ষড়যন্ত্র বলে অপপ্রচারে মেতে উঠলেন। সমগ্র আর্যসমাজী মহলে মারাত্মক উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং মির্যা সাহেবকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে অনবরত বেনামী পত্রাদি আসতে লাগল। এমনকি বড় বড় পুরস্কার ঘোষণা করে গোপনে সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলোকেও মির্যা সাহেবকে হত্যা করার কাজ তরান্বিত করার নির্দেশ দান করা হল।

প্রবল প্রতাপান্বিত আর্যসমাজীদের তুলনায় মির্যা সাহেবকে একান্তই একজন অসহায়াবস্থায় নিপতিত ব্যক্তি বলে পরিলক্ষিত হয়েছিল; কিন্তু এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা মির্যা সাহেবকে জ্ঞাত করলেনঃ "ওয়াল্লাহু ইয়াসেমুকা মিনান্নাসে" অর্থাৎ 'তোমাকে আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন।'

সে যুগে আর্যসমাজীরা শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে এদেশে খুব উন্নত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এমনকি তদানীন্তন প্রশাসন কর্তৃপক্ষ মহলেও তাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে তাদের অবিরত সক্রিয় প্রপাগান্ডার ফলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকারও হযরত আকদসকে সন্দেহের চক্ষেই দেখতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৯৭ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে গুরুদাসপুর জিলা পুলিশ কর্মকর্তা মিষ্টার লিমারচন্ড সাহেব, বাটালার ডি. এস. পি. সাহেব এবং বহু পুলিশ সমভিব্যহারে কাদিয়ান আসলেন এবং হযরত আকদসের (আঃ) বাড়ীতে খানা-তল্লাশিও করলেন। তাঁদের তল্লাশীর ফলে নির্ণীত হল যে, লেখরামের মৃত্যুর ঘটনার সাথে হযরত আহমদ কাদিয়ানী বা তৎপ্রতিষ্ঠিত জামাতের কোনই সম্পর্ক নেই।

আর্যসমাজী হিন্দু ভ্রাতাগণের ব্যাপারে হযরত আহমদ (আঃ) তদানীন্তন একজন প্রখ্যাত মুসলিম লেখক এবং চিন্তাবিদ স্যার সৈয়্যদ আহমদ খানকে সম্বোধন করে এরূপ সুসংবাদও দিয়ে গেছেন ঃ

"میں آپ کو (یعنی سر سید احمد کو) یقین دلاتا ہوں کہ مجھے یہ بھی صاف لفظوں میں فرمایا گیا ہے کہ پھر ایک دفعہ ہندو مذہب کا اسلام کی طرف زور کے ساتھ رجوع ہوگا۔"

—(تذکرہ – ص ۲۹۷)

অনুবাদ ঃ "আপনাকে আমি এ আশ্বাস দিচ্ছি যে, ইলহামের মাধ্যমে স্পষ্টরূপে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ পুনরায় খুবই জোশের সাথে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবে অর্থাৎ দলে দলে তারা ইসলামে দীক্ষিত হবে। —(ইশ্‌তেহারঃ ১২ই মার্চ, ১৮৯৭)

স্বীয় প্রণীত পুস্তক 'হাকীকাতুল' ওহীতে হযরত আহমদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"اور یقیناً سمجھو کہ آریہ سماج کا خاتمہ ہے۔"

—(حقیقۃ الوحی تتمہ - ص ۱۶۹)

"অবশ্যই তোমরা ইহা জেনে রাখ যে, এখন আর্যসমাজীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার সময় অত্যাসন্ন।" — (হাকীকাতুল ওহী, তাতিম্মাঃ ১৬৯পৃঃ)

হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে আর্যসমাজী পত্র-পত্রিকার মন্তব্য হতেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

আর্যসমাজীদের বিখ্যাত পত্রিকা 'আরিয়াভির' লাহোর পত্রিকার ২৭/২/১৯৩৩ তারিখের শহীদ সংখ্যায় স্বামী দয়ানন্দ তাদের ধর্মের জন্য মৃত্যুবরণের বিষয় উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

"পন্ডিত লেখরামজী মহারাজের জীবনী ও শাহাদত বরণের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী পর্যালোচনা করুন ও তাঁর মোকাবেলায় মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কৃতকার্যতা ও জনপ্রিয়তার দিকে দৃষ্টিপাত করুন এবং বিবেচনা করুন কার পক্ষে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জিত হয়েছে। লেখরামজীর নামে কোথায় সে মিশন, স্কুল, কলেজ এবং তাঁর ত্যাগ ও তিতিক্ষার স্মৃতিস্বরূপ কোন বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি আছে কি?

কিন্তু ইহার মোকবেলায় সারা দুনিয়া জুড়ে এমন কোন একটি এলাকাও বাকী নেই যেখানে সম্মানিত মির্যা সাহেবের নামের প্রচার না হয়েছে। বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ও আলেম-ফাযেলগণ পৃথিবীর কোণে কোণে তাঁর নামের প্রচারে মগ্ন আছেন। এসব বাস্তব সত্যের মোকাবেলায় আর্যসমাজীদের কলেজ সেকশন অথবা গুরুকল সেকশন ইত্যাদির উপস্থিতিতে কোন আর্যসমাজী নিজের বুকে হাত দিয়ে দ্বিধাহীনভাবে একথা বলতে পারেন কি যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মিশনের মোকাবেলায় পন্ডিত লেখরামের মিশনের নামে কি দেশ-বিদেশে কোন মিশন বসানো হয়েছে অথবা বিদ্যমান রয়েছে? — (উদ্ধৃতিঃ আল্‌-ফযলঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ সন)

আন্তঃধর্ম মহাসম্মেলন ও বিশেষ নিদর্শন

আহমদীয় জামাতের প্রাথমিক অবস্থায় সারা উপমহাদেশে বিশেষতঃ পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ (উত্তর প্রদেশ) তদানীন্তন 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' তথা বঙ্গদেশ অঞ্চলে আরও কতিপয় ধর্মীয় আন্দোলন গজিয়ে উঠে। বস্তুতঃ ধর্ম জগতে তখন একটা জাগো জাগো সাড়া পড়ে গিয়েছিল এবং ধর্মাকাশে যেন তখন এক নতুন দিগন্ত পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। ঠিক এমনই সময়ে ১৮৯৬ সনের ডিসেম্বর মাসে লাহোরের কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং গণমান্য ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে এমন এক ধর্মীয় মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হলো, যাতে প্রত্যেক ধর্মের নোমায়েন্দাগণ নিজ নিজ ধর্মের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারেন। এতদুদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রশ্ন নির্ধারিত করা হল যাতে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবর্গ নিজ নিজ ধর্মের ঐশী কেতাব হতে প্রশ্নগুলোর সারগর্ভ উত্তর প্রদান করেন। উদ্যোক্তা কমিটি এ-ও নির্ধারিত করে দিলেন যে, নিজ নিজ ধর্মের ঐশী কিতাব হতে নির্ধারিত প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক সুষ্ঠু জবাব ছাড়া একে অপরের ধর্মের উপর কোন প্রকার আক্রমণমূলক বাক্য ব্যবহার করতে পারবে না।

এ আন্তঃধর্ম মহাসম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্বামী শোগন চন্দর মহাশয়। তিনি কাদিয়ান এসে ব্যক্তিগতভাবে হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে কনফারেন্সে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেন।

বস্তুতঃ অন্যান্য সব ধর্মের মোকাবেলায় ইসলামের বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে জনসমক্ষে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য বহুকাল পূর্ব হতেই হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এমন একটি আন্তঃধর্মীয় মহাসম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছিলেন এবং তদনুরূপ কোন সুযোগেরও আকাঙ্খা করে আসছিলেন। সুতরাং খুব আনন্দের সাথে তিনি প্রস্তাবিত কনফারেন্সে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ইসলামের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হিসেবে তদানীন্তন পাক-ভারত উপমহাদেশের আরও কতিপয় বিশিষ্ট আলেম ও বক্তা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী এবং মৌলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী প্রমুখ। উল্লেখিত দু'জন আলেমই হযরত আহমদ কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে সমালোচনামূখর ছিলেন এবং সারা জীবনই আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন।

সম্মেলনের নির্ধারিত পাঁচটি প্রশ্নের জবাবে হযরত আকদস (আঃ) একটি অতি সারগর্ভ সন্দর্ভ লিখলেন। এটি লেখা চলাকালেই ইলহাম হয়েছিলঃ "ইয়ে উওহ ময়মুন হ্যা জো সাব পার গালেব আয়েগা" অর্থাৎ 'এ ময়মুন সকল ময়মুনের উপরে থাকবে অর্থাৎ বিজয়ী হবে।'

এ ঐশীবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত আন্তঃধর্ম মহাসম্মেলনের ৫/৬দিন পূর্বেই তিনি (আঃ) ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ সনে এক ইশ্তেহার প্রকাশ করলেনঃ

সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্তা'লা ইলহামের মাধ্যমে আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, ইহা তোমার সেই ময়মুন যা সবাই উপরে প্রাধান্য লাভ করবে।-----আমি 'আলমে কাশ্ফে'

অবলোকন করেছি যে, আমার মহলের উপরে গায়েব হতে একটি হস্ত স্থাপন করা হয়েছে এবং ঐ হাতের সংস্পর্শে আমার মহল হতে এক আশ্চর্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়ে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার সন্নিকটে দন্ডায়মান জনৈক ব্যক্তি উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহু আকবর খরিবাত খায়বার'-এর তাৎপর্য হচ্ছেঃ মহল দ্বারা আমার হৃদয় বুঝায়। এ হৃদয়ে জ্যোতিঃ অবতরণ করবে। জ্যোতিঃ বলতে কোরআনের অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বাবলী বুঝাচ্ছে। আর 'খায়বার' দ্বারা জগতের যাবতীয় বিকৃত ধর্মকে বুঝায়। অর্থাৎ স্পষ্টভাবে আমাকে ইহাই বুঝান হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন ও তৌহীদি ধর্মের আলোক প্রকাশিত হতে থাকবে এবং এ আলোকের প্রভাব দ্বারা শিরক মিশ্রিত যাবতীয় বিকৃত মযহাবের অসত্যতা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে গোচরীভূত হতে থাকবে এবং দিন দিন সারা বিশ্বে ইসলামের সত্যতা বিস্তার লাভ করবে।"

অতঃপর আমি এরূপ ইলহাম প্রাপ্ত হইঃ "ইন্নাল্লাহা মায়াকা ইন্নাল্লাহা ইয়াকুমু আয়নামা কুমতু' খোদা তোমার সঙ্গে আছেন। যেখানে তুমি দাঁড়াও স্বয়ং খোদাও সেখানে দন্ডায়মান হন। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ সাহায্য নাযিল হওয়ার একটি রূপক উক্তি।

ইশ্‌তেহারের মাধ্যমে এ মহা ভবিষ্যদ্বাণী উপমহাদেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল।

এই বিখ্যাত আন্তঃধর্মীয় মহাসম্মেলনটির ব্যবস্থাপক বা মডারেটর সদস্যগণের মধ্যে রায়বাহাদুর প্রতুল চন্দ্র চাটার্জী, জজ চীফকোর্ট, পাঞ্জাব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শামিল ছিলেন।

আন্তঃধর্ম মহাসম্মেলনে সাত/আট হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে লাহোরের উচ্চশিক্ষিত এবং গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সুধীবৃন্দেরই অধিক সমাবেশ হয়েছিল।

হযরত মৌলানা আবদুল করীম সিয়ালকুঠি নামক হযরত আকদস (আঃ)-এর একজন প্রিয় শিষ্য যিনি সুবক্তা ছিলেন, এ মহাসম্মেলনে হযরত আকদসের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে শুনানোর জন্য মনোনীত হলেন। সিয়ালকুঠি সাহেব সুললিত কণ্ঠে প্রবন্ধটি পাঠ করতে আরম্ভ করেন। প্রবন্ধটি এমনই হৃদয়গ্রাহী এবং মর্মস্পর্শী হয়েছিল যে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে আবেগ ও শ্রদ্ধার এক ঝড় বয়ে চললো। সকলেই বলতে লাগলেন, ধর্ম তথা ইসলাম ও কোরআনের শিক্ষা সম্পর্কে এমন মৌলিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে আমরা কখনও শুনিনি। প্রবন্ধটির জন্য ব্যবস্থাপক কমিটি দ্বারা নির্ধারিত সময় নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরেও উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও সকল শ্রেণীর জনগণের একান্ত অনুরোধে সময় বাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তবুও শ্রোতৃবর্গের আকাঙ্খা মিটল না। সুতরাং, সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আকদসের বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ শোনবার

জন্য অতিরিক্ত একদিন অর্থাৎ ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হল। বক্তৃতা শেষ হলে একজন বিশিষ্ট হিন্দু শ্রোতা অজ্ঞাতসারে মন্তব্য করে বসলেন, "মির্যা সাহেবের প্রবন্ধটিই সকল প্রবন্ধের উপরে রয়েছে।"

লাহোরের প্রখ্যাত পত্রিকা 'সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট' ফলাও করে প্রচার করলেন ঃ

"সাকল্য গবেষণার মধ্যে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সন্দর্ভই লোকেরা সর্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহের সাথে শুনতেছিলেন। তিনি ইসলামের একজন বড় সমর্থক ও আলেম।"

তাছাড়া, হযরত মির্যা সাহেবের প্রবন্ধটিই যে এ মহাসম্মেলনে সর্বোপরি স্থান পেয়েছিল এ সম্পর্কে 'ইন্ডিয়ান রিভিউ', 'ব্রিষ্টল টাইম্‌স এন্ড মিরর' ইত্যাদি পত্রিকাসমূহ প্রবন্ধটি দ্বারা ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিজয় সম্পর্কে জোরালো মন্তব্য প্রকাশ করেছিল।

বস্তুতঃপক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় এ আন্তঃধর্মীয় মহা-সম্মেলনে ইসলাম ও কোরআনের সত্যতাই উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং ইসলামের সপক্ষে অন্যতম প্রতিনিধি মৌলভী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী ও মৌলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী সাহেবদের এলেমের বাহাদুরীও ফাঁস হয়ে গেল।

ব্রাহ্মসমাজ ও আহমদীয়া জামাত

উনবিংশ শতাব্দীতে ৮ উপমহাদেশে পাশ্চাত্য দেশ হতে আমদানীকৃত খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদি ধর্মের প্রচারাভিযানের সাথে আরও কতিপয় নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ এর মধ্যে অন্যতম। ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব কোন ধর্ম বা কোন 'বোনাফাইডি' ধর্ম পুস্তক বলতে কিছু নেই। সাধারণতঃ ইহাকে হিন্দু ধর্মেরই অন্তর্গত একটি শাখা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তবে তাদের নিজস্ব এমন কতিপয় স্বকপোল কল্পিত আকিদা নির্ধারিত করা হয়েছে যেগুলো হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রচলিত নিয়মকানুন হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পূর্ববর্তী কোন নবী-রসূল বা অবতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মের উপর তারা ঈমান রাখে না। একমাত্র যুক্তির উপর ভরসা করেই তারা তাদের ব্রাহ্মসমাজ মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করে। তাদের প্রচারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অন্য কোন ধর্মের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার আক্রমণমূলক বা উস্কানিমূলক মন্তব্য না করা; নম্রতা, শিষ্টাচারিতা এবং সৌজন্যমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যদের নিকট প্রচার করা। বাহ্যতঃ খোদাকে মানেন বলে তারা প্রচার করে থাকেন কিন্তু পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের উপর নাযিলকৃত কেতাব বা ইলহাম মানেন না। এটি একটি সমন্বয়বাদী লৌকিক ধর্মমত।

ইলহাম বা ঐশীবাণী সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজীগণ এ অভিমত পোষণ করে থাকেন যে, প্রচলিত সব ধর্মগ্রন্থেরই ভাল ভাল কথা আসলে কোন ঈশ্বরের বাণী নহে; প্রকৃতপক্ষে

ঐগুলো মানুষের চিন্তাধারাপ্রসূত। তাঁরা বলে থাকেন যে, যখনই কোন চিন্তাবিদ জ্ঞানী ব্যক্তি মানবগোষ্ঠির মঙ্গল কামনা করতে যেয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তন্ময় হয়ে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় উপনীত হন তখন মানবের মঙ্গলার্থে যেসব ভাল কথা তাঁর মনে উদয় হয় স্মৃতিপটে সেগুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যের কাছে প্রকাশ করেন এবং যেহেতু ধ্যানমগ্ন অবস্থাতে কথাগুলো মনে উদয় হয়েছিল সেজন্য এবং মানুষের মনে দৃঢ় আস্থা সৃষ্টির জন্য বলে থাকেন যে, এসব 'ঈশ্বরের বাণী' এবং ভক্তির আতিশয্যে শিষ্যবর্গও বাণীগুলোকে ইলহাম বা ঐশীবাণী হিসেবেই গ্রহণ করে।

সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কেও ব্রাহ্মসমাজীদের আকিদা অত্যন্ত ভঙ্গুর। আধুনিক দার্শনিকেরা যেরূপ চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, আকাশ ও নক্ষত্রমন্ডলীর সৃষ্টিকৌশল এবং যথাযথ নিয়মে নৈসর্গিক আবর্তন-বিবর্তনের কার্যক্রমের দিকে লক্ষ্য করে একজন 'সৃষ্টিকর্তা হওয়া উচিত' বা 'থাকা উচিত' বলে মেনে নিতে রাজী হন তদনুরূপ তারা কেবল মানবের বুদ্ধির মাধ্যমেই খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চান।

কিন্তু একজন সৃষ্টিকর্তা 'হওয়া উচিত' আর একজন সৃষ্টিকর্তা 'অবশ্যই আছেন' এ দু'টোর মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

অতএব ইহা অবধারিত সত্য যে, 'হওয়া উচিত' রূপ একটা অপরিপক্ক ধর্মবিশ্বাস দ্বারা মানুষ কাবেলে এতমিনান বা দ্বিধাহীনভাবে আস্থাশীল হতে পারে না। বরং ব্রাহ্মসমাজীদের এরূপ অপরিপক্ক বিশ্বাস মানুষকে ক্রমান্বয়ে নাস্তিকতার দিকেই ঠেলে দেয়।

বস্তুতঃপক্ষে, মৌলিক ঈমান তাই, যার ফলে মানুষ হাস্তিয়ে বারিতা'লা বা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে 'হওয়া উচিত' রূপ বিশ্বাসের মত ঈমানের একটি দুর্বলতম স্তর হতে 'অবশ্যই আছেন' রূপ সুদৃঢ় স্তরে পৌঁছে যেতে অর্থাৎ ঈমানের সুদৃঢ় মাকামে উপনীত হতে সক্ষম হয়। একমাত্র বুদ্ধি-আকলের মাধ্যমে ঈমানের সুদৃঢ় স্তরে পৌঁছা আদৌ সম্ভবপর নয়।

সুতরাং মানবসুলভ দুর্বলতা হেতু মানবজাতির জন্য এটা একান্তই আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদিগের সম্মুখে আল্লাহ্‌ই তাঁর স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ তুলে ধরেন। এতদুদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ প্রেরিত নবী-রসূলগণ যুগ যুগান্তর হতেই ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ জনসমক্ষে তুলে ধরে আসছেন। বস্তুতঃ 'হওয়া উচিত' হতে উদ্ভূত ধারণাটি একটি উদ্ভট কাল্পনিক মূর্তিস্বরূপ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) তাঁর রচিত কবিতায় বলেছেন ঃ

بن دیکھے کس طرح کسی مہ رخ پہ آئے دل۔
کیونکر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل۔
دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی۔
حسن و جمالِ یار کے آثار ہی سہی۔
—(درثمین۔ اردو)

অনুবাদ ঃ 'প্রেমাস্পদের সৌন্দর্যের সন্ধান ও দর্শনলাভ অথবা বাক্যালাপে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত কোন সত্যকার আশেকই কোন অবাস্তব কাল্পনিক প্রেমাস্পদের প্রতি আসক্ত হয়ে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করতে পারে না।'

ব্রাহ্মসমাজ অবশ্য খৃষ্টান ও আর্যসমাজীদের মত এমন কোন নিয়মতান্ত্রিক প্রচারমূলক মতবাদ নয় বটে, তবুও সুকৌশলে তারা নিজস্ব কোন অনুষ্ঠানাদিতে একাডেমিক আলোচনায় স্বীয় মতবাদের গুরুত্ব বাইরের লোকদেরকেও সম্বোধন করে ব্যক্ত করে থাকেন। এ কারণেই হযরত মির্যা সাহেবের সঙ্গে তাদের কোন প্রকার বহস-মোবাহাসা বা বিতর্ক হয়নি এবং রূহানী মোকবেলারও কোন সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) স্বীয় পুস্তকাদিতে যেভাবে চ্যালেঞ্জ করতে যেয়ে খৃষ্টান ও আর্যসমাজীগণকে সম্বোধন করছিলেন তদনুরূপ ব্রাহ্ম সমাজীগণকেও সমভাবেই সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্য হতে কেউ মির্যা সাহেবের মোকাবেলায় আসেনি।

যেসব পুস্তাকাদিতে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ব্রাহ্মসমাজের ভ্রান্ত আকিদাসমূহের খন্ডন করেছেন ওসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ (১) বারাহীনে আহমদীয়া তৃতীয় ও ৪র্থ খন্ড, (২) আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, (৩) বারাকাতোদ্দোয়া ও তাঁর মকতুবাত ইত্যাদি।

হযরত আকদস (আঃ) রচিত পুস্তকাদির মারফতে ব্যাপক প্রচারের ফলে ব্রাহ্মসমাজীদের অগ্রগতির পথে এক বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হল এবং সে যুগে যেভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকগণ দলে দলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হতে ছিলেন তা একেবারে স্তিমিত হয়ে গেল।

নিম্নে বর্ণিত বিশিষ্ট ব্রাহ্মসমাজী নেতৃস্থানীয় লোকদের উক্তি হতেই ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হবে যে, আহমদীয়া মতবাদ প্রচারের প্রতিক্রিয়ার করণে সে সময় ব্রাহ্ম সমাজীদের জন্য কীরূপ প্রতিকুল পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল ঃ

(১) রামদাস গৌড় নামক একজন প্রখ্যাত ব্রাহ্মসমাজী নেতা লিখেছেন ঃ

"রাজা রামমোহন রায়ের মহান ব্যক্তিত্বের ফলে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মত উন্নত দেশেও ইউনিটেরিয়ান চার্চস্বরূপ ধর্মকেন্দ্র সংস্থাপিত হল। তাই বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রচারের কারণে ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে অত্যন্ত কুপ্রভাব জন্মিল এবং ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাচার বশতঃ প্রভাবান্বিত হয়েছিল এমন ধরনের মুসলমানদের মধ্যে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিবর্গের প্রায় সকলেই পশ্চাদপদ হয়ে গেলেন।" – (হিন্দুত্ব (হিন্দী) পুস্তকের ৯৮২ পৃঃ)

(২) ব্রাহ্মসমাজের অপর একজন নেতা দেবেন্দ্র পাল মহাশয় লিখেছেন ঃ

"ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনটি এক মহা ঝটিকারূপে উত্থিত হল এবং দেখতে দেখতে শুধু ভারতেই নহে সুদূর ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিদেশেও এর শাখাসমূহ বিস্তার লাভ

করল। ভারতে যে শুধু হিন্দু ও শিখগণই এর প্রভাব গ্রহণ করলেন এমন নয়, বরং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হতেও এক বৃহৎ দল এতে যোগদান করেছিলেন। ঐ সময় প্রত্যহ শত শত মুসলমান ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করতে লাগলেন। দীক্ষা গ্রহণ কার্য আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে জানা গেল যে, বাংলার বড় বড় উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান পরিবার ব্রাহ্মসমাজের মতবাদটিকে শুধু সঠিক বলেই অভিমত পোষণ করতেন না বরং দস্তুরমত নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজের সদস্যভুক্তও হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সেসময়েই মুসলমানদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হিন্দু ও খৃষ্টানগণের বিরুদ্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করেন; এবং তাদেরকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজের কোন বিদ্বান ব্যক্তিই এ আহ্বানের প্রতি মনোনিবেশ করেননি, ফলে যে সকল মুসলমান ঐ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তারা শুধু যে সরেই পড়লেন তা নয়, বরং যে সকল মুসলমান ব্রাহ্মসমাজে রীতিমত প্রবেশই করেছিলেন তারা ক্রমশঃ ইহাকে পরিত্যাগ করলেন।

– (কৌমুদী [হিন্দু পত্র])

(কলিকাতা হতে প্রকাশিত ১৯২০ সনের আগষ্ট সংখ্যা)

ত্রিত্ববাদিতা ও হযরত আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ)

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন দিল্লীর সর্বশেষ মোগল সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বকে কন্টকমুক্ত করা হয় তখন ইংরেজগণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাদের রাজ্য বিস্তার কার্যক্রমকে আরও অধিকতর নিষ্কন্টক করার জন্য উত্তম কোন পদক্ষেপ নিতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে তারা [সলমান অধিবাসীগণের মধ্যে তাদের ত্রিত্ববাদি মতবাদের প্রচারকে সম্প্রসারিত করলেন। কারণ, তারা হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে লাগলেন যে, মুসলমানদেরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ না হলে বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি মোটেই বিচিত্র নয়।

ঐ যামানার পরাজিত নিরীহ নিঃসহায় মুসলমানদেরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য লন্ডন শহরে যেসব বড় বড় পরিকল্পনা হচ্ছিল তদানীন্তন বৃটিশ পার্লামেন্টের একজন স্বনামধন্য সদস্য মিষ্টার এন্‌জেলস্ সাহেবের একটি বক্তৃতা পাঠ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মিষ্টার এন্‌জেলস্ তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ "খোদা আমাদিগকে সুদিন দিয়েছেন এবং ভারত সাম্রাজ্যকে ইংল্যান্ডের অধীন করে দিয়েছেন যেন যীশুখৃষ্টের বিজয় পতাকা ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উড্ডীন হয়। ভারতবর্ষকে খৃষ্টান করার মহান কার্যকে পূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা কর্তব্য। তাতে কোন প্রকার শৈথিল্য করা উচিত নয়।"

ঐ সময়েই ১৮৬২ সনে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামষ্টিন এবং ভারত সচিব মিস্টার চার্লস উডের নিকট ভারত হতে মিশনারিগণের একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত

হন। সম্মেলনে পার্লামেন্টের 'লর্ড সভা' এবং 'সাধারণ সভা' উভয় কক্ষের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তদানীন্তন ইংল্যান্ডের প্রধান ধর্মযাজক আর্চবিশপ অব ক্যান্টারব্যারি ভারতবর্ষ হতে আগত মিশনারি প্রতিনিধিবর্গের পরিচয় করে দিয়েছিলেন। ভারত সচিব চার্লসউড তখন ঐ প্রতিনিধিগণকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

"আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, দীক্ষা গ্রহণকারী ভারতবর্ষের প্রত্যেক নব্য খৃষ্টানই ইংল্যান্ডের সহিত এক নতুন একতাসূত্রে আবদ্ধ হবে এবং আমদের সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করার জন্য তা হবে এক নতুন গ্রান্টিস্বরূপ।।

– (উলামায়ে হক আওর উনকে মুজাহেদানা কারনামাঃ ২৫-২৬পৃঃ)

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি হাসেল করার জন্যই সমগ্র উপমহাদেশে তারা ত্রিত্ববাদ প্রচারের এক তুফান বহায়ে ছিল।

গত শতাব্দীর নির্যাতিত-নিষ্পেষিত মুসলমানদেরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য তাদের মারাত্মক প্রোগ্রামসমূহ আলোচনা করলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হবে যে, ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। মিষ্টার জন হেনরী বারোজ নামক একজন প্রখ্যাত ধর্মযাজকের একটি বক্তৃতায় যা 'কৃশ্চিয়ানিটি দি ওয়ারল্ড ওয়াইড রিলিজিয়ন' পুস্তকের ১৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে তিনি খৃষ্টধর্ম প্রচার সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ

"ক্রুশীয় মতবাদের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ একদিকে যেমন লেবানন, অন্যদিকে পারস্য পর্বতমালা এবং বসফরাসের স্বচ্ছ জলরাশিকে আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে কায়রো, দামেস্ক এবং তেহরান প্রভু যীশুর সেবকবৃন্দ দ্বারা পূর্ণ হবে। এমনকি এ ক্রুশীয় মতবাদ নির্জন আরবের নীরবতা ভংগ করে যীশুখৃষ্টের ভক্তবৃন্দের দ্বারা মক্কা নগরীর খাস কাবাগৃহে প্রবেশ করবে এবং কাবাগৃহ হতে ক্রুশীয় ধর্মের অনন্ত জীবনের বাণী উচ্চারিত হবে।"

খৃষ্টান মিশনারিগণের প্রচারাভিযানের মোকাবেলায় এ দেশের মুসলমানরা ছিল তখন নিতান্ত হীনবল। প্রতিযোগিতা করার মত তাদের যোগ্যতার অভাব লক্ষ্য করে মিশনারিদের লম্ফ-ঝম্ফ ক্রমশঃ চরম আকার ধারণ করল। সে যুগে (ঊনবিংশ শতাব্দীতে) শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্য শোচনীয়ভাবে অনগ্রসর মুসলমান এবং সিডিউল্ড কাষ্টের অন্তর্ভুক্ত দরিদ্র শ্রেণীর হিন্দুদের গন্ডিতে প্রবেশ করে জনগণকে নেটিভ খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত করে নেওয়ার জন্য মিশনারিরা উঠে পড়ে লাগলেন। আর এ সময়ে ধর্মীয় যুক্তি নিয়ে তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার মত এদেশে কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি বা সংস্থার কোন অস্তিত্বও ছিল না। খৃষ্টান মিশনারিগণ অগণিত প্রচারপত্র বিলাতে লাগলেন। বাইবেলকে দেশীয় ভাষাসমূহে অনুবাদ করতে লাগলেন। ঐ সময়েই তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত শ্রীপুরের পাদ্রী উইলিয়াম কেরী সাহেব সর্বপ্রথম তদানীন্তন প্রচলিত বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন এবং ব্যাপক প্রচারাভিযানে

মত্ত হয়েছিলেন। স্থানে স্থানে মন্ডলী গঠন করে মিশনারিগণ মিশন হাউজ, মিশন স্কুল, মিশন হাসপাতাল, মিশন লাইব্রেরী স্থাপন করে প্রচারের কাজকে সুদৃঢ় করে নিলেন। তাদের এসব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কারণে সে সময়ে ধর্মান্তরিত হয়ে ত্রিত্ববাদি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল।

বস্তুতঃ ঐ সময়কার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি দিলে শরীর শিউরে উঠবে যে, মুসলমানদের রাজ্যহারা, জায়গীর জমিদারিহারা, এমন কি তৌহীদ বিপন্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও সমসাময়িক মুষ্টিমেয় ইসলামী চিন্তবিদদের হা-হুতাশ ছাড়া ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার মত কোন যোগ্যতা বা সুযোগ সুবিধাও ছিল না। ধূর্ত পাদ্রীদের বিভিন্ন ধরনের সাহায্য, চিকিৎসা এবং অনুদানে আকৃষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে ১৩ লক্ষ মুসলমান তৌহীদ পরিত্যাগ করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এসব নেটিভ খৃষ্টানদের মধ্যে কিছু কিছু আলেম এবং বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান এমনকি আহলে রসূলও শামিল ছিলেন। সে যুগের মোল্লা-মৌলভী আর গদ্দিনশীন পীর সাহেবান চেলাচামুন্ডদের থেকে 'টুপাইস' সংগ্রহের কাজেই লিপ্ত থাকতেন, আর ফেরকার আলেম অপর ফেরকাভুক্ত মুসলমানকে কাফেরের ফতওয়া দেওয়া, বিবি তালাকের মসলা-মাসায়েলের জটিলতা সৃষ্টি করে 'হিল্লা শরার' দরবারেই অধিক মশগুল করতেন। ইসলামের উপর ত্রিত্ববাদিতার এ নগ্ন হামলার মোকাবেলা করার জন্য মোটেই তাদের কোন গাত্রদাহ ছিল না।

এ শোচনীয় অবস্থায় মিশনারীদের জঘন্য শিরকি ত্রিত্ববাদিতার মোকাবেলায় ইসলাম তথা তৌহীদের সাদাকাত নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন একমাত্র একজনই–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তিনি তাঁর বক্তৃতায়, কথোপকথনে এবং বিভিন্ন পুস্তক-পেম্ফেলেট প্রকাশনার মাধ্যমে খৃষ্টান মিশনারিদেরকে ইসলামের মোকাবেলায়, তাদের ত্রিত্ববাদকে যাচাই করার এবং এ ধরনের 'তিন খোদার যথার্থতা' নিরূপণের জন্য মোনাযেরার আহ্বান করলেন। এমনকি কোন কোন পাদ্রী সাহেবানকে মোবাহালার জন্যও আহ্বান করলেন।

অবশেষে ১৯০০ সনে পাঞ্জাবের খৃষ্টানদের তদানীন্তন লর্ড বিশপ রেভারেন্ড জর্জ লেফ্রয় সাহেবকে এক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'এতমামে হুজ্জতের' জন্য একটি লিখিত চ্যালেঞ্জ দিলেন।

"এদেশে আপনি খৃষ্টানদের একজন উচ্চপদস্থ বড় নেতা। সুতরাং আপনার জন্য অবশ্য কর্তব্য যে, যারা সত্যান্বেষী তাদেরকে সন্দেহমুক্ত করার জন্য আপনার ত্রিত্ববাদি মযহাবের সত্যতা যাচাই করার জন্য মোকাবেলায় বহস বা তর্কযুদ্ধে আসা। যেহেতু আপনি আহমদীয়া জামাত ব্যতিরেকে অন্য মুসলমানদেরকে মুবাহাসার জন্য আহ্বান করেছেন এবং চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন ঠিক সেভাবে আমিও আপনার ঈসু-মসীহের কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি আমার এ চ্যালেঞ্জ অবশ্যই কবুল করবেন যেন ইসলাম ও মসীহতের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়।"-- ('রিভিউ অফ রিলিজিয়ন', ১৯০০ সন)

কিন্ত পাঞ্জাবের লর্ডবিশপ লেফ্রাই সাহেব হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর উপরোক্ত চ্যালেঞ্জকে টালাবাহানা করে অগ্রাহ্য করলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ত্রিত্ববাদের মূল ভিত্তি হচ্ছেঃ

(১) উলুহিয়তে মসীহ্, অর্থাৎ মসীহ্র খোদা হওয়া এবং খোদার জাতপুত্র বলে মেনে নেওয়া।

(২) প্রায়শ্চিত্তবাদে বিশ্বাস স্থাপন।

(৩) মসীহ্ সমগ্র মানবজাতির পাপের জন্য কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে সাময়িকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তিন দিন পর পুনর্জীবিত হয়ে আকাশে আরোহণ করেন। তিনি খোদার ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন এবং শেষ জামানাতে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য সশরীরে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন।

এ তিনটি আকিদার মধ্যে মূল আকিদাই হল কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্তবাদ।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ পবিত্র কোরআন, হাদীস, বাইবেল, প্রাচীন গ্রন্থাদিও ইতিহাস দ্বারা এবং আকলী ও নকলীভাবে অকাট্য যুক্তিসমূহের মাধ্যমে যখন প্রমাণ করলেন যে, যীশুখৃষ্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন নি, সশরীরে আকাশেও আরোহণ করেন নি; বরং তিনি ক্রুশের ঘটনার পরও জীবিত ছিলেন এবং ইহুদী সর্দারগণ হতে আত্মগোপন করে অতি সংগোপনে শিষ্যদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে প্যালেষ্টাইন হতে হিজরত করেছিলেন (যোহন-২০ঃ২৭-২৯)। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে করতে সর্বশেষে তিনি কাশ্মীরে পৌছে বনী ইস্রাঈল জাতির অবশিষ্ট গোত্রের লোকদেরকে হেদায়াতের কাজে নিমগ্ন হয়েছিলেন। অতঃপর এক দীর্ঘ স্বাভাবিক জীবন যাপন সমাপনান্তে ১২০ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন। শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লা ঈসা (আঃ)-এর সমাধি বিদ্যমান। (দ্রঃ মসীহ্ হিন্দুস্থান মেঁ)

হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) জগদ্বাসীকে সম্বোধন করে ঘোষণা করলেনঃ ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ঘটনা প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে ক্রুশবাদ তথা ত্রিত্ববাদ কখনও উৎপাটিত হবে না। এমতাবস্থায় কোরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁকে (ঈসা মসীহ্কে) জীবিত মনে করে কি লাভ? তাঁকে মরতে দাও যেন ইসলাম জিন্দা হয়।"

– (কিশ্তিয়ে নূহ-বঙ্গানুবাদঃ ২৬ পৃঃ)

এরূপে তিনি তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক 'এযালায়ে আওহামের' ৫৬০ পৃষ্ঠায় বিশ্ব মুসলমানদেরকে সম্বোধন কর বলেছেন, "তোমরা নিশ্চিন্তভাবে জেনে রাখ, যে পর্যন্ত তাদের (খৃষ্টানদের) খোদা অর্থাৎ ঈসা (আঃ) মৃত বলে প্রমাণিত না হয় তাদের ধর্মও মরতে পারে না।"----- "কেননা, তাদের ধর্মের মূল ভিত্তিই হচ্ছে মসীহ ইবনে মরিয়ম-এর সশরীরে আকাশে জীবিত থাকা। তাদের এ স্বকপোল কল্পিত ভিত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও। অতঃপর লক্ষ্য করে দেখ খৃষ্টধর্মের ঠাঁই কোথায়?"

খৃষ্টানদের সঙ্গে রূহানী মোকাবেলা

বুখারী শরীফের হাদীসে আছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ অর্থাৎ মুহাম্মদী মসীহের প্রধান ও অবশ্য কর্তব্য হবে 'ইয়াকসারুস্‌সালিবা' অথাৎ ক্রশ ধ্বংস করা। প্রখ্যাত হাদীসবেত্তাগণ ক্রুশ ধ্বংসের এ ব্যাখ্যাই করেছেন যে,মসীহ মাওউদ এসে যুক্তি-প্রমাণ ও দলিলের মাধ্যমে ক্রুশীয় ধর্মের অর্থাৎ খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের বাতুলতা প্রমাণ করবেন।

বুখারী শরীফের শরাহ্ লেখক প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা আয়নী (রাহঃ)-ও হাদীসটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। –(ফতহুল বারীঃ ৫ম জিলদ)

মসীহ মাওউদ আবির্ভূত হয়ে ক্রুশ ধ্বংস করবেন বলতে এখানে ধাতু নির্মিত ক্রুশসমূহকে বিনষ্ট করা বুঝায় না। আর এ ধরনের কোন পদক্ষেপ নেওয়াটা যে বিজ্ঞজনোচিত নহে, তা-ও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া কোরআন শরীফের পরিভাষায় হালাক বলতে গায়ের জোরে অস্ত্রের মাধ্যমে আক্রমণ দ্বারা ধ্বংস করাকেই বুঝায় না। যেমন, কোরআন শরীফে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

অনুবাদঃ যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলিল প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলিল প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করিয়াছে। – (৮ঃ৪৩)

সুতরাং, কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) পবিত্র কোরআন, হাদীস এবং বাইবেলের দলিল পেশ করেই বর্তমান খৃষ্টধর্মের ভ্রান্ত ত্রিত্ববাদকে বাতিল প্রমাণিত করে সমূলে উৎপাটিত করেছেন। কেননা, খৃষ্টানগণ তিন খোদার উপরে বিশ্বাস স্থাপনের সমর্থনে তৌরাত বা ইঞ্জিল হতে কোন দলিল পেশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

অতঃপর একটি চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌছার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করে খৃষ্টানদের জন্য আরও একটি সহজ পন্থার আহ্বান জানিয়ে হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এ-ও ঘোষণা করলেনঃ "ধর্মীয় ব্যাপারে খৃষ্টধর্ম মতাবলম্বী ভদ্র মহোদয়গণের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌছবার জন্য একমাত্র সহজ পন্থা হচ্ছে, জিন্দা ও কামেল খোদার উপর আমি বিশ্বাস রাখি ইসলামের সত্যতার দলিল হিসেবে কোন একটা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য খোদার নিকট আমি প্রার্থনা করি এবং তদনুরূপ খৃষ্টান ভ্রাতাগণও যারা প্রভু যীশুকে একমাত্র 'হাইয়্যুন কাইয়্যুম' বলে বিশ্বাস করেন, কোন নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য তাঁর নিকট আকুল প্রার্থনা করুন। এখন আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে ঘোষণা করছি যে, এরূপ প্রার্থনার পর যদি খৃষ্টান ভাইদের মোকাবেলায় আমি কোন নিদর্শন প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হই, তবে আমি সব রকম শাস্তি এবং লাঞ্ছনা সহ্য করতে প্রস্তুত আছি; উপরন্তু প্রভু যীশুর নিকট কথিত প্রার্থনার ফলশ্রুতিতে আপনাদের পক্ষ থেকে যদি কোন নির্দশন প্রদর্শিত হয়,তবে এমতাবস্থায়ও আমি সব রকমের শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত রইলাম।" – (জঙ্গে মোকাদ্দাসঃ ১৮৯৩ সন)

আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে ইহাও জ্ঞাত করেছেন ঃ "রূহানী বরকতসমূহ এবং ঐশী সাহায্যাদি সম্পর্কে যে কোন রকম মোকাবেলায় আল্লাহ্ আমার সমর্থনকারী হবেন এবং আমাকে আল্লাহ্ ইহাও এরশাদ করেছেন যে, তুমি অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।"

– (জঙ্গে মোকাদ্দাসঃ ১৩৭-৩৮পৃঃ)

কিন্তু হযরত আকদস (আঃ)-এর পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা সত্ত্বেও কোন খৃষ্টানই এ মোবাহালাতে অগ্রসর হতে সাহস পাননি।

খৃষ্টানদের ধর্মীয় আকিদাকে বাতেল সাব্যস্ত করতে এবং তাদের মোকাবেলায় ইসলামই যে জগতের বুকে একমাত্র জিন্দা ধর্ম তা প্রমাণ করতে যেয়ে হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর জীবনে বহু জাজ্বল্যমান নিদর্শন প্রদর্শনের সুযোগ ঘটেছিল।

খৃষ্টানদের তদানীন্তন পাদ্রী বিশপদের সঙ্গে সাধারণতঃ (১) ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম দু'টির মধ্যে কোন্‌টি সত্য, জিন্দা এবং কামেল মযহাব; (২) কোন ধর্ম দ্বারা প্রকৃত নাজাত হাসেল হতে পারে, এই দু'টি বিষয়ের উপরেই হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর মোবাহাসা চলত।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে। ১৮৯৩ সনের ২২ শে মে তারিখ হতে শুরু করে ৫ই জুন পর্যন্ত খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের সঙ্গে হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর একটি লিখিত মোনাযেরা সুসম্পন্ন হয়। এ ঐতিহাসিক মোনাযেরা অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এবং খৃষ্টানদের পক্ষ হতে প্রখ্যাত পাদ্রী মিস্টার আবদুল্লাহ্ আথম ও ডক্টর হেনরী মার্টিন ক্লার্ক।

১৫ দিন স্থায়ী এ মোনাযেরার বিবরণ 'জঙ্গে মোকাদ্দাস' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বহসের শেষ দিবসে সর্বশেষ বক্তব্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ঘোষণা করেনঃ "আল্লাহ্‌তা'লা ইলহামের মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এ মোনাযেরার মধ্যে উভয়পক্ষের যে পক্ষ জেনে শুনে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে ও সত্য খোদাকে পরিত্যাগ করেছে এবং অসহায় মানুষকে খোদা বানিয়েছে,এ বহসের ১৫ দিনের প্রত্যেকটি দিনকে একমাস হিসেবে ধরে নিলে ১৫ মাসের মধ্যেই তাদেরকে হাবিয়া দোযখে নিপতিত হতে হবে; এবং সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। প্রকাশ থাকে যে, যদি সে সত্যের দিকে ফিরে না আসে।"

– (জঙ্গে মোকাদ্দাসঃ ১৮৯৩ সন)

এ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করার সঙ্গে তিনি এ-ও উল্লেখ করলেন যে, পাদ্রী আবদুল্লাহ্ আথম সাহেব তাঁর রচিত 'আন্দুরুনায়ে বাইবেল' নামক পুস্তকে রসূলে করীম (সাঃ) সম্পর্কে যে 'দাজ্জাল' শব্দটির ব্যবহার করেছেন; আমার এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলে পর ইহাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, সেই হুযুর (সাঃ) খোদাতা'লার প্রেরিত এবং রসূল ছিলেন। তিনি আরও বললেনঃ যেহেতু খৃষ্টান পাদ্রী ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথম সাহেব স্বয়ং একজন মিথ্যা আকিদার অনুসারী থাকা অবস্থায় রসূলে করীম (সাঃ)-কে 'দাজ্জাল'

আখ্যা দিয়েছেন এবং আমার উপর ও ইসলামের উপর হাসি-বিদ্রূপ করেছেন, এমতাবস্থায় যদি সে অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে সত্যের দিকে রুজু না করে। তবে শাস্তিস্বরূপ তিনি ১৫ মাসের মধ্যেই হাবিয়ায় নিক্ষিপ্ত হবেন অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবেন।

হযরত আকদস (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর বক্তব্য শুনামাত্রই সভাস্থলে ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথমের চেহারা বিবর্ণ ও চক্ষু সাদা হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে জিহ্বা বের করে ভীত-সন্ত্রস্তাবস্থায় কানে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, "আমি আঁ হযরত (সাঃ)-কে কখনও দাজ্জাল বলিনি। অথচ তাঁরই রচিত পুস্তক 'আন্দুরুনায়ে বাইবেলে' তিনি 'দাজ্জাল' শব্দের ব্যবহার করেছেন। যাহোক, সে সময়ে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সত্যের দিকে রুজু হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করলেন। *

অমৃতসরের ঐতিহাসিক মোনাযেরাতে এসব কথোপকথনের পর হতে ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথমের জীবনে এক শোচনীয় অস্বস্তির লক্ষণ প্রকাশ হতে লাগল। তিনি এতই ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, রাত্রিতে তার নিদ্রা আসত না। নিদ্রার জন্য প্রায়ই তাকে ঘুমের ঔষধ সেবন করতে হত। অতঃপর তিনি এমনইভাবে তার মন পরিবর্তন করে ফেললেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে লেকচার, বক্তৃতা এবং পুস্তকাদির প্রকাশনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন। ঘুমন্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখে তিনি প্রায়ই ভয়ে চিৎকার করে উঠতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি এরূপ ভয়াবহ স্বপ্নও দেখতেন যে, উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে কে যেন তাকে হত্যা করতে উদ্যত। সুতরাং সন্ত্রস্তাবস্থায় নিদ্রা হতে জেগে যেতেন।

আথম সাহেবের এ ধরনের হাল-হকিকত লক্ষ্য করে অন্যান্য ইউরোপীয়ান পাদ্রী সাহেবান ভেবে দেখলেন যে, আথম সাহেবের এসব ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়ে কিনা, মুসলমানদের মহলে আবার জানাজানি হয়ে যায় কিনা; এরূপ ভেবে আবদুল্লাহ সাহেবের একজন মুসলমান বাবুর্চিকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করে দেন এবং তদস্থলে একজন খৃষ্টান বাবুর্চিকে নিয়োগ করলেন। ভয়ভীতি কমানোর বা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে আথম সাহেবকে তারা স্থানান্তরিত করতে লাগলেন এবং কখনও লুধিয়ানা মিশনে, কখনও ফিরোজপুর মিশনে বদলী করতে লাগলেন। এতদ্সত্ত্বেও তাঁর ভয়-ভীতির কোনই পরিবর্তন ঘটল না। *

ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথমের দৈনন্দিন জীবনের এ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেই ১৫ মাস অতিবাহিত হল। কিন্তু এ ১৫ মাসের ভিতরে তিনি মরেননি বলে পাদ্রীগণ উল্লাসে ফেটে পড়লেন এবং এরূপ সামলোচনায় মেতে উঠলেন যে, ১৫ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অথচ আথম জীবিত আছেন। সুতরাং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

---

* টীকাঃ মির্যা সাহেব (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি ব্যক্ত করার সময় সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থলেই ভীত-সন্ত্রস্তাবস্থায় ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথমের সহসা এহেন উক্তি প্রকারান্তরে হুযুর (সাঃ)-এর সম্পর্কে যে বেয়াদবী মন্তব্য করেছিলেন,তার প্রত্যাহারই বুঝায়।

* টীকাঃ বিস্তারিত বিবরণের জন্য হযরত আকদস রচিত 'আনওয়ারুল ইসলাম' এবং 'আঞ্জামে আথম' দ্রষ্টব্য।

মির্যা সাহেব (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর 'শেষ বাক্যটির' দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। এতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল "প্রকাশ থাকে, যদি সে (আবদুল্লাহ্ আথম) সত্যের দিকে ফিরে না আসে।" এ কথাটি উচ্চারণের সাথে সাথে আথম সাহেবের আমূল মানসিক পরিবর্তন হয় এবং ইসলাম ও আঁ হযরত (সাঃ)-কে গালিগালাজ দেয়া হতে বিরত হয়ে যান। সুতরাং, ভবিষ্যদ্বাণীটি যে শর্তমূলক ইহা পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও পাদ্রীগণ তাদের একগুঁয়েমী সমালোচনাই অব্যাহত রাখলেন। অতঃপর ঘটনাটির নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করুন ঃ

(ক) পাদ্রীগণের এসব বিরামহীন হৈ-হল্লা ও সমালোচনার খবর পেয়ে হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) প্রথম দফা এক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ মর্মে ঘোষণা করেনঃ পাদ্রী ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথম স্বয়ং হলফ করে ঘোষণা করুন যে, ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পর ঐ ১৫ মাস সময়ের ভিতরে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হননি। এবং আথম সাহেব এরূপ ঘোষণাটি প্রকাশ করা মাত্রই এক সহস্র টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এবং এ টাকা (কোন অবস্থাতেই) ফেরতও নেওয়া হবে না। এমতাবস্থায় যদি তিনি এক বৎসরের ভিতরেই 'মারা না যান' তবে আমি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব। কিন্তু ঘোষণা প্রকাশ করার পর আবদুল্লাহ্ আথম নীরব ভূমিকা পালন করলেন। তথাপি পাদ্রীগণ সমালোচনামুখরই রয়ে গেলেন এবং একই কথা পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন যে, মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

(খ) অতঃপর মির্যা সাহেব (আঃ) দ্বিতীয়বার বিজ্ঞাপন দিয়ে কথিত হলফটি ঘোষণা করা জন্য আহ্বান জানালেন এবং এ-ও ঘোষণা করেন যে, হলফ করার সঙ্গে সঙ্গে আথম সাহেবকে দুই সহস্র টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ।

কিন্তু এবারও আথম সাহেব নিশ্চুপ রইলেন এবং পাদ্রীগণ পূর্ববৎ হৈ-হল্লা অব্যাহত রাখলেন।

(গ) অতঃপর মির্যা সাহেব (আঃ) তৃতীয়বার আরও একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঐ ঘোষণাটিরই পুনরাবৃত্তি করলেন এবং টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে পুনরায় ঘোষণা করলেন যে, এখন হলফ করা মাত্র তিন সহস্র টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু এবারও ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথম নীরব।

(ঘ) চতুর্থবার আরও একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করে ঘোষণা করলেনঃ ঐরূপ হলফের সঙ্গে সঙ্গে তাকে চার সহস্র টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এতদ্সঙ্গে মির্যা সাহেব এরূপ জোরালো ঘোষণাও করে দিলেনঃ "অতঃপর এর সঙ্গে কোন শর্ত নেই এবং কসমের পর এক বৎসরের ভিতরে অবশ্য-অবশ্যই তুমি মৃত্যুবরণ করবে। কোন কল্পিত খোদা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।"

এরূপ পুনঃ পুনঃ আহ্বানে পাদ্রী আথমের পক্ষ হতে কোন সাড়া না পেয়ে ১৮৯৫ সনের ৩০ শে ডিসেম্বর তারিখে এ মর্মে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) একটি সর্বশেষ ইশ্তেহার ঘোষণা করলেন, "একটি সম্মেলন ডেকে সমবেত সকলের সামনে এরূপ

একটি হলফ খেয়ে বলতে হবেঃ "(১) মির্যা সাহেবের পেশগুয়ী তথা ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হইনি; (২) ইসলাম ধর্মের সাদাকাতের কোন প্রভাব আমার অন্তরে রেখাপাত করেনি; (৩) এবং আমি রুজু করিনি অর্থাৎ ইসলাম ও ইসলামের নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তৎপরতা বন্ধ করিনি। আরও ঘোষণা করলেনঃ তিনবার এ কথিত কসমটি খেতে হবে এবং প্রত্যেক বারই হলফটি ঘোষণার সাথে সাথে আমি 'আমীন' বলব এবং এভাবে হলফকার্য সুসম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে চার সহস্র টাকা হাতে তুলে দেব; এবং কসম খাওয়ার তারিখ হতে এক বৎসরকাল পর্যন্ত যদি তিনি জীবিত থাকেন তাহলে এ চার সহস্র টাকাও ফেরৎ নেওয়া হবে না। এমতাবস্থায় আমাকে যে কোন শাস্তি দেওয়া হবে তা-ই আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। এ কারণে যদি আমাকে তরবারি দ্বারা খন্ড-বিখন্ডও করে দেওয়া হয় তবুও আমার কোন আপত্তি থাকবে না।"

–(ইশ্‌তেহার -৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ সন)

কিন্তু শেষবারও পাদ্রী ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথম নীরব ভূমিকাই পালন করলেন এবং অন্য সব পাদ্রী সাহেবানও পূর্ববৎ ঐ একই সমালোচনামত্ত হয়ে উল্লাসরতই রয়ে গেলেন; এবং এ কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি; পূর্ণ হয়নি।

অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লার কুদরতের নিশান লক্ষ্য করুন। হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর এ চূড়ান্ত ঘোষণাটির পর ৭ মাসের ভিতরেই ফিরোজপুর মিশনে থাকাকালীন ১৮৯৬ সনের ২৭শে জুলাই তারিখে পাদ্রী ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথম এ ধরাধাম হতে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন।

"فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ"

অমৃতসরের ঐতিহাসিক মোনাযেরাতে একটি আশ্চর্য ঘটনা

অমৃতসরে পাদ্রী আবদুল্লাহ্ আথম, ডাক্তার হেনরী মার্টিন ক্লার্ক প্রমুখ প্রখ্যাত খৃষ্টান মিশনারিগণের সঙ্গে দীর্ঘ ১৫ দিন যাবত হযরত মির্যা সাহেবের বিতর্ক অনুষ্ঠানে (মোবাহাসাতে) বিতর্ক চলাকালেই খৃষ্টানগণ একদিন একজন অন্ধ, একজন বধির ও একজন খঞ্জ ব্যক্তিকে সংগোপনে হাজির করে মোবাহাসার স্থানেই এক কোণে লুকিয়ে রাখলেন। অতঃপর খৃষ্টান মিশনারীগণের পক্ষ হতে বক্তব্য পেশের পালা আসা মাত্রই হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে সম্বোধন করে তারা বললেনঃ "আপনিত মসীহ হয়েছেন বলে দাবী করেন। আমাদের মসীহ (ঈসা ইবনে মরিয়ম)

এমনই কামেল ছিলেন যে, তিনি বহু অন্ধ, বধির ও খঞ্জকে স্পর্শ করে সুস্থ করে দিয়েছেন। এখন এ নিন, এখানে অন্ধ, বধির ও খঞ্জ ব্যক্তিগণকে আপনার সম্মুখে হাজির করে দিলাম। আমাদের প্রভু যীশুর ন্যায় এদেরকে স্পর্শ করে আরোগ্য করুন।"

প্রশ্নটি উত্থাপন মাত্র বিতর্ক সভাতে উপস্থিত উভয়পক্ষের শ্রোতৃবর্গ কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে হযরত আকদস (আঃ)-এর দিকে মনোনিবেশ করলেন। প্রত্যুত্তরে হযরত আকদস (আঃ) লিখিত বক্তব্যে বললেনঃ "আমি একথা বিশ্বাস করি না যে, এ প্রকার স্পর্শ দ্বারা মসীহ কোন অন্ধ, বধির বা খঞ্জদিগকে আরোগ্য করতেন। এজন্য এরূপ কোন দাবী আমার নিকট পেশ করার কোনই যুক্তি নেই। পক্ষান্তরে আপনারা এ-ও বিশ্বাস করেন, যে ব্যক্তির একটি সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে, সে ঐ সমুদয় নিদর্শনই প্রদর্শন করতে পারবে যা স্বয়ং মসীহ প্রদর্শন করেছিলেন। * সুতরাং, এখন আমি আপনাদের নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ যে, আপনারা অন্ধ, বধির এবং খঞ্জদিগকে তালাশ করা হতে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আপনাদের এ উপহার এখন আপনাদেরই সম্মুখে রাখা হল। এ অন্ধ, বধির ও খঞ্জ লোকগুলো হাজির আছে। যদি আপনাদের মধ্যে (আপনাদের বাইবেল মোতাবেক) এক সরিষার সমান ঈমানও থেকে থাকে, তবে আপনাদের মসীহের রীতি অনুসারে এদেরকে আপনারা আরোগ্য করুন।"

হযরত আকদাস (আঃ)–এর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রীদের হুঁস উড়ে গেল ও তাড়াহুড়া করে ঐ বধির, অন্ধ খঞ্জগুলোকে সেখান থেকে সরিয়ে বাইরে নিয়ে গেলেন।

হেনরী মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমা

১৮৯৩ সনে অমৃতসরের 'মোনাযেরায় শোচনীয় পরাজয়ের পরও পাদ্রীগণ পূর্ববৎ চেঁচামেচি অব্যাহত রাখলেন। পাদ্রীগণের এসব ঝগড়াঝাটি পরিহার করে একটি সমাধানযোগ্য সহজ পন্থা ও উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে মির্যা সাহেব বললেনঃ

"ইসলাম বনাম ত্রিত্ববাদ বহসটি আপনাদের সঙ্গে সীমা অতিক্রম করে গেছে এখন চলুন সমস্যাটি স্বয়ং খোদাতা'লা কর্তৃক মীমাংসা হয়ে যাক। আমি এ সম্পর্কে ঘোষণা করছি যে, যদি খোদাতা'লার ফয়সালা আমার সমর্থনে উপস্থিত না হয়,তবে আমি আমার দশ হাজার টাকা মূল্যের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি খৃষ্টানদেরকে দেব; এবং জামানতস্বরূপ তিন সহস্র টাকা অগ্রিম জমা দিতে প্রস্তুত আছি।"

অতঃপর বিশেষ করে এরূপ রূহানী মোকাবেলার সম্মুখীন হওয়ার জন্য উপমহাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত পাদ্রীকে নামে নামে আহ্বান জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

"আমি ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করছি যে, এ রূহানী মোকাবেলার জন্য ডাক্তার মার্টিন ক্লার্ক সাহেবকে সমগ্র খৃষ্টান ভ্রাতাগণের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করা

* টীকা ঃ মথি–১৭ঃ২০ ও যোহন–১৪ঃ১২

হোক। কারণ, তিনি একজন বলিষ্ঠ যুবক; উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী; তদুপরি তিনি ডাক্তার বিধায় স্বীয় আয়ু বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন সম্পর্কে উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন। সুতরাং, ডাক্তার মার্টিন ক্লার্ক সাহেব আমার এ আবেদন অবশ্যই সন্তুষ্ট চিত্তে মঞ্জুর করবেন। যদি তিনি পলায়ন করেন, তবে পাদ্রী ইমামুদ্দীন সাহেব এ মোকাবেলার জন্য যোগ্য পাত্র। -----তিনিও যদি পলায়ন করেন পাদ্রী হুসসামুদ্দীন বা পাদ্রী সফদর আলী বা পাদ্রী ঠাকুরদাস মহাশয় বা পাদ্রী টমাস হাওয়েল সাহেব---- সর্বশেষ পাদ্রী ফতেহ মসীহ্ কিংবা অন্য যে কোন পাদ্রী সাহেব এরূপ ময়দানে উপস্থিত হবেন।" অতঃপর তিনি ইহাও ঘোষণা করলেনঃ "আমার রচিত এ পুস্তিকাটি (আঞ্জামে আথম) প্রকাশের দুই মাসের মধ্যে যদি কেউ অগ্রসর না হয় এবং শুধু শয়তানী ওজর আপত্তির টালবাহানা করে তবে পাঞ্জাব ও সমগ্র উপমহাদেশের সমগ্র পাদ্রীদের উপর মিথ্যবাদী হওয়ার মোহর পড়বে। অতঃপর তাদের দিক হতে খোদাতা'লা সমগ্র অসত্যসমূহের মূল উৎপাটন করবেন, স্মরণ রেখ, নিশ্চয়ই খোদা অসত্যের মূল উৎপাটন করবেন। কারণ নির্ধারিত সময় সমুপস্থিত।"

১। (আঞ্জামে আথম, এবং)

২। (ইশ্‌তেহার -১৪ই ডিসেম্বর , ১৮৯৬ সন)

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, উল্লেখিত বিখ্যাত পাদ্রী মহোদয়গণের মধ্যে একজনও এ রূহানী মোকাবেলার সম্মুখীন হতে সাহস পাননি। পরন্তু উপমহাদেশের সমগ্র বড় বড় পাদ্রী একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক ও নগ্ন ষড়যন্ত্র পাকালেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর জীবনে একটা মহাবিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ হচ্ছে, ঈসা (আঃ)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু প্রমাণ করা। কারণ খৃষ্টানগণের মজ্জাগত বুলি হচ্ছে, GOD THE FATHER, GOD THE SON, GOD THE HOLY GHOST অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ) 'খোদা তিন'। তারা এ-ও বলে থাকেন যে, খোদা 'তিন'-এ এক, 'এক'-এ তিন। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) কর্তৃক 'ওফাতে ঈসা' প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার কারণে খৃষ্টান মিশনারীগণের টনক নড়ল। তারা ভেবে দেখলেন যে, মির্যা সাহেবের 'ওফাতে ঈসা' সংক্রান্ত জোরালো প্রচারের ফলে ত্রিত্ববাদিতা আর টিকছে না। সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে সুদূর প্রাচ্যদেশে আগত মিশনারীগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস পেতে লাগল। দ্বিতীয়তঃ ১৮৯৩ সনের অমৃতসরের বহসে খৃষ্টানদের শোচনীয় পরাজয় এবং ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আথমের মৃত্যু, তদুপরি রূহানী মোকাবেলায় অগ্রসর জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা সত্ত্বেও সারা উপমহাদেশের পাদ্রীগণের নীরবতা পালন ইত্যাদি ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহের কারণে পাদ্রীরা হতভম্ব হয়ে হেলেন ও নিদারুণ উৎকণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন। সুতরাং খৃষ্টান মিশনসমূহের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, মির্যা সাহেব এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম প্রচার মিশনকে বানচাল করে ত্রিত্ববাদ প্রচারের পন্থাকে নিষ্কন্টক করার মানসে অতি কৌশলপূর্ণ কোন উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় মেতে উঠলেন।

এদিকে অমৃতসরের বহস সুসম্পন্ন হওয়ার পর হতে হযরত আকদসের উপর এ মর্মে কয়েকটি ইলহাম হল যে, শত্রুদের পক্ষ হতে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক এমন কিছু মারাত্মক ঘটনা ঘটবে যার কারণে সরকারপক্ষ হতে তাঁর সম্পর্কে ভীতিপ্রদ ও ত্রাস সৃষ্টিকারী কিছু আদেশ ঘোষিত হবে। ঐসব ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা জানালেনঃ

(১) "مَا هٰذَا إِلَّا تَهْدِيدُ الْحُكَّامِ" এবং (২) لِوَاءُ فَتْحٍ

অর্থাৎ "গভর্নমেন্টের পক্ষ হতে তোমার সম্পর্কে ভীতিপ্রদ এমন কিছু ব্যাপার ঘটবে, (তবে এসব ব্যাপারে তোমার ভয়-ভীতির কোনই কারণ নেই) কেননা, পরিণামে তুমিই বিজয়ী হবে।"

অপর দিকে সংগোপনে ও অতি সুকৌশলে প্রখ্যাত পাদ্রী ডাক্তার হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেব যে ষড়যন্ত্রটি এঁটেছিলেন তা হচ্ছে যে, মুসলমান হতে নবদীক্ষিত খৃষ্টান জনাব আবদুল হামিদ নামক এক ব্যক্তিকে বাদী সাজিয়ে তা দ্বারা এ মর্মে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন যে,"হযরত মির্যা সাহব স্বয়ং হেনরী মার্টিন ক্লার্ককে খুন করানোর জন্য আবদুল হামিদকে বহু টাকা-পয়সা দিয়ে প্রলুব্ধ করেছেন।"

উক্ত ষড়যন্ত্র মোতাবেক নবদীক্ষিত খৃষ্টান আবদুল হামিদ ১৮৯৭ সনের পহেলা আগষ্ট তারিখে অমৃতসরের জিলা প্রশাসক মিস্টার এ.ই. মার্টিনো সাহেবের আদালতে ফৌজদারী দন্ডবিধি ১৪ ধারা এবং ১০৭ ধারা অনুসারে মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। ডি. সি. এ. ই. মার্টিনো সাহেবও স্বয়ং খৃষ্টান ছিলেন। সুতরাং, কালবিলম্ব না করে হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে ননবেইলেবল্ (জামিন অযোগ্য) গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করে ক্ষিপ্রতার সাথে যথাযথভাবে আদেশটিকে কার্যকরী করার জন্য মোকদ্দমার নথিটি তদানীন্তন গুরুদাসপুরের জিলা প্রশাসক বাহাদুরের আদালতে ফরওয়ার্ড করে দিলেন।

এখানে এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেল। অমৃতসরের জেলা প্রশাসকের অফিসে ঐ গ্রেফতারী পরওয়ানা সম্বলিত মোকদ্দমার নথি পত্রগুলো অফিসের বিভিন্ন কাগজপত্রের সঙ্গে এমনভাবে চাপা পড়ে গেল যে, যথা সময়ে বা পরবর্তী ৪/৫ দিন পর্যন্ত নথিটি ডেসপ্যাচই হলো না। অমৃতসর কোর্টেই তা পেন্ডিং রয়ে গেল। অফিসের ষ্টাফের লোকেরাও অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রমের এমন ধরনের একটা ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন না।

এদিকে অমৃতসরের খৃষ্টান মিশনের পাদ্রীগণ বড়ই উৎকন্ঠার সাথে কখনও অমৃতসর কোর্টের বারান্দায় বা কোর্ট প্রাঙ্গণে কখনও বা অমৃতসর রেল ষ্টেশনে ঘুরাঘুরি করতে লাগলেন যে, কোন সময়ে মির্যা সাহেবকে হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় পুলিশের কাষ্টডিতে দেখতে পেয়ে উল্লাস করার সুবর্ণ সুযোগটি ঘটে যায়।

মোকদ্দমাটির ৪/৫ দিন পরে অমৃতসরের ডি. সি. মিষ্টার মার্টিনো সাহেব আইন সংক্রান্ত জেনারেল সার্কুলারসমূহ পাঠ করতে যেয়ে সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর নজরে পড়ল যে, ভিন্ন জিলার অধিবাসী কোন আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি

করা তাঁর ক্ষমতার আওতাভুক্ত নহে। অতএব, গুরুদাসপুর জিলা নিবাসী হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাটির ব্যাপারে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে গুরুদাসপুরের ডি.সি. মিষ্টার ক্যাপ্টেন ডগলাস সাহেবকে এ মর্মে এক টেলিগ্রাম দিলেন যে, "আমা সারা ইস্যুকৃত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিররুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা যেন কার্যকরী করা না হয়।"

পরবর্তী পর্যায়ে খুঁজাখুঁজি করে দেখা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে সাবেক কেইসটি ভুলক্রমে পেন্ডিং ছিল, গুরুদাসপুর কোর্টে পাঠানই হয় নি। যা হোক, অমৃতসরের ডি.সি. সাহেব নথিতে সংযোজিত গ্রেফতারী পরওয়ানাটি বাতেল করে দিলেন এবং শুধু আর্জি সমেত কেইসের নথি ডি. সি. গুরুদাসপুর কোর্টে ফরওয়ার্ড করে দিলেন।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, গুরুদাসপুরের ডি. সি. ক্যাপ্টেন এম. ডব্লিউ. ডগলাস সাহেব মোকদ্দমার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তই নিলেন যে, ইহা কোন ওয়ারেন্ট জারির কেইস নয়। সুতরাং, ১৮৯৭ সনের ১০ই আগষ্ট তারিখে কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য হযরত মির্যা সাহেবের নামে সাধারণ একটি সমন জারি করলেন।

এদিকে গ্রেফতারকৃত অবস্থায় পুলিশ হেফাযতে নীত মির্যা সাহেবের হাল-হকিকত দেখে নেওয়ার আশায় লালারাম ব্রজদত্ত প্রমুখ কতিপয় আর্জসমাজী পন্ডিত এবং মৌলভী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাড়াহুড়া করে গুরুদাসপুর উপস্থিত হলেন এবং ক্যাপ্টেন ডাগলাস সাহেবের কোর্টের প্রাঙ্গণে পায়চারি করতে লাগলেন।

মোকদ্দমাটি কয়েক মাস যাবতই চলছিল। কারণ, বাদীপক্ষ খৃষ্টান এবং তাদের সহযোগী আর্যসমাজী ও মুসলমানদের সম্মিলিত তদবীরের ফলে শুনানির জন্য অনবরত তারিখের পর তারিখ পরিবর্তিত হচ্ছিল। হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) পাঞ্জাব প্রদেশের উচ্চতম রঈস (Chief) খান্দানসমূহের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট রঈস বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাই বৃটিশ সরকারের 'Maintain Status Quo' আইন মোতাবেক মির্যা সাহেব কোর্টে উপস্থিত হওয়ামাত্রই প্রত্যেক তারিখে দস্তুরমত চেয়ারে উপবেশন করতেন।

ঐ সময়ে মির্যা সাহেবের চেয়ারে আসন প্রাপ্তির ব্যাপারেও এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল। মামলার কোন এক তারিখে মৌলানা মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী সাহেব মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য এসে লক্ষ্য করলেন যে, হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) কোর্টে নির্দিষ্ট আসনে সসম্মানে উপবিষ্ট আছেন। অথচ ডি. সি. বাহাদুর সাক্ষী হিসেবে আগত বাটালবী সাহেবকে আসন দেওয়ার ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপ করছেন না। মৌলভী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন জানালেন যে, তিনি একজন প্রখ্যাত আলেম এবং মুসলমান সমাজের একজন বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তি; সুতরাং যে আদালতে আসামীকে চেয়ার দেওয়া হয়েছে, সাক্ষী হিসেবে সেখানে তিনিও চেয়ার পেতে পারেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন ডগলাস সাহেব আবেদনের উত্তরে বললেনঃ "মির্যা সাহেব রইস বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতাকেও এ আদালতে চেয়ার দেওয়া হত, এজন্য তাঁকেও যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করার অনুমতি দিয়ে সম্মানিত করা

হয়েছে। এ কোর্টের রেওয়াজ মোতাবেক তোমাকে চেয়ার দেওয়া যেতে পারে না।" এ উত্তরে বাটালবী সাহেব অসন্তুষ্টির সুরে পুনরাপত্তি পেশ করলে ডগলাস সাহেব রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ "বক্ বক্ মাত কার, পিছে হাট্"। মৌলভী সাহেব এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে পেরেশানী অবস্থায় কোর্টের বাইরে এসে পায়চারি করতে লাগলেন। সে সময়ে আরও এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেল। ঐ সময় কতিপয় মুসলমান কোর্ট প্রাঙ্গণে গাছের নীচে চাদর পেতে বসেছিলেন। জনাব মৌলভী বাটালবী সাহেব ক্লান্ত ও শ্রান্ত অবস্থায় তাদের চাদরের এক কোণে বসে পড়লেন। এমন সময় তাদের মধ্যে পরস্পর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানাজানি হয়ে গেল যে, ক্যাপ্টেন ডগলাস সাহেবের কোর্টে খৃষ্টান বনাম মুসলমানের এক মোকদ্দমায় মৌলভী সাহেব খৃষ্টানদের সপক্ষে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এসেছেন ও আদালতের ভেতর থেকে হাকিমের ধমক খেয়ে এসে অগত্যা এখন তাদের সঙ্গে চাদরে বসেছেন। তখন তারা সবাই রাগে ফেটে পড়লেন এবং কর্কশ বাক্যে তিরস্কার করে মৌলভী সাহেবকে চাদর হতে উঠিয়ে দিলেন।

মোকদ্দমাটি কয়েক মাস ধরে চলতে থাকায় বিরোধী আর্যসমাজী পন্ডিতগণ এ ব্যাপারে খুশীতে বাগ-বাগ হয়ে গেলেন। মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী হাজির করানোর জন্য জোর তদবীর অব্যাহত রাখলেন। কেননা, পন্ডিত লেখরামের অলৌকিকভাবে নিহত হওয়ার ঘটনায় আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও মির্যা সাহেবকে কোন প্রকারেই ঘায়েল করা সম্ভব হয়নি, তবে এবার যে সুযোগ ঘটেছে, উহার শেষফল কি দাঁড়ায় তা দেখার অপেক্ষায় আর্যসমাজী শিক্ষিত মহল উদগ্রীব ছিলেন।

বস্তুতঃপক্ষে মোকদ্দমার বাদী কেবল খৃষ্টান পক্ষ হলেও খৃষ্টান, আর্যসমাজী এবং মুসলমান, এ তিন পক্ষ থেকেই মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সংখ্যক মিথ্যা সাক্ষীর ব্যবস্থা করে তারা সমবেতভাবে জোর তদবীর চালিয়েছিলেন।

আবহমানকাল থেকেই ইহা আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান চলে আসছে ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ

আল্লাহ্ ফয়সালা করিয়া লইয়াছেন ঃ নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হইব। – (সূরা মুজাদেলা-২২ আয়াত)

فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হইবে। (৫ঃ৫৭)

সুতরাং জগত সৃষ্টি অবধি এক লক্ষ চব্বিশ সহস্রবার ঐ একই হাল-হকীকতের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যেহেতু 'খাতামান্ নাবীঈন' রসূলে করীম (সাঃ)–এর কুয়তে ফায়যান ও কুওয়তে কুদসীর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তা'লার 'মামুর' তথা উম্মতী নবী। সুতরাং, তাঁর বেলায়ও ইহাই ঘটল।

ন্যায় বিচারক ইংরেজ বিচারপতি ক্যাপ্টেন এম. ডব্লিও. ডগলাস সাহেবের কোর্টে শুনানী চলাকালীন অবশেষে বাদী মুসলমান হতে নবীদিক্ষীত খৃষ্টান আবদুল হামীদ আসল কথা ফাঁস করে দিল। কয়েক দফা শুনানীর পর আবদুল হামীদ আদালতে স্বীকারোক্তি করলঃ "প্রকৃতপক্ষে এ মামলার ব্যাপারে কস্মিনকালেও মির্যা সাহেব কাহাকেও খুন করার জন্য আমাকে কিছুই বলেননি। আর্জিতে উল্লেখিত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্বয়ং ডাক্তার মার্টিন ক্লার্ক সাহেব এবং তাঁর সাংগ-পাংগ আমাদের খৃষ্টান ভ্রাতাগণই আমাকে এ ধরনের একটা মামলা দায়ের করার জন্য প্ররোচিত করেন। তারা সকলে সম্মিলিত হয়ে এ কাজের জন্য যথেষ্ট পুরস্কার পাবার লোভ দেখান এবং কথা অমান্য করলে কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়ে আমাকে এ কাজে নামিয়েছেন।"

খৃষ্টান আবদুল হামীদ স্বীকারোক্তি করলঃ "সাক্ষী এবং বিবাদীর নাম তার স্মরণ থাকে না বলে জিজ্ঞাসামাত্র থতমত না খেয়ে দ্বিধাহীন উত্তর প্রদানের সুবিধার্থে খৃষ্টান ভাইয়েরা আমার হাতের তালুতে সংশ্লিষ্ট নামগুলোও লিখে দিতেন।" সংগে সংগে তার হাতের তালু পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, উহাতে লেখার চিহ্ন বিদ্যমান।

গুরুদাসপুরের বিজ্ঞ ডি. সি. ক্যাপ্টেন এম. ডব্লিও. ডগলাস সাহেব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ব্যাপারটি একটি নিছক নগ্ন ষড়যন্ত্র ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। সুতরাং, বাদী এবং বাদীর দল যথাক্রমে স্বধর্মের ও স্বদেশের হওয়া সত্ত্বেও ন্যায়-বিচার করতে তিনি লেশমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করলেন না। মির্যা সাহেবকে ডগলাস সাহেব Honourably Acquitted তথা সম্মানের সাথে রেহাই দিয়ে রায় দিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে মোবারকবাদও জানালেন। *

রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ডগলাস সাহেব একথাও বললেন যে, সম্মানিত বিবাদী মির্যা সাহেব আইনতঃ 'মানহানি' এবং 'ক্ষতিপূরণ' দাবী করে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন। হুযূর আকদস তৎক্ষণাৎ আদালতকে জানিয়ে দিলেন ঃ

"ঈসাইয়ুঁসে হামারা মোকদ্দমা তো আস্‌মান পার চাল রাহা হ্যা, হামেঁ আসমানী আদালত কাফী হ্যা। দুনিয়া কি আদালতোঁ মে হাম কুই মোকদ্দমা নাহি চালানা চাহ্‌তেঁ।"

হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যেহেতু রসূলে করীম (সাঃ)-এর কুয়তে ফায়েযান হতেই ফায়েয হাসেল করেছিলেন তাই সরওয়ারে কায়েনাত, রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামান্ নাবীঈন (সাঃ)-এর মহান আদর্শের অনুকরণে প্রাণের শত্রুর উপরেও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি মোটেই আগ্রহ দেখালেন না।

---

* টীকাঃ ক্যাপ্টেন এম. ডব্লিউ, ডগলাস সাহেব মোকদ্দমাটির রায় ঘোষণা করেছিলেন ১৮৯৭ সনের ২৩শে আগষ্ট তারিখে।

এ বিখ্যাত মোকদ্দমাটির বিজ্ঞ বিচারপতি এম. ডব্লিও. ডগলাস সাহেব অবসর গ্রহণের পরে লন্ডনে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। ঐ সময়ে বিগত ২৪-১-৬০ (রায় ঘোষণা ৬৩ বৎসর পরে) শ্রদ্ধেয় স্যার চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব লণ্ডন গিয়ে ডগলাস সাহেবের বাসভবনে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। কথা প্রসঙ্গে চৌধুরী সাহেব ডগলাস সাহেবের সঙ্গে হেনরী মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমাটি সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন। আলোচনা চলাকালে এক পর্যায়ে ডগলাস সাহেব বলেছিলেন, "মোকদ্দমা উপলক্ষে যখন মির্যা সাহেব আমার আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন সর্বপ্রথম দৃষ্টিতে তাঁর চেহারা দেখেই আমার মনে এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সত্য নহে।"

অতঃপর ডগলাস সাহেব বলেছিলেন, "আমি এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) সত্যই একজন মহানবী ছিলেন এবং এ-ও বলেছিলেন যে, মির্যা সাহেবও একজন নবী ছিলেন।"

আলেকজান্ডার ডুই-এর সঙ্গে মোবাহালা

ইলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ এবং প্রতিশ্রুত মসীহ ও 'ইমাম মাহদী' হওয়ার দাবী করেন। একই সময়ে 'পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই' নামক আমেরিকার একজন বিখ্যাত খৃষ্ট ধর্মযাজক নিজেকে 'এলিয়' তথা ইলিয়াস পয়গম্বর বল দাবী করেন এবং নিজের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বব্যাপী জোরালো প্রপাগন্ডা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে পশ্চিম গোলার্ধে এলিয় নবী হওয়ার দাবীকারক মিষ্টার আলেকজান্ডার ডুই এবং পূর্ব গোলার্ধে অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষের প্রতিশ্রুত মসীহ (মুহাম্মদী মসীহ) হওয়ার দাবীকারক মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রসঙ্গদ্বয় সারা বিশ্বে তখন এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

প্রখ্যাত পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুইয়ের সঙ্গে 'ইসলাম ধর্ম সত্য নাকি খৃষ্টধর্ম সত্য' তা যাচাই করে দেখার জন্য আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর এক মোবাহালা হয়েছিল। এই 'ঐতিহাসিক মোবাহালার' ঘটনাকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকাগুলোতে বহু চিত্তাকর্ষক খবর এবং নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যার ফলে খৃষ্টধর্মের উপর ইসলামের সত্যতা বা সাদাকাত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছিল।

ইলিয়াস নবী হওয়ার দাবীকারক পাদ্রী ডুই সাহেব মূলতঃ অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী ছিলেন। দেশ ত্যাগ করে আমেরিকা এসে তিনি ধর্মযাজক হিসেবে আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৯২ সালে তিনি আমেরিকায় খৃষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজে শিষ্যগণকে নিয়ে একটি শহর স্থাপন করেন। যার নাম দেন 'জিয়ন শহর'। যেহেতু ঐ জামানাতে পৃথিবীতে মসীহের তথা ঈসা নবীর দ্বিতীয় আগমনের

নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল, সেহেতু সারা পৃথিবীর জনসাধারণের মধ্যে এতদ্বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল যে কখন, কোথায়, কীভাবে কোন্ দেশে বা কোন্ মহাদেশে অথবা পৃথিবীর কোন্ শহরে মসীহ আকাশ হতে অবতরণ করবেন? যদিও আকাশ হতে অবতরণের বিশ্বাসটা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতা বিরোধী এবং অলীক ধারণাপ্রসূত, তথাপি কোটি কোটি মানুষের জন্য এ ছিল একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং তদানীন্তন সুধী মহলের জন্যও ছিল একটা আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ। একদিকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'বনী ইস্রাঈলী মসীহ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুলাভ করেছেন এবং শ্রীনগর (কাশ্মীর) শহরে তাঁর সমাধি বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং, আকাশ হতে মসীহ অবতরণের আকিদাটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।

অপর দিকে এলিয় পয়গম্বর হওয়ার দাবীকারক পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুইও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, "বনী ইস্রাঈলী মসীহ আমার প্রতিষ্ঠিত পবিত্র নগর আমেরিকার জিয়ন শহরে অবশ্যই আকাশ থেকে অবতরণ করবেন।" এরূপ ব্যতিক্রমধর্মী ঘোষণাসমূহের প্রচারের প্রেক্ষিতে উভয় গোলার্ধেই বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হতে লাগল। বিশেষতঃ এতে করে খৃষ্টজগতে এক অভূতপূর্ব উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছিল।

আলেকজান্ডার ডুই সাহেব তাঁর অসাধারণ বাকশক্তির মদে মত্ত হয়ে যুক্তি প্রদর্শন করলেন, যেহেতু এ পৃথিবীতে খৃষ্টের আগমনের পূর্বে 'এলিয়' নবীর পুনরাগমনের নির্দেশ ছিল এবং বর্তমানে মসীহের দ্বিতীয় আগমনের সময় অত্যাসন্ন। অতএব, তাঁর আকাশ থেকে অবতরণের পূর্বে তিনিই (ডুই সাহেব) স্বয়ং 'এলিয়' পয়গম্বর হিসেবে আগমন করেছেন। পাদ্রী ডুই সাহেব নিজের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার এরূপ দাবীও জনসমক্ষে পেশ করলেন যে, মসীহের ন্যায় তিনিও প্রার্থনার বলে স্পর্শ দ্বারা ব্যধিগ্রস্তদের আরোগ্য দান করতে সক্ষম।

ডুই সাহেব ছিলেন একজন প্রতিভাশালী, কর্মদক্ষ এবং সাংগঠনিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির বলে একটি সমৃদ্ধশালী এলাকাতে ১১ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তৃত ছয় সহস্র একর জমি খরিদ করে স্বীয় মিশনের কেন্দ্র হিসেবে 'জিয়ন' নামে একটি নতুন শহরের পত্তন করে তিনি ঘোষণা করলেনঃ "যীশু যখন আকাশ থেকে অবতরণ করবেন তখন তিনি নবগঠিত এ পবিত্র নগর জিয়ন সিটিতেই অবতরণ করবেন।" তাঁর এরূপ আস্ফালন শুনে জনগণের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, ডুই সাহেবের সঙ্গে খোদাতা'লার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এবং খোদার নির্দেশেই যীশুর অবতরণের স্থান হিসেবে তিনি এ পবিত্র নগর জিয়ন সিটির গোড়াপত্তন করেছেন। এ নিয়ে চতুর্দিকে এমন কি দেশ-বিদেশে সর্বত্র একটা চিত্তাকর্ষক খবরে মুগ্ধ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ধনিক সম্প্রদায়ের লোকেরা জিয়ন সিটিতে বাড়ী নির্মাণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। যে পবিত্র নগরীতে যীশু স্বয়ং আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, সেখানে কে কার পূর্বে বাড়ী তৈরী করবেন সেই চিন্তা-ভাবনায় তাঁরা অধীর হয়ে গেলেন। ফলে দেখতে দেখতে স্বল্পকালের মধ্যেই শহরটিতে গগণচুম্বী অট্টালিকাসমূহ নির্মিত হয়ে গেল। লক্ষ-লক্ষ সঙ্গতিসম্পন্ন আমেরিকান তার উপর ঈমান আনতে লাগলেন। চতুর্দিকে পাদ্রী ডুই সাহেবের নাম-যশ ছড়িয়ে পড়ল এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে পশ্চিম গোলার্ধের

অন্তর্ভুক্ত বিশাল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরাও দলে দলে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে শুরু করে দিল। এমন কি বিশাল আটলান্টিক মহাসাগরের পরপারে অবস্থিত ইউরোপ মহাদেশের যাবতীয় এলাকায় এবং সুদূর প্রাচ্যের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহেও পাদ্রী ডুই সাহেবের মিশন বিস্তার লাভ করতে লাগল। তাঁর মতবাদ প্রচারের সুবিধার্থে 'লিভস্ অব হিলিং' নামক একটি পূর্ণাঙ্গ পত্রিকাও প্রকাশ করা হত। এমন কি বহির্দেশে ফ্রান্স ও জার্মান ভাষায় এতদুদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশ হতে লাগল।

আমেরিকার একজন সুবিখ্যাত লেখক পার্শন সাহেব রচিত 'ভয়েস অব জিয়ন সিটি' নামক পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে, ডুই সাহেব তাঁর শিষ্যদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ "আমি যা-ই বলব, তোমাদেরকে অবশ্যই তা পালন করতে হবে। কেননা, খোদার ওয়াদা অনুযায়ী আমি একজন পয়গম্বর।' পয়গম্বরী দাবীর সঙ্গে গর্বের সাথে তিনি ইহাও ঘোষণা করেছিলেনঃ "সারা বিশ্ব মানবের কেন্দ্র হিসেবেই পবিত্র জিয়ন শহরের অভ্যুদয় হয়েছে। এ পবিত্র জিয়ন সিটির বাদশাহাত স্বর্গীয় বাদশাহাত, যাকে কেউই টলাতে পারবে না।"

-('LEAVES OF HEALING' VOL; 18, No, 26 Page 458)

ফলতঃ পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই সাহেব একজন প্রতাপান্বিত বাদশাহের মতই অতীব উন্নতমানের জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। তাঁর ভক্তগণের ভক্তির আতিশয্যে তাকে 'ডুই দি ডক্টর' কেউ তাকে 'দি ওভারসিয়ার' 'দি ফার্স্ট এ্যাপোসোল' খেতাবে সম্বোধন করতে লাগলেন। লক্ষ-লক্ষ শিষ্যের সমন্বয়ে গঠিত তাঁর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'দি জেনারেল ওভারসিয়ারের' সর্বাধিনায়ক হিসেবে অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তা ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন শিল্পপতি। তিনি কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বড় বড় কল-কারখানারও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত অর্থসম্পদ তখন ৬ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

-(আলকাস পারলান প্রণীত 'ডুই এন্ড দি খৃষ্টান ক্যাথলিক এপষ্টলিক চার্চ ইন জিয়ন')

মুদ্দাকথা এই যে, অগাধ ধন-সম্পদ, শিষ্যদের সংখ্যাধিক্য এবং প্রগতিশীল ও সঙ্গতিসম্পন্ন শিষ্যদের উপর তাঁর আধিপত্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরে তাঁর একচেটিয়া স্বত্বাধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ইত্যাদির গর্বে পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই সারা দুনিয়ায় অন্য কাউকেও নিজের সমকক্ষ বলে মনে করতেন না।

উল্লেখ্য যে, ১৮৯৬ সনের ২২ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পাদ্রী ডুই সাহেব খৃষ্টান ক্যাথলিক এপষ্টলিক চার্চের নাম দিয়ে 'জেনারেল ওভারসিয়ার' হিসেবে আখ্যায়িত করে জিয়ন সিটি চার্চের অধীন একটি নতুন স্বতন্ত্র ফেরকা সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ ফেরকা সৃষ্টি করেই তিনি ঘোষণা করেছিলেনঃ অতঃপর চার্চ অব ইংল্যান্ড, ডিফেন্ডার অব ফেইথ, চার্চ অব রোম, ভেটিকান ইত্যাদি যাবতীয় চার্চ সংস্থাই বাতেল বলে গণ্য করা হবে।

'জেনারেল ওভারসিয়ার' সংস্থাটিই হবে খৃষ্টধর্মের একমাত্র প্রতিনিধি।" তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এ নির্দেশ কার্যকরী হতে লাগল এবং অন্যান্য সংস্থার অন্তর্গত সমুদয় চার্চসমূহে লোক সমাগম ক্রমান্বয়েই হ্রাস পেতে লাগল। আর এদিকে জেনারেল ওভারসিয়ার মতবাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'চার্চ অব জিয়ন সিটি' লোকে লোকারণ্য হতে লাগল। ২/৩ বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল যে, অন্যান্য সমস্ত গীর্জসমূহ অনাবাদী এবং অকেজো হয়ে পড়ছে।

পাদ্রী ডুই সাহেবের নব প্রতিষ্ঠিত 'চার্চ অব জিয়ন সিটিতে' এক বিশালকায় ঘন্টা সংস্থাপিত হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে,সকাল ৯ ঘটিকা এবং সন্ধ্যার পরে ৯ ঘটিকার সময়ে গীর্জায় উপস্থিতির সংকেত স্বরূপ ঘন্টাধ্বনি করা হবে। কড়া আদেশ জারী করা হয়েছিল যে,ঘন্টাধ্বনি হওয়ামাত্র পদমর্যাদা নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাইকে গীর্জায় হাজিরা দিতে হবে।

বস্তুতঃ চার্চ অব জিয়ন সিটিতে প্রার্থনার সময়ে এরূপ আশ্চর্য দৃশ্য এবং অভূতপূর্ব ধর্মীয় পরিবেশ অবলোকন করে সমসাময়িক সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ এবং জার্নালিষ্টগণ ইহাই প্রচার করতেছিলেন যে, এসব কর্মকান্ড ডুই সাহেবের মোজেযা বা অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। শুধু তাই নয়, স্বীয় ভৌতিক চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাময়ের জন্য পবিত্র জিয়ন নগরে প্রকান্ড হাসপাতাল নির্মাণ করা হল। হাসপাতালটির আয়তন বৃদ্ধি হতে হতে ক্রমিক নম্বর ১ হতে ৭ নম্বর হাসাপাতাল পর্যন্ত নির্মিত হয়ে গেল। বহুসংখ্যক রোগী আসতে লাগল। ফী বাবদ প্রতি রোগী হতে সে যুগের মুদ্রায় ২০ ডলার হারে আদায় করা হত।

প্রচারের সুবিধার্থে 'জিয়ন প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ' নামকরণ করে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রেসও স্থাপন করা হয়েছিল। অর্থ-সম্পদের সুষ্ঠু তদারকির জন্য জিয়ন সিটিতে ডুই সাহেবের নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হল। বিভিন্নমুখী বিরাট সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য 'জিয়ন গার্ড' নামে এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। নির্মাণ কার্যে শহরটিকে স্বনির্ভর করে তোলবার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারের মতই 'ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনষ্ট্রাকশান বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিল। ডুই সাহেবের একজন অতীব প্রিয় শিষ্য উইলভার গ্লিভেন ওয়ালীথ নামীয় একজন পাদ্রী ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার। তিনি ডুই সাহেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

জিয়ন সিটির ঐসব বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতা ছাড়াও বহির্দেশে তাঁর আরও ৩২টি মিশন কার্যরত ছিল। নিউ ইয়র্ক গীর্জার ভক্তগণকে জিয়ন সিটি গীর্জার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একবার তিনি ৬/৭টি স্পেশিয়াল ট্রেনের ব্যবস্থা করে তিন সহস্র অনুচরবর্গ নিউ ইয়র্ক ভ্রমণে বের হলেন। জিয়ন সিটি হতে ৯০০ মাইল দূরবর্তী নিউ ইয়র্ক শহরে দলে দলে উপস্থিত হওয়ামাত্র খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল। বহুল প্রচারিত 'এলিয় পয়গম্বরকে' এক নজর দেখবার জন্য নিউ ইয়র্ক শহরের রাস্তাঘাট, রেলওয়ে স্টেশনসহ সর্বত্র লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

তথাকথিত এলিয় নবী ডুই সাহেবের জীবনে এরূপ আন্তর্জাতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করা এবং ধর্ম প্রচারের এমন অভিনব পদ্ধতি সূচনা করার মূখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামকে করতলগত করে ত্রিত্ববাদের দ্বারা জগতকে ছেয়ে ফেলা। তাঁর নিজস্ব পত্রিকা 'লিভস্ অব হিলিং'-এর ১৯০২ সনের ৭ই জুন সংখ্যাতে ডুই সাহেব বলেছিলেনঃ "যেভাবে জিয়ন সিটি তৈরী করেছি তদনুরূপ একাদিক্রমে আরও ৭টি জিয়ন সিটি তৈরী করতে আমরা সক্ষম এবং এরূপে জিয়ন সিটির সংখ্যা বৃদ্ধি করলে আমাদের আয়ও বৃদ্ধি হয়ে ১০ লক্ষ ডলারে উন্নীত হবে। সে অবস্থাতে আমরা মুসলিম তুরস্ককে কিনতে পারব এবং জেরুজালেমকে তথা বায়তুল মুকাদ্দাসকেও আমরা পুনর্দখল করতে পারব। * তদনুরূপ সমগ্র ইহুদীগোষ্ঠি এবং মূর্তিপূজক মোশরেক জাতিগুলোকেও খরিদ করা যাবে।"

পাদ্রী ডুই সাহেব একজন কট্টর ইসলাম বিরোধী ছিলেন। ইসলামের সঙ্গে সর্বদাই তিনি বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন এবং ইসলাম ও ইসলামের নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে কুবাক্য ও কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন।

১৯০২ সনে জিয়ন সিটি হতে প্রকাশিত 'লিভস্ অব হিলিং'-এর মাধ্যমে পাদ্রী ডুই সাহেব এক ঘোষণা প্রকাশ করেছিল ঃ "যদি মুসলমানেরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করে তবে তারা এ ধরাপৃষ্ঠ হতে নির্মূল হয়ে যাবে।" পাদ্রী ডুই যেহেতু একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ধর্মগুরু হিসেবে বিবেচিত হতেন তাই মুসলমানদের সম্পর্কে এ মারাত্মক ঘোষণাটি পত্রিকা হতে পত্রিকান্তরে প্রচারিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত কাদিয়ানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর গোচরীভূত হয়।

১৯০২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইসলাম ধর্মের গুণাবলী এবং ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করে এক ইশ্‌তেহার প্রকাশ করে আলেকজান্ডার ডুই-এর কাছে এই বলে প্রেরণ করলেনঃ **'খোদাতালার তরফ থেকে আমি এ জামানার প্রতিশ্রুত মসীহ। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলে সব মুসলমান নির্মূল হয়ে যাবে বলে আপনি যে ঘোষণা করেছেন, তার উত্তরে আপনাকে অবহিত করছিঃ ধর্মের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আপনার ঘোষণা মোতাবেক কোটি কোটি মানুষের (মুসলমানদের)ধ্বংস কামনা না করে আপনি বরং একটা সহজ পন্থা অবলম্বন করুন। সে পন্থাটি হচ্ছে যে, ইসলাম সত্য, নাকি আপনার ত্রিত্ববাদ সত্য, তা যাচাই করে দেখার জন্য আমার সঙ্গে 'মোবাহালায়' অগ্রসর হউন। এ ধরনের মোবাহালার ফলশ্রুতিতে যদি আমি একব্যক্তি হালাক হয়ে যাই তবে খৃষ্টধর্ম সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং কেবলমাত্র এক ব্যক্তিকে ধ্বংস করেই অতি সহজে আপনার উদ্দেশ্য হাসেল হয়ে যাবে। আর মোবাহালার ফলে যদি আপনি হালাক হয়ে যান, তবে ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে।**

---

* টিকা ঃ তখনকার দিনেও বিশ্ব মোসলেমের খেলাফত বিরাজিত ছিল তুরস্কে। তুরস্ক ছিল 'দারুল খেলাফত'। জেরুজালেম নগরে অবস্থিত কেবলায়ে আঁওয়াল বায়তুল মোকাদ্দাস তখনও মুসলমানদের অধিকারে ছিল।

একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রখ্যাত পত্রিকাসমূহে ব্যাপকভাবে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল। যে সকল পত্রিকাতে এ ঐতিহাসিক চাঞ্চল্যকর চ্যালঞ্জটি প্রচারিত হল তার সংখ্যা এক শতের কম হবে না। এসব পত্রিকার মধ্যে হযরত মির্যা সাহেবের নিকট প্রায় ৪০টি পত্রিকার কপি পৌঁছেছিল। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি প্রখ্যাত পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হলঃ

১।	চিকাগো ইন্টারভিশন-	২৮শে জুন, ১৯০৩
২।	ওয়ালিংটন প্রেস-	২৭শে জুন, ১৯০৩
৩।	নিউ ইয়র্ক মেইল-	২৫শে জুন, ১৯০৩
৪।	বালটিমোর আমেরিকান-	২৫শে জুন, ১৯০৩
৫।	বোষ্টন রেকর্ড-	২৭শে জুন, ১৯০৩
৬।	রিচম্যান নিউজ-	১লা জুলাই, ১৯০৩
৭।	গ্লাসগো হ্যারলড্-	২৭শে জুন, ১৯০৩
৮।	হিউষ্টন ক্রনিক্যাল	৩রা জুলাই, ১৯০৩
৯।	নিউ ইয়র্ক কমর্শিয়াল এডভার্টাইজার-	২৬শে অক্টোবর, ১৯০৩
১০।	দি মর্নিং টেলিগ্রাফ, নিউ ইয়র্ক-	২৮শে অক্টোবর, ১৯০৩
১১।	পাথ-ফাইন্ডার, ওয়াশিংটন-	২৭শে জুন, ১৯০৩

অতঃপর ১৯০৩ সনের ডিসেম্বর নাগাদ আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় হযরত মির্যা সাহেবের এ মোবাহালার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে এবং রিভিউ ও সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহ পত্রিকা হতে পত্রিকান্তরে প্রকাশ হতে থাকে। অত্র পুস্তকের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখার মানসে যাবতীয় পত্রিকার বিবৃতি উদ্ধৃত করা হতে বিরত রইলাম। তবে একটিমাত্র পত্রিকার রিপোর্ট প্রকাশ করছি।

উওয়াশিংটন হতে প্রকাশিত 'পাথ-ফাইন্ডার' নামক পত্রিকার ১৯০৩ সনের ২৭শে জুন সংখ্যার নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয়েছিলঃ

"মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ভারতের একজন মুসলমান, যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করেছেন। তাঁর অনুসরণকারী দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করছে। কিন্তু চিকাগো এলাকায় অবস্থিত জিয়ন সিটির ডক্টর ডুই সাহেবের সঙ্গে তাঁর বৈরিতা চলছে। কেননা, তিনি (ডুই সাহেব) একই প্রকারের এলিয় নবী হওয়ার দাবীকারক। মির্যা সাহেব তাকে এরূপ মোবাহালা অর্থাৎ প্রার্থনা প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যেন স্পষ্টতঃ ইহা প্রমাণিত হয়ে যায় যে,তাঁদের উভয়ের মধ্যে আপন আপন দাবীতে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী; এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃতই কে আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট সত্য পয়গম্বর।"

এতদ্‌সত্ত্বেও পাদ্রী ডুই সাহেব হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর এ ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জের সরাসরি কোন উত্তর দেননি। তবে 'লিভস্ অব হিলিং' পত্রিকার ১৯০৩ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যাতে পাদ্রী ডুই সাহেব ইসলামের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত 'বদ্‌দোয়াটি' প্রকাশ করেছিলেনঃ

"আমি (পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই) খোদার নিকট দোয়া করছি যেন সেদিন সন্নিকট হয়, যখন ইসলাম ধরাপৃষ্ঠ হতে নাবুদ হয়ে যায়। হে খোদা! তুমি আমার এ দোয়া কবুল কর, হে খোদা! তুমি ইসলামকে ধ্বংস কর।"

অতঃপর উপরোক্ত পত্রিকার ৫ই আগষ্ট সংখ্যায় ইসলামের বিরুদ্ধে তিনি পুনঃ ঘোষণা করলেন ঃ **"মানবতার উপর এ কলঙ্কময় চিহ্নকে অর্থাৎ ইসলামকে জিয়ন শহর ধ্বংস করে ছাড়বে।"**

হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যখন বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন যে,বারংবার চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও পাদ্রী ডুই সাহেব কোন পরওয়াই করছেন না, অথচ ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হতেও বিরত হচ্ছেন না, তখন ১৯০৩ সনের ২৩শে আগষ্ট তারিখে তিনিও একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করলেন যার শিরোনামা দেওয়া হলঃ "এ জামানাতে আল্লাহ্ আমাকে এ জন্যই পাঠিয়েছেন, যেন তাঁর 'তৌহীদকে' আমি জগতে প্রতিষ্ঠিত করি এবং শির্ককে মিটিয়ে দেই।"

অতঃপর ২৩শে আগষ্ট তারিখের ঐ ইশ্‌তেহারটিতে একথাও তিনি ঘোষণা করলেনঃ 'আমেরিকার জন্য খোদাতা'লা আমাকে এক নিশান প্রদান করেছেন যে, পাদ্রী ডুই সাহেব যদি আমার সঙ্গে মোবাহালাতে অগ্রসর হয়ে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আমার মোকাবেলাতে এসে যান তাহলে ঃ

"وہ دیکھتے دیکھتے بڑی حسرت اور دُکھ کے ساتھ اس دنیائے فانی کو چھوڑ دیگا۔"

"দেখতে দেখতে এই ব্যক্তি (পাদ্রী ডুই সাহেব) অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়ে ইহলীলা ত্যাগ করবে।"

উক্ত ইশ্‌তেহারটিতে হযরত আকদস ইহাও লিখলেনঃ "পাদ্রী ডুই সাহেবকে প্রথম দফায়ও মোবাহালাতে আমার সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম; কিন্তু অদ্যাবধি তিনি আমাকে উহার কোন উত্তর প্রদান করেন নি। সুতরাং পুনরায় আমি ঘোষণা করছি যে, এখন হতে আমার চ্যালেঞ্জের জওয়াব দেওয়ার জন্য পাদ্রী ডুই সাহেবকে ৭ মাস সময়ের অবকাশ দেওয়া হল।"

অতঃপর হযরত আকদস (আঃ) এ-ও ঘোষণা করলেনঃ "পাছ একিন রাখ্যো কে উছকে সাইহুন (জিয়ন সিটি) পার জল্‌দ্ আওর এক আফত্ আনে ওয়ালী হ্যা।" অর্থাৎ

'তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, শীঘ্রই তার (পাদ্রী ডুই সাহেবের) জিয়ন সিটিতে আরেকটি বিপদ অবতীর্ণ হবে। "

ডুই সাহেব হতে কোন প্রকারের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই হযরত আকদস (আঃ) আরও ঘোষণা করলেন ঃ

"আয় খোদা ইয়ে ফয়সলা জলদ কার কে পিগট আওর ডুই কা 'ঝুট' লোগোঁ পর যাহের কার দে।"

অর্থাৎ "হে খোদা! অতি শীঘ্রই তুমি পিগট সাহেব এবং পাদ্রী ডুই সাহেবের মিথ্যাকে জনসমক্ষে প্রকাশিত করে দাও।"

হযরত আকদসের ইশ্‌তেহার মারফত এসব ঘোষণাসমূহ সারা পশ্চিম গোলার্ধে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে লাগল। এমন কি এশিয়া এবং ইউরোপের প্রখ্যাত পত্রিকাসমমূহেও মির্যা সাহেব (আঃ)-এর এসব চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত খবরসমূহ পরিবেশিত হতে লাগল। এসব পত্রিকার মধ্যেঃ (১) গ্লাসগো হ্যারল্ড, ইংল্যান্ড, (২) নিউ ইয়র্ক কমার্শিয়াল এডভার্টাইজার, আমেরিকা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর এ ধরনের উপর্যুপরি চ্যালেঞ্জসমূহ এবং ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সমগ্র আমেরিকায় এবং ইউরোপের আন্তর্জাতিক পত্রিকাসমূহের মারফত বহুল প্রচারের ফলে সারা বিশ্বের বিশেষ করে আমেরিকান খৃষ্টান জনসাধারণের মধ্যে এরূপ একটা সন্দেহের সৃষ্টি হল যে, পাদ্রী ডুই সাহেবের অলৌকিকতা তথা দাবীটা হয়ত বা ভন্ডামি বা ভাওতাবাজীরই নামান্তর। এমনকি ডুই সাহেবের নিজস্ব জিয়ন চার্চের ভক্তবৃন্দও বলতে লাগলেন যে, তাদের মহান গুরু যিনি খোদার ওয়াদা অনুযায়ী একজন পয়গম্বর, তিনি হিন্দস্থানের অধিবাসী একজন মুসলমানের (যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবীকারক) ঘোষণাগুলোর প্রেক্ষিতে কোন জওয়াব দিচ্ছেন না কেন, তা তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। এর জওয়াব দেওয়ার জন্য অনেকেই ডুই সাহেবের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন।

যা হোক,এসব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভক্তবৃন্দের সন্দেহ নিরসনের জন্য পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই সাহেব তাঁর 'লিভস্ অব হিলিং' পত্রিকার মাধ্যমে সর্বপ্রথম হযরত আকদসের ১৯০২ সনের এবং ১৯০৩ সনের চ্যালেঞ্জসমূহের কথা উল্লেখ করলেন এবং খুবই ঘৃণা ও অহঙ্কারের সঙ্গে হযরত আহমদ কাদিয়ানীকে 'হিন্দুস্থানের এক বেকুফ মুহাম্মদী মসীহ' নামে আখ্যায়িত করলেন এবং ভক্তদের সান্ত্বনার জন্য লিখলেনঃ "তোমরা কি এরূপ ধারণা কর যে, এ ধরনের মশা-মাছির আস্ফালনের কোন প্রকার জবাব দেব আমি? তাদের উপর যদি আমার পা রাখি তবে পদদলিত ও নিষ্পেষিত করে দিতে পারি। কিন্তু এখন আমি তাকে সময় দিতেছি যেন আমার দৃষ্টির বহির্ভূত অবস্থায় অন্ততঃ আরও কিছুদিন সে বেঁচে থাকতে পারে। "

হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর চ্যালেঞ্জকে 'অগ্রাহ্য করা বা পরওয়া না করা' প্রদর্শন করতে যেয়ে পাদ্রী ডুই সাহেব উপরোক্ত মন্তব্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে হযরত আকদসের সঙ্গে মোবাহালাতে দন্ডায়মানই হয়ে গেলেন। এখানে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত আকদস তাঁর ইশ্‌তেহারে স্পষ্টরূপেই এ কথাটি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, "যদি এ 'ব্যক্তি 'ইশারাতান' অন্ততঃ ইশারা বা আকার-ইঙ্গিতেও আমার মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায়, তবে আমার জীবদ্দশায়ই সে অত্যধিক দুঃখ-যাতনার ভিতর দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

তথাকথিত পয়গম্বর ডুই সাহেবের অহঙ্কার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলল। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এ কথাও প্রচার করলেনঃ "খোদার ভূপৃষ্ঠে যদি আমি পয়গম্বর না হয়ে থাকি, তবে আর কেউই পয়গম্বর নহে।" এতদ্‌সঙ্গে তিনি ইহাও বললেনঃ " এক ফেরেশ্‌তা এ খবরও আমাকে দিয়েছেন যে, আমি আমার দুষমনদের উপর জয়যুক্ত হব।"উপরন্ত স্বীয় অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ডুই সাহেব হযরত আহমদ (আঃ)–কে কীট বা মশা-মাছির সঙ্গে তুলনা দিয়ে এবং পদদলিত করে নিষ্পেষিত করার মত অবিমৃষ্যকারিতা প্রদর্শন করে পরোক্ষভাবে হযরত আকদসের সঙ্গে 'মোবাহালাতে' জড়িত হয়ে গিয়েছিলেন। পাদ্রী ডুইয়ের এসব হঠকারিতার পর হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ডুই সম্বন্ধে লেখালেখি কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখলেন।

আল্লাহ্‌তা'লা শাস্তি প্রদানে মন্থর কিন্তু যখন কাউকেও পাকড়াও করেন তখন সে গযব হতে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। সুতরাং, আল্লাহ্‌তা'লার এরশাদ "ফানতাযিরু ইন্নি মায়াকুম মিনাল মুনতাযেরীন" আয়াতে করীমার মর্ম মোতাবেক হযরত আকদস খোদায়ী ফয়সালার অপেক্ষায় থাকলেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শন লক্ষ্য করুন। যে হস্ত দ্বারা ডুই সাহেব খোদা প্রেরিত প্রতিশ্রুতি মসীহের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় লিখেছিলেন, যে পদযুগল দ্বারা দলিত করে মুহাম্মদী মসীহকে নিষ্পেষিত করার ঘোষণা করেছিলেন, কিছুকাল অতিবাহিত হতে না হতেই ১৯০৫ সনের সেপ্টেম্বর মাস 'শেলেটবার নিকেল' গীর্জার হলে মহাসমারোহের সাথে যীশুর মৃত্যু উপলক্ষে এক জনাকীর্ণ অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণ দানের সময় সেই হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয় সহসা বাত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে প্যারালাইজড্ (পক্ষাঘাতগ্রস্ত) হয়ে গেল। ক্রমান্বয়ে তাঁর হাত-পা একেবারে অকেজো হয়ে গেল। তাঁকে কাঁধে বহন করে এখানে-সেখানে আনা-নেওয়ার জন্য দু'জন নিগ্রো ভৃত্য নিয়োজিত হল। এমতাবস্থায় সমুদয় কাজকর্মের পরিচালনার ভার অন্যান্য কর্মকর্তাদের হাতে ন্যস্ত করে তিনি দ্বীপাঞ্চলে বসবাস করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দ্বীপ-দ্বীপান্তরে বসবাস করার পরেও তাঁর রোগ অবনতির দিকে ধাবিত হল এবং ক্রমান্বয়ে সমস্ত শরীর আক্রান্ত হয়ে গেল। পূর্ণাঙ্গ পক্ষাঘাতের ফলে তার শরীরের স্বাভাবিক গঠন বিকৃত হয়ে বাঁকা গঠনের একটি কীটের আকার ধারণ করল। আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রতিশ্রুতি মসীহকে যিনি মশা-মাছিরূপ কীটসদৃশ বলে বিদ্রূপ করেছিলেন আজ তিনি স্বয়ং কীটই হয়ে গেলেন যেন।

এতেই ইতি নয়, শিষ্যদেরকে ডুই সাহেব সর্বদাই মাদকদ্রব্য সেবন হারাম বলে উপদেশ দিতেন, অথচ তদন্ত করে তারই খাস কামরাতে ও প্রাইভেট ষ্টোর রুমে বহু মদের বোতল ও মদ্যভান্ডার আবিষ্কৃত হল। তার প্রথমা স্ত্রী ও ছেলে সাক্ষ্য প্রদান করলেন যে, পাদ্রী ডুই সাহেব চুপিসারে মদ্যপান করতেন। শিষ্যদের কাছে তিনি এরূপ প্রচারমুখরও ছিলেন যে, মুসলমানের মত একাধিক বিবাহ হারাম অথচ শেষ বয়সে প্রেমাসক্ত হয়ে এক যুবতীর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে একজন প্রিয় শিষ্য দ্বারা উল্টো প্রচারণা আরম্ভ করিয়ে দিলেন যে, বিশেষ প্রয়োজনে একাধিক বিবাহ শুধু বৈধই নয় বরং পুণ্যকর্ম। এসব প্রবঞ্চনা ও হঠকারিতা সর্বত্র প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার কারণে অধিকাংশ শিষ্যই প্রকাশ্যে তাকে বর্জন করলেন এবং জিয়ন সিটি গীর্জাতে ভক্তদের উপস্থিতি শোচনীয়ভাবে ভাটা পড়ে গেল। গীর্জার সে বিশালকায় ঘন্টাটির বিকট ধ্বনি যথাসময়েই বেজে উঠত বটে, কিন্তু এদিকে কেহ আর তেমন কর্ণপাত করতেন না। তার স্ত্রী-পুত্র এমনকি তার পিতাও তাকে ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করতে লাগলেন।

এখানেও তার দুঃখের শেষ হল না। এদিকে পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত অবস্থায় দ্বীপ-দ্বীপান্তরের সেনাটারিয়মে থাকাকালীন জিয়ন সিটিতে গড়ে উঠা যাবতীয় শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা ও কল-কারখানাসমূহের কেন্দ্রীয় গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দের ৬ই এপ্রিল, ১৯০৬ সনের সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড স্ক্রুটিনী তথা খতিয়ে লক্ষ্য করা গেল যে, পাদ্রী ডুই সাহেবের কর্মতৎপরতা দুর্নীতিতে ভরপুর। জিয়ন ইন্ডাষ্ট্রির শেয়ার বিক্রীর তহবিল হতে বিশ লক্ষ ডলার আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং মিষ্টি তৈরীর কারখানার শেয়ার বিক্রী বাবদ আমদানীকৃত দেড় লক্ষ ডলারের মধ্যে ১৭,০০০, (সতর হাজার) ডলার ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ লাপাত্তা হয়ে গেছে। সুতরাং, এরূপ মারাত্মক দুর্নীতি ও ধাপ্পাবাজীর দায়ে অভিযুক্ত করে গভর্নিং বডি সর্বসম্মতিক্রমে পাদ্রী ডুই সাহেবকে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব হতে অপসারণ করেন। ডুই সাহেব কর্তৃক বরখাস্তকৃত প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার ওয়ালিওকে যাবতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সর্বেসর্বা পরিচালক নিযুক্ত করা হল। এতেও ডুই সাহেবের অপমান ও যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি হল না। টেলিগ্রামে খবর পেয়ে পাদ্রী ডুই সাহেব পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায়ই চিকাগো কোর্টের জজ মিষ্টার লেনসিস সাহেবের আদালতে ওয়ালিও সাহেবের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করলেন। ১৯০৬ সনের ২৭শে জুন তারিখে মহামান্য জজ লেনসিস সাহেব পাদ্রী ডুইয়ের বিরুদ্ধে এবং ওয়ালিও সাহেবের পক্ষে রায় ঘোষণা করলেন। রায়ে ইহাও ঘোষিত হল যে, জিয়ন সিটির জিয়ন ফান্ড, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহৃত স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পদে পাদ্রী ডুই সাহেবের ব্যক্তিগত মালিকানা বাতিল বলে গণ্য হল এবং জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে গভর্নমেন্ট রিসিভারের নিকট হস্তান্তর করা হল। *

অনুধাবনীয় যে, শান-শওকতে অধিষ্ঠিত এক সময়ের তথাকথিত 'এলিয় পয়গম্বর' যিনি ছিলেন অগাধ ধনসম্পদের একচ্ছত্র ও সার্বভৌম মালিক, আল্লাহ্‌তা'লার প্রত্যাদিষ্ট

* টীকা ঃ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা ১৯৫১ এডিশন দ্রষ্টব্য।

হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর 'ভবিষ্যদ্বাণী' অনুসারে খোদার গযবে নিপতিত হযে আজ তিনি সর্বহারা। তার এ শোচনীয় পরিণতি মৃত্যুর চেয়েও অধিকতর লাঞ্ছনাকর।

'ইসলাম সত্য না খৃষ্টধর্ম সত্য' খোদার নিকট সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক প্রার্থনা দ্বারা যাচাই করে নির্ণয় করার জন্য পাদ্রী ডুই সাহেবের প্রতি হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)- এর চ্যালেঞ্জ ঘোষণার কিছুকাল পরেই পাদ্রী ডুই সাহেবের কিছুটা বুদ্ধি বিপর্যয় ও অপ্রকৃতস্থ হওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা

যায় যে, নিউ ইয়র্কের মহান গীর্জার ভক্তগণকে জিয়ন সিটির গীর্জার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এক মহাসম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় এরূপ ঘটল যে, ডুই সাহেবের কথাবার্তা আগে-পাছে গরমিল ও এলোপাতাড়ি হতে লাগল। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন, অস্পষ্ট ও শ্রুতিকটু ভাষায় কিছু বলছিলেন এবং এক পর্যায়ে তদানীন্তন ইংল্যান্ডের রাজা তথা ভারতসম্রাটের বিরুদ্ধে অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যও করে বসলেন। শ্রোতৃবৃন্দের কাছে এসব অসহনীয় এবং অপ্রিয় হওয়াতে ক্রমান্বয়ে সম্মেলনের হল ছেড়ে তারা চলে যেতে লাগলেন।

বিবিধ পত্রিকার ভাষ্যকারগণ বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন যে, এক সময়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত বক্তা ডুই সাহেবের মুখনিঃসৃত অদ্যকার কর্কশ কথাবার্তা ও অপ্রাসঙ্গিক আস্ফালনগুলো এতই শ্রুতিকটু ছিল যে,তা যেন একটি গো-বৎসের 'হাম্বা' শব্দসদৃশই শুনাচ্ছিল।

(১) পাদ্রী ডুই সাহেবের নিজস্ব ঐতিহাসিক মিষ্টার আর্থার নিউকম সাহেবের লিখিত পুস্তকের ২৫৪ পৃঃ।

(২) নিউ ইয়র্ক আমেরিকান মেগাজিনের ১৯০৩ সনের ১৯শে অক্টোবর সংখ্যা।

অতঃপর তথাকথিত 'এলিয় পয়গম্বর' পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই সাহেব পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত অবস্থায় একটি নগণ্য কীটসদৃশ শরীরটা নিয়েই তার পয়গম্বর হওয়া, খৃষ্টধর্ম গ্রহন না করলে বিশ্বের সারা মুসলমানই হালাক হয়ে যাওয়ার ঘোষণা প্রকাশ, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিশ্রুত মসীহ্ আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর সম্পর্কে তার অবজ্ঞা ও অহঙ্কারসূচক আস্ফালনের ফলাফল কি দাঁড়ায় তা স্বচক্ষে অবলোকন করতে করতে ১৯০৭ সনের ৯ই মার্চ ইহলীলা ত্যাগ করেন।

অপরদিকে ঐ তারিখেই হযরত আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট ইলহাম হলঃ

ہزاروں آدمی تیرے پیروں کے نیچے ہیں -

অর্থাৎ "হাজার হাজার লোক তোমার পাখার নীচে আশ্রয় নিতেছে।"

(১) আমেরিকার 'চিকাগো ট্রিবিউন' ১৯০৭ সনের ১০ই মার্চ সংখ্যায় লিখেছিলঃ

"পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই সাহেব গতকল্য সকাল সাতটা চল্লিশ মিনিটের সময় জিয়ন সিটিস্থ 'শেল হাউজে' মৃত্যুবরণ করেছেন। ঐ সময়ে তার পরিবারের কোন

সদস্যই কাছে ছিল না। তার মৃত্যুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সরকারী রিসিভার মিষ্টার জন হার্টলের উপস্থিতিতে মৃত ডুই সাহেবের সুপ্রতিষ্ঠিত বাসগৃহটি, তার মূল্যবান তৈজসপত্র এবং সমুদয় গৃহস্থালী দ্রব্য সরকার কর্তৃক 'সিজ' হয়ে জিয়ন সিটির পাওনাদারদের নামে বরাদ্দ হয়ে যায়।

অতঃপর এ পত্রিকাটির ১২ই মার্চ সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে ইহাও উল্লেখ করা হয়েছিলঃ

"পাদ্রী ডুই সাহেবের মৃত্যুর পর আমেরিকার সাধারণ রেওয়াজ মোতাবেক তদীয় পিতা, স্ত্রী বা ছেলের নিকট হতে এমন কি অন্য কারও নিকট থেকে কোন একটি শোকবাণীও আসেনি।"

(২) 'ইন্‌ডিপেনডেন্ট' ম্যাগাজিনের ১৯০৭ সনের ১৪ই মার্চ সংখ্যার সম্পাদকীয় কলামে ডুইয়ের মৃত্যুর পরে খবর পরিবেশিত হয়েছিলঃ

"তিনি (পাদ্রী ডুই সাহেব) তার ব্যক্তিগত মতবাদ এবং ধনসম্পদের প্রাচুর্যের প্রভাব মানুষের চক্ষুকে ঝলসিয়ে দিতেন। তিনি ঐশ্বর্যের চূড়ান্ত স্তরে পৌছেছিলেন। কিন্তু সহসা তিনি অধঃপতিত হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী-পুত্র এবং তার স্বপ্রতিষ্ঠিত চার্চ ইত্যাদি সকলেই তাকে বর্জন করলেন। তার তথাকথিত পয়গম্বরী মর্যাদা জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য এমনই রং-বেরঙ্গের বিচিত্র লেবাস তৈরী করে রেখেছিলেন, যা এমন কি পয়গম্বর ইউসুফ বা পয়গম্বর হারূন কখনও পরিধান করেননি।

(৩) নিউ ইয়র্ক হতে প্রকাশিত পত্রিকা Truth Seeker-এর ১৯০৭ সনের ১৫ই জুন সংখ্যার অভিমতঃ

"প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবীকারক ভারতের মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বয়সের দিক থেকে পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই সাহেব হতে ১৫ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ এবং রোগগ্রস্থ ব্যক্তি। দ্বিতীয়তঃ তিনি হলেন প্লেগ-মহামারীপূর্ণ একটা ধর্মান্ধ দেশের অধিবাসী। এক কথায় তিনি হলেন বিপন্ন জীবন যাপনকারী। অপর দিকে পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই ছিলেন একজন স্বল্পবয়সী, স্বাস্থ্যবান, সবল এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। সুতরাং, সঙ্গতভাবে তিনি একজন দীর্ঘায়ু প্রত্যাশী ব্যক্তি ছিলেন।

এমতাবস্থায় পাদ্রী ডুইকে সম্বোধন করে এ ধরনের জীবনমরণ প্রশ্ন উঠার মত একটা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে দেওয়া মির্যা সাহেবের মত লোকের জন্য ছিল অত্যধিক ভীতিপ্রদ ব্যাপার। তথাপি শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক ডুইয়ের মৃত্যুতে তিনিই জয়ী হলেন।"

(৪) আমেরিকার বোষ্টনে হ্যারল্ড পত্রিকার Sunday Edition ১৯০৭ সনের ২৩শে জুন সংখ্যায় পাদ্রী ডুই সাহেবের মৃত্যুর পর এক গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিলঃ

'Great is Mirza Gulam Ahmad,The Messiah'. He foretold pathetic end of Dowie and now he predicts Plague, Flood and Earth quake.

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাথে মোবাহালার সময়ের এবং তারপর ঐশী শাস্তি পাওয়ার পরে ডঃ জন আলেকজাণ্ডার ডুই

উক্ত পত্রিকাটির ১৯০৭ সনের ২৩শে জুন সংখ্যাতে হযরত মির্যা সাহেবের ১৯০৩ সনের ২৩শে আগষ্ট তারিখের 'মোবাহালা' চ্যালেঞ্জের পূর্ণ বিবরণটিও ছাপা হয়েছিল।*

অবশেষে নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীকারক আলেকজান্ডার ডুইয়ের পতন সম্পর্কে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর প্রখ্যাত কেতাব 'হাকীকাতুল ওহী' হতে একটি মূল্যবান উদ্ধৃতির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উক্ত কেতাবের তাতিম্মা ৭৭ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেনঃ "আমার অভ্যুদয়ের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে সলীবকে তথা ক্রুশীয় মতবাদকে ধ্বংস করা। সুতরাং, পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুইয়ের (আমার ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সলীবের একটি বিরাট অংশ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।"

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাথে মোবাহালার সময়ের এবং তারপর ঐশী শাস্তি পাওয়ার পরে ডঃ জন আলেকজান্ডার ডুই

"সুতরাং আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে ঘোষণা করছি যে, আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর হাতে খিনজির কতল হওয়ার ব্যাপারে আঁ হযরত (সাঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই সাহেবই সে খিনজির তথা নিকৃষ্ট শূকরস্বভাববিশিষ্ট লোক।"

অবশেষে তৌহীদেরই বিজয় হবে এবং মিথ্যা উপাস্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেঃ

"আমার সর্বশক্তিমান খোদা ও মৌলা যদি বার বার আমাকে এরূপ সান্ত্বনা না দিতেন যে,অবশেষে তৌহীদেরই বিজয় হবে এবং মিথ্যা উপাস্য ধ্বংস হবে, তাহলে কোন সময় হয়ত এমনও ঘটে যেত যে, এ চিন্তায় অধীর হয়ে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। আল্লাহ্ আমাকে জ্ঞাত করেছেন, অবশেষে নতুন জমীন ও নতুন আকাশ সৃষ্টি হবে। পাশ্চাত্য হতে সত্যের সূর্য উদীয়মান হওয়ার দিন অত্যাসন্ন এবং ইউরোপবাসী সেদিন প্রকৃত খোদার সন্ধান পাবে। অতঃপর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।" – (তাযকেরাঃ ২৮৫পৃঃ)

---

* টীকাঃ পত্রিকাটির সম্পাদীয় নিবন্ধ লেখক উৎসাহের সাথে পাদ্রী ডুইয়ের পরিণতি সম্পর্কে হযরত আকদস (আঃ) প্রণীত কেতাব 'হাকীকাতুল ওহী -এর ২৫৬-৫৭ পৃষ্ঠাতে লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ বিবরণটিও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন।

জিয়ন সিটিতে আহমদীয়া মসজিদ ও মিশন হাউজ

পাদ্রী ডুই প্রতিষ্ঠিত জিয়ন সিটি সম্পর্কে বদর পত্রিকায় ১৯৪৮ সনের ১৩ই ডিসেম্বর সংখ্যায় নিম্নলিখিত খবর পরিবেশিত হয়ঃ

কাদিয়ান শহরে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম (আঃ)-এর সঙ্গে পরস্পরের ধর্মীয় মতবাদে কে সত্য কে মিথ্যা তা যাচাই করার নিমিত্ত প্রার্থনা প্রতিযোগিতা সংগ্রামে তথা মোবাহালাতে নেমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জিয়ন সিটির প্রতিষ্ঠাতা পাদ্রী আলেকজান্ডার ডুই আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত হয়ে ১৯০৭ সলে পরলোক গমন করেন। উক্ত জিয়ন সিটি শহরটির অস্তিত্ব থাকলেও 'জেনারেল ওভারসিয়ারের' মতবাদের জন্য বিশেষ গীর্জা হিসেবে তথা 'চার্চ অব জিয়ন সিটির ' লেশমাত্রও বৈশিষ্ট্য নেই। স্বপ্রতিষ্ঠিত এ শহরেই পাদ্রী ডুই সাহেবের কবর বিদ্যমান। শহরের বর্তমান অধিবাসীদের কেউই এখন হয়ত আর ডুই সাহেবের নামও জানে না। তবে আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে এ শহরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইদানিং ঐ শহরটিরই কেন্দ্রস্থলে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ত্রিশ হাজার ডলার ব্যয় করে একটি আহমদীয়া মসজিদ ও একটি মিশন হাউজ স্থাপিত হয়েছে। জিব্রাইল রোডের এক সমৃদ্ধশালী মমোরম স্থানে অবস্থিত জিয়ন সিটির এ সর্বপ্রথম মসজিদ হতে দৈনিক পাঁচবার আযান দেওয়া হচ্ছে। এক আল্লাহ্‌র ইবাদত হচ্ছে।

মিঃ পিগটের পরিণতি

১৯০২ সালে ধর্মযাজক রেভাঃ জন হুগ স্মিথ পিগট লন্ডনের ক্লাপটনে 'আর্ক অব কনভেন্ট' ডেকে ঘোষণা করেন যে, তিনিই মসীহ, খোদা পুত্র, যিনি খোদার প্রতিশ্রুতি মত আকাশ থেকে নাযেল হয়েছেন।

তিনি বললেনঃ আমি সেই একই যীশুখৃষ্ট যিনি ক্রুশে মৃত্যুর পর কবর হতে পুনরুত্থিত হয়ে আকাশে চলে গিয়েছিলেন। এ দাবী শুনে সমবেত জনতা অশ্রু সজল নয়নে নতজানু হয়ে তার উপাসনা করে। তার এ ঘোষণা পত্রিকাদিতে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পায়, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। অবশ্য তার দাবীর বিরুদ্ধেও ঝড় ওঠে।

রেভাঃ পিগটের জন্ম ১৮৫২ সালে। ১৮৮২-তে তিনি 'চার্চ অব ইংল্যান্ডের' যাজকের পদে যোগদান করেন। ১৮৯২ সালে হেনরী জেমস্ প্রিন্স নামে এক ব্যক্তি ক্লাপটনে একটি গীর্জা নির্মাণ করেন ও পিগটকে প্রতি রবিবার প্রচারের জন্য নিমন্ত্রণ জানান। প্রিন্স ১৮৯৯ সালে মারা যান। এর পর মিঃ পিগটের ধর্মীয় উপদেশ ও বক্তৃতাদি একটি নির্দিষ্ট খাতে বইতে থাকে। তিনি জোরেশোরে বলতেন, যীশু খৃষ্টের দ্বিতীয় আগমন অতি সন্নিকট, এমনকি তিনি জনমনকে প্রস্তুত করে ঘোষণা করেন যে,

হেনরী জেমস্ প্রিন্স মসীহ্‌র আগমনবার্তা বাহকরূপে এসেছিলেন এবং তিনি নিজেই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও খোদা যিনি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

তার দাবীর খবর পেয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর একজন অনুগামী ডঃ মুফতী মোহাম্মদ সাদেক তাকে কাদিয়ানে আবির্ভূত সত্য মসীহকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান। মিঃ পিগট এ আহ্বানকে অবজ্ঞা করে নিজের খোদায়ী দাবীর ঘোষণা চালিয়েই যেতে থাকেন।

তখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) মিঃ পিগটকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন যে, তিনি যদি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ্ তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন এবং তার দাবী যে মিথ্যা তা দুনিয়ার সামনে প্রমাণিত হবে। 'দি সানডে সার্কেলের' ১৪ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় চ্যালেঞ্জটি প্রকাশিত হয়।

মিঃ পিগট এতে কোনই সাড়া দেননি এবং পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন। আর কখনও তিনি তার দাবীর পুনরুল্লেখ করেননি। তিনি গ্রামের বাড়ী সোমারসেটে চলে যান। অতঃপর তিনি বিস্মৃতির অতলে ডুবে যান। তবে আল্লাহ্‌র গযব হতে তিনি রেহাই পাননি। প্রমাণিত হয় যে, তিনি যৌন অনাচারে লিপ্ত ছিলেন। নানা কেলেংকারীর কারণে তাকে গীর্জার যাজকের দায়িত্ব হতে বহিস্কৃত করা হয়। এমনিভাবে তথাকথিত 'মসীহ ও খোদা'-এর কলুষিত ও গযবপ্রাপ্ত জীবনের চির অবসান ঘটে। খোদার নামে মিথ্যা দাবীদারের পরিণতি এড়াতে পারে সাধ্য কার!

শুদ্ধি আন্দোলন

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আর্য সমাজী পন্ডিতদের ইসলাম বিরোধী বিষময় প্রচারের পরিকল্পনা এবং মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করে বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য 'শুদ্ধি আন্দোলন' নামক একটি শক্তিশালী আন্দোলন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

উপমহাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আর্য সমাজীরা ছিলেন জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে অগ্রসর। দেশের যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরে ছিল তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ।

মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে আর্য সমাজীরা পন্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী নামক একজন প্রখ্যাত পন্ডিতের নেতৃত্বাধীনে ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন যা 'শুদ্ধি আন্দোলন' বলে খ্যাত। শুদ্ধি আন্দোলনের তৎপরতা হিসেবে আর্য সমাজীদের পক্ষ হতে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে লক্ষাধিক পুস্তক, প্যাম্ফলেট, প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। মুসলমানদেরকে তথকথিত ম্লেচ্ছতা হতে শুদ্ধি করে তথা ইসলাম ত্যাগ করিয়ে আর্যদের বৈদিক ধর্মগ্রহণ করার জন্য উপমহাদেশের বড় বড় শহর (লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, বোম্বে, মাদ্রাজ, আলিগড় ইত্যাদি) তাদের

প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ঐ সময়ে আর্যসমাজী পন্ডিতগণ বিভিন্ন স্থানে মুসলমান উলামাদের সঙ্গে প্রায়ই বহস-মোবাহাসার মাধ্যমে ইসলামের উপর তাদের আগ্রাসনের তোড়জোর চালাতেন। এর খবরাদি তাদের পত্রিকাতেও প্রকাশ পেত। 'মহাশয় দেওদত্ত' নামক একজন প্রখ্যাত আর্যসমাজী পন্ডিত কর্তৃক প্রণীত 'আরিয়া সামাজ আওর পারচারকে সাধনা' নামক পুস্তক পাঠ করলে এ সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যায়। পন্ডিত মহাশয় উক্ত পুস্তকের ১২ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

"স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আজমীর থেকে রওয়ানা হয়ে চাঁদপুর পৌছুলেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে এক জবরদস্ত মোনাযেরা করলেন। মুসলমানদের পক্ষ হতে মৌলভী মোহাম্মদ কাসেম সাহেব নানোতভী (দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা) এবং মৌলভী আবু মনসুর নাসেরুদ্দিন সাহেব পেশ হলেন। তাঁদের সাহায্যকল্পে আরও বহু মৌলভী-মৌলানা সভাতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু স্বামীজী, মহারাজের সঙ্গে ছিলেন মাত্র দুইজন সহচর, একজন ছিলেন মুনশী বখতাওয়ার সিং এবং অপরজন ছিলেন মুনশী ইন্দ্রমন মোরাদাবাদী। স্বামীজী তাদের উপর ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি অভিযোগের এমনই এক তুফান বইয়ে দিলেন যে, কোন মৌলভী সাহেবই পন্ডিতজী মহারাজের উপস্থাপিত আপত্তিসমূহের কোন উত্তর দিতে সমর্থ হলেন না এবং ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।"

এ শোচনীয় পরাজয়ের ফল দাঁড়াল যে, মৌলভী নুরুল্লাহ্ সাহেব নামক জনৈক আলেম আরও কতিপয় মুসলমান সঙ্গীসহ আর্য সমাজীদের বৈদিক ধর্মে শুদ্ধি হয়ে গেলেন অর্থাৎ মুর্তাদ হয়ে হিন্দু হয়ে গেলেন এবং সে সময় হতে শুরু করে পরবর্তী কিছুকালের মধ্যে আরও প্রায় সহস্রাধিক মুসলমান আর্য সমাজভুক্ত হয়েছিলেন। আর্য সমাজী বীরগণ এবার 'শুদ্ধি সভা' নামক একটি সক্রিয় সংগঠন কায়েম করলেন এবং স্থানে স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করে ব্যাপক আকারে 'শুদ্ধি সভার' প্রচারাভিযান চালাতে লাগলেন।

অতঃপর ১৮৭৭ সনে পন্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় উপমহাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এক জোরালো ঘোষণা করলেন 'বৈদিক ধর্মই' পৃথিবীর একমাত্র সত্য ধর্ম এবং 'বেদই' একমাত্র 'ঐশী পুস্তক' এবং কোরআন একটি মিথ্যা পুস্তক (নাউযুবিল্লাহ্) এবং (হযরত) মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর ওহী-এলহাম প্রাপ্তির দাবীসমূহও (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যা এবং ভন্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামের জন্য এমনই এক দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আর্য সমাজীদের বিষময় প্রচারের বিরুদ্ধে ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য একমাত্র মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ব্যতীত আর কোন উল্লেযোগ্য ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবীর বহু পূর্ব হতেই ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেব (আঃ) লেখনি ধারণ করেছিলেন এবং ইসলামের সপক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিসমূহ খন্ডন করে 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রণয়ন করেন (১৮৮০-৮৪) যা তখন ৪র্থ খন্ডে সমাপ্ত হয়েছিল। আর্য সমাজীদের বিরুদ্ধে তিনি অকাট্য যুক্তি পেশ করলেন এবং এতদ্বিষয়ে (১) সুরমায়ে চশ্‌মে আরিয়া, (২) চশমায়ে মারেফাত, (৩) শাহনায়ে হক, (৪) নাসীমে দাওয়াত, (৫) সনাতন ধরম, (৬) কাদিয়ানকে আরিয়া

আও হাম, ইত্যাদি মূল্যবান পুস্তকাদি লিপিবদ্ধ করে উপমহাদেশে ইসলামের সপক্ষে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে সক্ষম হলেন। তিনি ঘোষণা করলেনঃ "ইসলামই একমাত্র সত্য ও জিন্দা ধর্ম এবং কোরআন শরীফই একমাত্র জিন্দা কেতাব ও মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-ই একমাত্র জিন্দা নবী।" তাঁর এ ঘোষণাবাণীর সত্য-মিথ্যাকে যাচাই করে দেখার জন্য তিনি দয়ানন্দ সরস্বতীসহ এ উপমহাদেশের সমস্ত আর্যসমাজী পন্ডিতদেরকে চ্যালেঞ্জ করে আহ্বান করলেনঃ "আপনারা আমার মোকাবেলায় আসুন ও আপন আপন ধর্মের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য আমার সঙ্গে যুক্তি ও দলিলের প্রতিযোগিতা করুন।"

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইসলামের সপক্ষে তাঁর রচিত পুস্তকাবলী আর্যসমাজী বিশিষ্ট নেতৃবর্গের প্রত্যেকের নামে ডাকযোগে প্রেরণ করেছিলেন। এসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যেমনঃ (১) বাবা নারায়ণ সিং, সেক্রেটারী, আরিয়া সমাজ, অমৃতসর, (২) লালা জীবনদাস, সেক্রেটারী, আরিয়া সমাজ, লাহোর, (৩) মুনশী ইন্দ্রমন মোরাদাবাদী, (৪) পন্ডিত লেখরাম পেশোয়ারী, (৫) লালা মুরলি ধর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

'ইসলাম সত্য নাকি বৈদিক ধর্ম সত্য' এতদ্বিষয়ে লালা মুরলি ধরের সঙ্গে হুসিয়ারপুর শহরে হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর এক বিরাট মোনাযেরা হয়েছিল। উক্ত মোবাহাসার পূর্ণ বিবরণ 'সুরমায়ে চশ্‌মে আরিয়া' নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধর্মকে একমাত্র আলমগীর (বিশ্ব বিজয়ী) ধর্ম ও সত্যধর্ম হিসেবে যে মতবাদ জগদ্বাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন তা নিম্নোল্লিখিত চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলঃ

(১) প্রথম স্তম্ভ ঃ ইহাই আর্য সমাজীদের প্রধান আকিদা যে, আদিকাল থেকে খোদাতা'লার ইলহাম অবতরণ কেবল আর্যাবর্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে এবং অন্যসব কওম বা জাতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকবে।

এ-ও তাদের আকিদা যে, 'বেদই' একমাত্র এরূপ একটি ঐশী কেতাব, আদিকাল থেকেই যা মানবগোষ্ঠির পথ প্রদর্শনের জন্য প্রদান করা হয়েছে। জগতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একমাত্র 'বেদই' বিরাজমান থাকবে। 'বেদ' অবতীর্ণ হওয়ার পর হতে ইলহামের তথা ঐশীবাণী বা দৈববাণীর সিলসিলা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। তারা এরূপ ধারণাও পোষণ করেন যে, ঐ পুস্তকই একমাত্র ঐশী পুস্তক বলে গণ্য হতে পারে যা নাযিল হয়েছিল জগত সৃষ্টির প্রারম্ভকালে।

(২) দ্বিতীয় স্তম্ভ ঃ আর্য সমাজীদের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে 'আওয়াগণ', অর্থাৎ 'পুনর্জন্মবাদ' যাকে বলা হয় 'মসালায়ে তানাসুখ'। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস হচ্ছে যে, নিজ নিজ আমলের প্রেক্ষিতে 'রূহ' তথা মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্নরূপে জন্মধারণ করে থাকেন। কোন মানুষ পুণ্যকর্ম করলে তাঁর রূহ বা আত্মা পুনরায় উত্তম জন্ম লাভ করে আর পাপকর্ম করে মৃত্যুলাভ করলে পুনরায় খারাপ ও নিকৃষ্ট প্রাণীরূপে জন্ম নেয় এবং এরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আবহমানকাল থেকেই অব্যাহত গতিতে চলে আসছে এবং চলতে থাকবে।

আর্য সমাজীদের বিশ্বাস হচ্ছে যে, এ পৃথিবীর সীমাবদ্ধ জীবনের সৎকর্মের ফলে অনন্তকালের জন্য পুরস্কৃত হতে পারে না। বরং পুরস্কৃত হবে সাময়িক সীমাবদ্ধ কালের জন্য। এ আকিদা মোতাবেক তারা বিশ্বাস করেন যে, কোন মানুষই চিরতরে বেহেশ্‌তবাসী হওয়ার যোগ্য নহে।

বস্তুতঃ তাদের এ আকিদা দ্বারা ইহাই প্রমাণ করতে প্রয়াশ পাচ্ছে যে, মানুষের পাপসমূহকে আল্লাহ্‌তা'লা ক্ষমা করতে সক্ষম নহেন (নাউযুবিল্লাহ্)। পাপকর্ম সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে সত্যিকার খাঁটি তওবা করলেও ন্যায়-বিচারক হিসেবে খোদা তার পাপের জন্য তাকে শাস্তি দিতে বাধ্য।

(৩) তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে যে, আরিয়া তথা আর্য সমাজীদের আকিদা অনুযায়ী 'রূহ' এবং 'মাদ্দাহ্'-এর (আত্মা ও অণু) সৃষ্টিকর্তা খোদা নন। বরং রূহ এবং মাদ্দাহ্ খোদারই মত স্বয়ং সৃষ্ট তথা স্বয়ম্ভু এবং তারাও খোদার মতই অনাদি-অনন্তকাল থেকেই চলে আসছে। আত্মা ও উপকরণসমূহকে আল্লাহ্‌তা'লা নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং এগুলোকে বিভিন্নরূপে ব্যবহার করে সৃষ্টির কারখানা পরিচালনা করছেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় ইহাও লিখেছেনঃ "আত্মা অগণিত সংখ্যক এমন কি স্বয়ং পরমেশ্বরও উহাদের প্রকৃত সংখ্যা অবগত নহেন।"

(৪) চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে 'নিয়োগ' (نیوگ) প্রথার প্রচলন। অর্থাৎ এ প্রথাটি অবলম্বন করে বংশরক্ষা বা বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করে সমাজকে পরিচালনা করাটাও আর্য সমাজীদের ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। উহার অর্থ হলো যে, স্বাভাবিক বৈধ যৌনক্রিয়ার ফলে যদি কোন হিন্দু দম্পতির সন্তান না জন্মে তবে বৈদিক ধর্মের রীতি অনুযায়ী অন্য কোন স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী পুরুষের সঙ্গে যৌনসঙ্গম ঘটিয়ে স্বামীর বংশ রক্ষার খাতিরে স্ত্রী সন্তান জন্মাতে পারে এবং এ কাজটি ঐ গৃহিণীর জন্য একটা মহা পুণ্যের কাজ বলে গণ্য হবে। এমন কি, এরূপ জঘন্য ব্যভিচার দ্বারা ৯টি পর্যন্ত সন্তান জন্মান বৈদিক ধর্মমতে বিধিসঙ্গত বলে বিবেচিত হবে।

হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) আর্য সমাজীদের উপরোল্লিখিত ঘৃণ্য ধর্মবিশ্বাস-সমূহকে ইসলামের আলোকে বিভিন্নভাবে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা খন্ডন করেন এবং বৈদিক ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেন।

আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) দয়ানন্দ সরস্বতীকে পরস্পরের মতবাদের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্যও চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। কিন্তু পন্ডিতজী ঐ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে সাহস পাননি। এ সম্পর্কে ইসলামের পক্ষ হতে মির্যা সাহেবের (আঃ) পেশকৃত অকাট্য যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ, জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, পুস্তক ও প্রকাশনাদি প্রকাশিত হওয়ার পর স্বভাবতঃ আর্য সমাজীদের মধ্যে এক মহা প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এমন কি কোন কোন বিশিষ্ট আর্য সমাজী পন্ডিত তাদের প্রচলিত কু-প্রথাসমূহের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতেও কুন্ঠিত হননি। যেমন ঃ

(১) পন্ডিত দেওদত্তজী নামক একজন বিশিষ্ট আর্য সমাজী নেতা স্বীয় প্রণীত পুস্তক 'আরিয়া সমাজ আওর পারাচারকে সাধনার' ১২পৃষ্ঠায় এরূপ লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ

"مرزا غلام احمد نے اس درگھٹنا سے پورا پورا فائدہ
اٹھایا ہے۔ اور آریوں کے خلاف ایسا زہریلا لٹریچر لکھا
کہ جس نے مسلمانوں کے دلوں میں آریہ دھرم کے متعلق
بہت نفرت پیدا کر دی۔"

—(آریہ سماج اور پرچار کے سادھنا – ص ۱۲)

—(مولفہ مہاشہ دیو دت جی)

অনুবাদ ঃ "এ দুর্ঘটনার ফলে মির্যা গোলাম আহমদ পুরাপুরি ফায়দা উঠালেন এবং আর্য সমাজী মতবাদকে সমালোচনা করে এরূপ বিষাক্ত লিটারেচারের প্রকাশনা করতে লাগলেন যদ্দারা এমনই এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল যে, মুসলমানদের দিলে আর্য ধর্ম সম্পর্কে কঠোর ঘৃণা সৃষ্টি হল।"

(২) বস্তুতঃ আর্য সমাজীদের দুর্গে হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর অকাট্য যুক্তিরূপ প্রচন্ড গোলাবর্ষণের ফলশ্রুতিতে 'মুসলমানদেরকে শুদ্ধিকরণ' কর্মসূচীতে ভাটা পড়ে গেল। এমনকি তাদের মধ্য হতে শুদ্ধিকরণ কার্যে রত কিছুসংখ্যক উৎসাহী কর্মীবৃন্দও সরস্বতীর মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে লাগলেন। এরূপ লোকদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন কর্মী, 'পন্ডিত লালাজীবন দাস', সেক্রেটারী, আরিয়া সমাজ, লাহোর অন্যতম ছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের মতাদর্শ সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচার করতে লাগলেন যে, 'আর্য সমাজীরা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে ওয়াযিবুল এতায়াত (অবশ্যমান্য) নেতা হিসেবে বিশ্বাস করেন না। এ জন্যই ইহা অবশ্য কর্তব্য নহে যে, আর্য সমাজী লোকেরা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর যাবতীয় মতবাদেই বিশ্বাস পোষণ করবে।" —(হায়াতুন্নবী পুস্তক)

(৩) এরূপ আরও একজন বিশিষ্ট আর্য সমাজী 'জীবন ধরম' নামক একটি মাসিক পত্রিকার ১৮৮৬ সনের ১৫ই জুলাই সংখ্যায় লিখেছেনঃ

"পন্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী সাহেব এখান থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আকার-ঈঙ্গিতে কোন কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম সমাজীকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে, এখন থেকে বেদের উপর আমার আর বিশ্বাস নেই।"

(৪) আর্য সমাজীদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহকে বাতিল প্রমাণিত করার জন্য মির্যা সাহেবের স্বচ্ছ যুক্তির ধারাল অস্ত্রাঘাতের ফলে এমনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল যে, এমনকি

স্বয়ং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় 'কাদামাতে রূহ ও মাদ্দাহ্' অর্থাৎ খোদার মতই আত্মা এবং পরমাণুসমূহের অনাদি ও অনন্ত হওয়া সম্পর্কীয় স্বীয় আকিদাটিও প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পন্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী নামক জনৈক প্রখ্যাত পন্ডিত যিনি 'বেরাদরে হিন্দ' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তিনি এ সম্পর্কে তাঁর পত্রিকায় 'মির্যা গোলাম আহমদ, রইসে কাদিয়ান, আওর আরিয়া সমাজ' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, "মির্যা সাহেব যখন কাদামাতে রূহ ও মাদ্দাহ্র আকিদাকে মিথ্যা, বাতেল, অবান্তর ও অসার বলে প্রমাণ করে দিলেন তখন দয়ানন্দ সরস্বতী লাচার হয়ে মির্যা সাহেবকে পয়গাম পাঠিয়ে অবহিত করলেন যে, এ সম্পর্কে তিনি তার পূর্ব বিশ্বাস প্রত্যাহার করছেন ও স্বীকার করছেন যে 'রূহ ও মাদ্দাহ্' খোদাতা'লার মত অনাদি-অনন্ত নহে। তবে নাসুখের (পুনর্জন্মবাদ) আকিদার উপর তার বিশ্বাস বলবৎ রয়েছে।"

– ('বেরাদারে হিন্দ' পত্রিকার ১৮৭৮ সনের জুলাই সংখ্যা)

(৫) এতদ্ব্যতিরেকে আর্যসমাজীদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনের আরও একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে যে, হযরত মির্যা সাহেবের অকাট্য যুক্তির মোকাবেলায় এমনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল যে, নারায়ণ সিংহ নামক আর্যসমাজের একজন উল্লেখযোগ্য সক্রিয় কর্মী যিনি অমৃতসরে সেক্রেটারী আরিয়া সমাজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনিও শেষ পর্যন্ত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের গোটা মতবাদটিই পরিত্যাগ করে স্বীয় সাবেক মযহাবেই ফিরে গেলেন।

এসব ঘটনা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সপক্ষে পেশকৃত মির্যা আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর আকিদার বিজয় ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

প্রখ্যাত মনীষীদের দৃষ্টিতে আহ্মদীয়াত

(১) বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং চিন্তবিদ স্যার আর্ন্যল্ড টয়েনবী সাহেব প্রণীত 'The Civilization On Trial' নামক বিখ্যাত পুস্তকে আহমদীয়া মুভমেন্ট সম্পর্কে তিনি লিখেছেনঃ

"বর্তমান জড়বাদিতার যুগে ধর্মীয় জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ শূন্যতাকে কেবল ঐ ধর্মই পূরণ করতে সক্ষম হবে, যে ধর্ম আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান। বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষের ফলে এযুগে ইসলামের মধ্যে পুনরায় আকর্ষণীয় নবজাগরণের লক্ষণসমূহ সহ এমনই হৃদয়গ্রাহী এক রূহানী আন্দোলনের জন্ম নিচ্ছে যে,অদূর ভবিষ্যতে উহাদের মাধ্যমেই দুনিয়াতে এক আলমগীর মযহাব (বিশ্ব বিজয়ী ধর্ম) অথবা তাহযীবের সৃষ্টি হবে। উক্ত আন্দোলনসমূহের মধ্যে বর্তমান আহমদীয়া মুভমেন্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

উক্ত পুস্তকে তিনি ইহাও লিখেছেনঃ "কেউ কেউ হয়ত আমার এ ধারণাকে উড়িয়ে দিতে চাইবে; কেননা, শক্তি ও সংখ্যার দিক থেকে এখনও 'আহমদীয়া মুভমেন্ট'কে

খুবই নগণ্য দেখাচ্ছে। কিন্তু জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, আন্দোলনের উৎস কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি, পরিণামে তা-ই জয়যুক্ত হয়েছে।"

(২) লাহোর ফরম্যান কৃশ্চিয়ান কলেজে প্রাক্তন অধ্যক্ষ **মিষ্টার লোকাস সাহেব**, ওয়াই. এম. সি. এ. সংস্থার সেক্রেটারী **মিঃ ওয়াল্টার সাহেব** এবং হিউম সাহেব নামক প্রখ্যাত পাদ্রী সামভিব্যহারে একবার কাদিয়ান ভ্রমণ সমাপনান্তে বিশ্ব সফরে বের হলেন। বিশ্ব সফরাবস্থায় শ্রীলঙ্কায় থাকাকালীন এক বিরাট ধর্মীয় সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে মিস্টার লোকাস সাহেব অভিমত ব্যক্ত করেন; ভুলবশতঃ খৃষ্টজগত এরূপ চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন যে, মিশরের কায়রো অথবা অন্য কোন মুসলমান দেশে ইসলামের সঙ্গে খৃষ্টানদের মোকাবিলা হবে; তাঁদের এরূপ ধারণা সম্পূর্ণরূপে অলীক ও ভিত্তিহীন। কেননা, সবেমাত্র এমন ধরনের একটি ক্ষুদ্র ও নগণ্য গ্রাম হতে আমি ভ্রমণ করে এসেছি। যেখানে না আছে কোন রেল বা টেলিযোগাযোগ, আর না আছে কোন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। **কিন্তু সরেজমিনে, আমরা স্বচক্ষে সেখানে যা কিছু অবলোকন করতে পেরেছি, এর পরে আমি এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে, ভবিষ্যতে বিশ্বধর্ম বলতে কৃশ্চিয়ানিটি হবে না ইসলাম হবে, উহার চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য মিশর, শ্যাম, প্যালেষ্টাইন বা অন্য কোন মুসলিম দেশের কুত্রাপি কোন ধর্মীয় সংগ্রাম সংঘটিত হবে না; বরং এতদ্বিষয়ে চরম ফয়সালা একমাত্র সে গন্ডগ্রাম কাদিয়ানেই সংঘটিত হবে।"**

(১) ১৯৫৬ সনের 'সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট' লাহোর।

(২) ১৯৫৬ সনের দৈনিক আল্-ফযল ১৯শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যাঃ ১২ পৃঃ।

(৩) আহমদীয়া জামাতের শুধু মহিলাদের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত হয় হল্যান্ডের রাজধানী হেগ শহরে সর্বপ্রথম মসজিদটি। আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা ও মুসলেহ মাওউদ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) যখন তা উদ্বোধন করেছিলেন, তখন 'DEMORIEN' নামক হেগের বিখ্যাত ক্যাথলিক চার্চের একটি পত্রিকায় আহমদীয়া মসজিদের ফটোসহ আযানের 'মিনারটির' দিকে ইঙ্গিত করে লিখেছিলেনঃ 'ছবিতে যে উচ্চ মিনার পরিদৃষ্ট হচ্ছে উহা মিশরে কায়রো বা ভারতের দিল্লীর কোন মসজিদের 'মিনার' নহে; **বরং ইহা আমাদেরই দেশে হেগ নগরীতে আহমদীয়া জামাতের দ্বারা সদ্যনির্মিত মসজিদেরই মিনার**। আমাদের দেশে এরূপ মসজিদ নির্মাণের মানে হচ্ছে আমাদের ক্যাথলিক চার্চের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া ইতোপূর্বেও ইসলাম দুই-দুই বার ইউরোপে আক্রমণ চালিয়েছিল। প্রথম আক্রমণ হয়েছিল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন তারা ছিল স্পেনের হর্তাকর্তা। আর দ্বিতীয় আক্রমণ চালিয়েছিল তুরস্কের মুসলমানরা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। উভয় আক্রমণই চালিয়েছিল তরবারি দ্বারা এবং ওয়ারশ পর্যন্ত তারা পৌঁছেও গিয়েছিল। এ দু'টি প্রচন্ড আক্রমণই আমরা প্রতিহত করেছি এবং ইউরোপ হতে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করেছি। কিন্তু আহমদীয়া মুভমেন্টের মাধ্যমে বর্তমানে মুসলমানরা ইউরোপে যে

অভিযান চালিয়েছে উহা হচ্ছে একটি নিছক রূহানী আক্রমণ, বাহ্যিকভাবে তরবারির আক্রমণ নহে।

বর্তমান খৃষ্টানদের মধ্যে যদি আধ্যাত্মিক কোন শক্তি থেকে থাকে তবে একমাত্র সে আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই ইসলামের এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হতে পারে-অন্যথায় নহে। কিন্তু আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে যে, এ রূহানী হামলার মোকাবেলা করা আমাদের চার্চের ক্ষমতার বহির্ভূত।

(৪) ডক্টর এস. এম. জুরেমার এবং পাদ্রী মিঃ ক্রিমার আমেরিকার বিখ্যাত দুই ধর্মযাজক ১৯৩১ সনে ভারতে আগমন করেন। তাঁরা উভয়ে 'কাদিয়ান' ভ্রমণ করেন। সেখানে তাঁরা কিছুকাল অবস্থান করে আহমদীয়া জামাতের যাবতীয় কর্মকান্ড স্বচক্ষে দেখে সরেজমিনে সবকিছু অবগত হন।

অতঃপর স্বদেশে ফিরে গিয়ে আমেরিকার 'মোসলেম ওয়ার্ল্ড ও 'চার্চ মিশনারী' রিভিও (লন্ডন)' নামক তাঁদের নিজস্ব পত্রিকাদ্বয়ে কাদিয়ান ভ্রমণ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত নিবন্ধে তাঁরা ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে আহমদীয়া জামাতের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ত্যাগ-তিতীক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশষতঃ কাদিয়ানের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে কম্পারেটিভ স্টাডির সুবিধার্থে বিভিন্ন ধর্মের পুস্তকাদি, কৃশ্চিয়ানিটির বিরুদ্ধে অগণিত লিটারেচার এবং এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার বহু বৎসরের এডিশনসমূহের সমাহার লক্ষ্য করে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে যান। নিবন্ধটিতে স্পষ্টভাবে তাদের নিম্নরূপ ধারণাও ব্যক্ত হয়েছিলঃ

"উহা একটি অস্ত্রাগার যা অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যই স্থাপন করা হয়েছে; আরও অনুধাবন করা হয়েছে যে,ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁদের এমনই দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে উহা যেন পর্বতসমূহকেও স্থানচ্যুত করে নেওয়ার শক্তি রাখে।"

– (মোসলেম ওয়ার্ল্ড -এপ্রিল ১৯৩১)

(৫) **'লাইফ'** নামক আমেরিকার এক প্রখ্যাত মেগাজিনে ১৯৫৫ সনের ৮ই আগষ্ট সংখ্যায় সারা আফ্রিকা মহাদেশে আহমদীয়া জামাতের প্রচারে কৃতকার্যতার চারটি ফটোসহ এক নিবন্ধ প্রকাশ করে। আহমদীয়া জামাতের মিশনারীদের মাধ্যমে আফ্রিকা মহাদেশে ইসলাম প্রচারের যে তৎপরতা চলছে নিবন্ধে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়। নিবন্ধটিতে স্বীকারও করা হয় যে, আহমদীয়া জামাতের প্রচারের ফলে আফ্রিকাতে খৃষ্টধর্ম প্রচার মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে; এখন পাদ্রীরা আহমদীদের মোকাবেলায় অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয়েছে। এমন কি, পাদ্রীদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় নিগ্রোদের মধ্যে যেখানে একজন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, সেখানে আহমাদীয়া মুসলিম মিশনারীদের প্রচারের ফলে দশ জন ইসলাম গ্রহণ করেছে। মেগাজিনটিতে আরও মন্তব্য করা হয় যে, আফ্রিকা মহাদেশে হাবশী বা নিগ্রোদের ধর্ম বলতে একমাত্র ইসলামই বুঝায়। আর কৃশ্চিয়ানিটি কেবল শ্বেতাঙ্গদের ধর্মে পরিণত হয়ে পড়েছে।

(৬) **'মিঃ ভোর্লড প্রাইজ'** নামক অপর একজন আমেরিকান পর্যটক আমেরিকান ধর্মযাজকের আফ্রিকা মহাদেশ ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে 'Incredible Africa'

নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাতে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় খৃষ্ট ধর্মের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ডক্টর বিলি গ্রাহাম সাহেবের একটি অভিমত উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হয়েছে যে,কিছুদিন পূর্বে 'ডক্টর বিলি গ্রাহাম' সাহেব খৃষ্টানদের চরম অধঃপতনের নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করে এসেছেনঃ

"সে সময় অত্যাসন্ন, যখন আত্মরক্ষার জন্য খৃষ্টানদেরকে আফ্রিকা মহাদেশের পর্বতগুহায় অথবা মৃত্তিকাভ্যন্তরে লুক্কায়িত কোন আশ্রয়স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।"

(৭) এরূপ আমেরিকার 'টাইম' নামক বিখ্যাত মেগাজিনের ১৯৬৫ সনের ১৬ই এপ্রিল সংখ্যায় এ সম্বন্ধে নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছিল। নিবন্ধে বলা হয়েছিলঃ

"উনবিংশ শতাব্দীতে জামালুদ্দীন আফগানী যেভাবে ইসলামের মধ্যে নবচেতনা অর্থাৎ ইসলামী রেনেসাঁর সংগ্রাম করেছিলেন, সেভাবে ভারতবর্ষেও ইসলামের অভ্যন্তরে একটি নবজীবন সঞ্চারকারী 'আহমদীয়া আন্দোলনের' উদ্ভব হয়। অমুসলমানদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য ব্যাপকভাবে তারা প্রচারকার্য চালাচ্ছে।"

(৮) **আর্চ বিশপ অব কেন্টারবেরী (ইংল্যান্ড)** -এর অভিমতঃ আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশসমূহে আহমদীয়া মুভমেন্টের মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপক প্রচারের ফলে ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারণের কাজে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ইহা লক্ষ্য করে ইংল্যান্ডের আর্চ বিশপ অব কেন্টারবেরী ইসলামের এহেন ব্যাপক প্রচারাভিযানের মোকাবেলা করার জন্য ১৯৬৬ সনে " Anti Islamic Project Fund" (ইসলাম বিরোধী প্রজেক্ট ফান্ড) নামকরণ করে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেন। আফ্রিকা মহাদেশে প্রচার অভিযানে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আর্চ বিশপ সাহেব তাঁর এক জোরালো বক্তৃতায় ব্যক্ত করেনঃ **"ইসলাম এবং কৃশ্চিয়ানিটির শেষ যুদ্ধটি আফ্রিকা মহাদেশেই সংঘটিত হবে।"**

(৯) আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত ঘানা বিশ্ব বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ও প্রখ্যাত লিখক মিঃ এম. জি.উইলসন্স 'ক্রাইষ্ট এন্ড মুহাম্মাদ' নামক এক পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকের এক জায়গায় তিনি লিখেনঃ

"ঘানা দেশের উত্তরাঞ্চলে রোমান ক্যাথলিক ব্যতিরেকে অন্যান্য যাবতীয় খৃষ্টান সংস্থাগুলোকে তাদের প্রচার কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে হয়েছে এবং এর দ্বারা মুহাম্মাদের অনুসারীগণের জন্য ময়দান খালি করে দিয়েছেন। তবে অশানথি নামক অঞ্চলে এবং গোল্ড কোষ্টের দক্ষিণাঞ্চলে বর্তমান কৃশ্চিয়ানিটির কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণের কিছু কিছু এলাকায় বিশেষতঃ সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাসমূহে আহমদীয়া জামাতের আজিমুশ্বান বিজয় পরিদৃষ্ট হচ্ছে। আর খৃষ্টানদের একটি আশা ছিল যে,শীঘ্রই সমগ্র গোল্ডকোষ্ট এলাকার লোক খৃষ্টান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে আশা আজ সুদূর পরাহত।"------- "প্রকৃতপক্ষে ঐ গোল্ডকোষ্ট দেশের শিক্ষিত যুবকগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আহমাদীয়তের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং পরিস্থিতি প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টানদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ।"

এ ফয়সালা এখনও বাকী রয়েছে যে, ভষ্যিতে আফ্রিকায় 'ক্রিসেন্টের' বিজয় হবে না 'সলীবের'। " অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের বিজয় হবে, না ক্রুশীয় ধর্মের বিজয় হবে।

(১০) মোতামেরে আলমে ইসলামীর প্রাক্তন সদস্য ও ইরাকের একজন বিশিষ্ট আলেম **আল্লামা আবদুল ওহাব আসকারী** জামাতে আহমদীয়ার তবলিগী কর্মতৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করে একটি আরবী নিবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে তিনি বলেনঃ

"জামাতে আহমদীয়ার প্রচারকগণ অমুসলমানদের মধ্যে তবলীগ চালিয়ে দীন-ইসলামের যে খেদমত করছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। তাঁদের ইসলাম প্রচার কর্মতৎপরতা সমগ্র বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করছে।" ---------ইসলাম প্রচারোপযোগী সর্বপ্রকার উপকরণাদির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে তাঁরা অমুসলমানদের মধ্যে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় কর্মতৎপরতার মধ্যে তাঁদের ঐসব মসজিদসমূহও শামিল রয়েছে, যেগুলো তাঁরা আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন শহরে স্থাপন করেছেন। আর তাঁদের এসব মহৎ কাজগুলোকে তাঁরা রসূলে করীম (সাঃ)- এর সুন্নত বলে গণ করে থাকেন।

বস্তুতঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে,ইসলামের ভবিষ্যৎ আহমদীয়া জামাতের কর্মতৎপরতার উপরেই নির্ভরশীল।"

– (মোসাহেদাতী ফিস্‌সামায়েশ্‌ শারকেঃ ৪৩-৪৫ পৃঃ)

(১১) পাক-ভারত উপমহাদেশের একজন জার্নালিষ্ট ও প্রখ্যাত বক্তা **মৌলানা যাফর আলী খান সাহেব** 'জমিদার পত্রিকার' সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রিকার ১৯৩২ সনের ২রা অক্টোবর সংখ্যায় এক নিবন্ধে জামাতে আহমদীয়ার অগ্রগতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি লিখেছিলেনঃ

"আহমদীয়া জামা'ত এক বিরাট মহামহীরূহে পরিণত হতে চলেছে। উহার শাখাসমূহ একদিকে সুদূর চীনদেশে অপর দিকে ইউরোপেও প্রসার লাভ করছে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। কারণ, বড় বড় গ্রাজুয়েট, এডভোকেট, অধ্যাপক ও ডাক্তার প্রভৃতির মধ্যে এমন ব্যক্তিত্বও রয়েছেন, যাঁরা কাউন্ট ডেকার্ড এবং হেগলের মত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকদের দর্শনকেও ভ্রুক্ষেপ করেন নি, এমন সব বুদ্ধিজীবীগণও আজ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বাজে সংলাপের উপর যেন চক্ষু বন্ধ করে ঈমান আনয়ন করছে।"

(১২) অথচ উপরোক্ত পত্রিকারই ১৯২৬ সনের ডিসেম্বর সংখ্যাতে তিনিই মন্তব্যচ্ছলে আহমদীয়া মুভমেন্ট সম্পর্কে এ সত্য কথাটি ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেনঃ "ঘরে বসে আহমদীয়া জামাতকে গালমন্দ করা বড় সহজ বটে। কিন্তু এটা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, ইহা একমাত্র জামাত যারা তাদের নিজস্ব প্রচারকগণকে ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমাদের নদওয়াতুল উলামা, দেওবন্দ (ফিরিঙ্গি মহল, লক্ষ্ণৌ) এবং অন্যান্য ধর্ম শিক্ষাদানকারী মারকাযসমূহ দ্বারা কি অনুরূপ কার্যক্রম সম্ভব ছিল না? তারাও তো

অমুসলমানদেরকে তবলীগে এশায়াতে হকের (সত্য প্রচারের) কাজে এমনিতরো সৌভাগ্যের অংশীদার হতে পারতেন। "

(১৩) উপমহাদেশের অপর একজন লিডার এবং ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব **'ইশফাক হুসেন সাহেব'** যিনি মোরাদাবাদ শহরের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। তৎপ্রণীত 'খুনকে আঁসু' নামক পুস্তকে লিখেছেনঃ

"মুসলমানদের সংখ্যা (সেই সময়কার গণনায়-গ্রন্থকার) সপ্ত কোটি বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা মেষপাল সদৃশ। সুতরাং, আমরা নিজেকে সুসংগঠিত জামাত বলতে পারি না। কিন্তু আহমদী মুসলমানরা নিজেকে জামাত বলতে পারেন। কেননা, তাদের মধ্যে রয়েছে সংগঠন। হাদীসে আছে 'ইয়াদুল্লাহে আলাল্ জামাতে' অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লার (সাহায্যের) হাত জামাতের উপর। আল্লাহ্ তাদেরকেই সাহায্য করে থাকেন যারা সংঘবদ্ধ হয়ে নিজের জামাত বানিয়ে থাকে।"

– (হাফেয মোহাম্মদ এন্ড সন্স কাশ্মিরী বাজার লাহোর থেকে প্রকাশিত 'খুনকে আঁসু' ঃ ৬৭ পৃঃ)

(১৪) **'আল্-মুনীর'** (বর্তমান নাম আল্-মিম্বর) পত্রিকার সম্পাদক, এবং উপমহাদেশের একজন জার্নালিস্ট ও জবরদস্ত আলেম বলে খ্যাত ফয়সালাবাদ নিবাসী মৌলানা মোহাম্মদ আশরাফ সাহেব ঐ পত্রিকারই ১৯৫৬ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় মন্তব্য করেছিলেনঃ

"আমাদের একান্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গগণ তাঁদের যথাযথ ও যথাসাধ্য স্বীয় যোগ্যতা দ্বারা কাদিয়ানী মতবাদের সঙ্গে মোকাবেলা করে গেছেন। কিন্তু এ সত্য সম্পর্কে সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, কাদিয়ানী জামাত পূর্ব হতে অধিক শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছে। আমাদের যেসব বুযুর্গানে -দীন মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ বুযুর্গানই তাক্ওয়া, তাল্লুকবিল্লাহ, দেয়ানত,নিষ্ঠা, এলেম এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে এক একজন পর্বততুল্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও এ অপ্রিয় সত্য কথাটি আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এসব শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অশেষ উদ্যোগসহ সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালান সত্ত্বেও কাঁদিয়ানী জামাতের তরক্কী তথা প্রগতি অব্যাহত গতিতেই ধাবমান রয়েছে।"

(১৬) স্বদেশে এবং বহির্দেশে জামাতে আহমদীয়ার ক্রমাগত অগ্রগতির স্বীকারোক্তি করে চিরকালের বৈরী ভাবাপন্ন লাহোরের 'দৈনিক মাশরেক' পত্রিকার নিম্নলিখিত মন্তব্যটি খুবই অর্থবহ।

পত্রিকাটির ১৯৭৪ সনের ৩০শে জুন সংখ্যায় এরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছেঃ বিগত অর্ধ শতাব্দীকাল যাবৎ আহমদীদের বিরুদ্ধে আমরা কেবল সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, সম্মেলন এবং বক্তৃতা দ্বারা যথাসাধ্য কর্মতৎপরতা দেখিয়ে এসেছি। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও আহমদীরা নীরব ভূমিকা পালন করে ধৈর্যের সহিত তাঁদের অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। এ পর্যন্ত তারা দুনিয়ার ৩১টি দেশে ৫০টিরও বেশী মিশন কায়েম

করেছে। এ সময় পর্যন্ত তাঁদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বিদেশে ৩৪৪টি মসজিদ নির্মাণ করেছে। তন্মধ্যে একমাত্র ঘানাতেই ১৬১টি মসজিদ, ইন্দোনেশিয়ায় ৬০টি, সিয়েরালিওনে ৪০টি, নাইজেরিয়াতে ৪০টি এবং পূর্ব আফ্রিকাতে ২০টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। উপরন্তু, বৃটেন, আমেরিকা, জার্মানী, ডেনমার্ক এবং হল্যান্ড ইত্যাদি দেশেও তাঁদের দ্বারা নির্মিত মসজিদসমূহ বিদ্যমান। ইংরেজী, জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাতে তাদের ১৬টি জনপ্রিয় মেগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। সিলসিলায়ে আলীয়া আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা দ্বারা প্রণীত পুস্তকসমূহ এবং এদের জামাতভুক্ত অন্যান্য বিশিষ্ট মনীষীবর্গের লিখিত বই-পুস্তকসমূহ বিদেশী ভাষায় অনুবাদ ছাপিয়ে সারা বিশ্বে প্রকাশ্যে বিক্রী হচ্ছে।

আরও প্রণিধানযোগ্য যে, "যেহেতু সাধারণ মুসলমানরা আহমদীদের বিরুদ্ধে সুশৃংঙ্খলরূপে এমন কোন সক্রিয় প্রচেষ্টা চালায়নি তজ্জন্য বহির্বিশ্বে অধিকাংশ দেশে ইসলামের সে ব্যাখ্যাই চালু হয়ে পড়েছে যা আহমদীরা করে থাকে। শুধু তাই নয়, কোন কোন আফ্রিকান দেশে একমাত্র আহমদীয়াতই ইসলামের মুখপাত্র বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।"

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৪ সাল নাগাদ সর্বমোট ১৩০টি দেশে জামাতের সক্রিয় মিশন স্থাপিত হয়েছে। আফ্রিকান দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র ঘানাতেই আহমদীদের লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষেরও অধিক। ঐ দেশের বিভিন্ন শহরে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোট ৩৫৮টি আহমদীয়া আঞ্জুমান কায়েম রয়েছে এবং ২৫০টি বড় বড় পাকা মসজিদ আহমদীদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে। শত শত মিডল স্কুল, প্রাইমারী স্কুল ছাড়াও আহমাদীয়া জামাতের পরিচালনায় ৭টি সিনিয়ার ক্যামব্রিজ ষ্ট্যান্ডার্ডের হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল পূর্ণোদ্যমে চলছে। তাছাড়া একমাত্র এ জামাত দ্বারা পরিচালিত ১২টি মেডিক্যাল সেন্টারও চালু আছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রথমতঃ ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঘানাতে সর্বপ্রথম মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপিত হওয়ার পর হতেই ক্রমান্বয়ে উন্নতি হতে হতে এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এসব মেডিক্যাল প্রজেক্টের বাৎসরিক আয় ৪ কোটি রূপীকেও ছাড়িয়ে গেছে।

৭৫০ বৎসরে শূন্যতার পরে পুনরায় মুসলিম শাসকের বিলুপ্তির স্পেন দেশের কর্ডোভা জেলার 'পেড্রোয়াবাদ' নামক স্থানে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক বিরাট মসজিদ নির্মিত হয়। এতে ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ১৯৮২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর উক্ত মসজিদ উদ্বোধন করেন। বস্তুতপক্ষে বর্তমান দুনিয়ার কোন কোটিপতি মুসলমান ধনকুবের বা অত্যাধুনিক আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনে মত্ত প্রাসাদবাসী মুসলমান রাজা-বাদশাহ্‌গণের কেউই এ গৌরবের অধিকারী হতে পারেননি। কেননা, আল্লাহ্‌তা'লা এরশাদ ফরমায়েছেনঃ "যালিকা ফাযলুল্লাহে ইউতিহে মাইয়াশাঁও।"

ایں سعادت بزور بازو نیست۔
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ ۔

'আল্লাহ্‌ই আমাকে পাঠিয়েছেন'

[হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর লেখা হতে]

অবশেষে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতির মাধ্যমেই পুস্তকের সমাপ্তি টানছি। জগদ্বাসীকে সম্বোধন করে তিনি ঘোষণা করেন ঃ

(১) "আমিই সে বৃক্ষ, প্রকৃত বিশ্ব অধিপতি খোদাতা'লা যাকে স্বহস্তে রোপণ করেছেন।" – (তোহফায়ে গোলড়বিয়া জামিমা ঃ ৯ পৃঃ)

(২) "তোমরা অবশ্যই স্মরণ রেখ এবং কান খুলে শ্রবণ কর যে, আমার 'রূহ' ধ্বংস হওয়ার 'রূহ' নহে। আর আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার লেশমাত্র চিহ্ন নেই। ঐ প্রকারের হিম্মত এবং এমন পর্যায়ের সত্যনিষ্ঠা দ্বারা আমাকে আশীষযুক্ত করা হয়েছে যার সম্মুখে পর্বতও তুচ্ছ। আমি কারও পরওয়া করি না। আমি একা ছিলাম এবং এরূপ একা থাকতে আমি মোটেই নারাজ ছিলাম না। খোদা কি আমাকে বর্জন করবেন? কখনও না। তিনি কি আমাকে নিষ্ফল করে দেবেন? অবশ্যই নহে। দুষমন লাঞ্ছিত হয়ে যাবে এবং হিংসুক লজ্জিত হবে; খোদা তাঁর নিজ বান্দাকে (খাকসারকে) প্রত্যেক ময়দানে বিজয় দান করবেন।" – (আনওয়ারুল ইসলাম ঃ ২২ পৃঃ)

(৩) "দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তোমরা বুঝে নাও যে, আমার প্রতিষ্ঠিত সিলসিলা আল্লাহ্‌র স্বহস্তে রোপিত চার বিশেষ খোদাতা'লা কখনও ইহাকে বিনষ্ট করবেন না। ইহাকে পূর্ণতা দান না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌তা'লা সন্তুষ্ট হবেন না; এবং সে চারাটাকে আল্লাহ্‌ই পরিচর্যা করবেন ও উহা চতুর্দিকে রক্ষাবেষ্টনী সংস্থাপিত করে আশ্চর্যজনকভাবে তরক্কি প্রদান করতে থাকবেন।" – (আঞ্জামে আথমঃ ৬৪পৃঃ)

(৪) "হে লোক সকল! তোমরা শুনে রাখ, ইহা ঐ খোদার ভবিষ্যদ্বাণী যিনি আসমান ও জমীনের স্রষ্টা। এ জামাতকে তিনি পৃথিবীর সর্বদেশে সম্প্রসারিত করবেন এবং মহব্বত ও যুক্তির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে এ জামাতকে বিজয় প্রদান করবেন। সে দিন অতি সন্নিকটে, বরং দ্বারদেশে উপস্থিত যে, সারা দুনিয়াতে কেবল একটিই মাযহাব তথা আহমদীয়া মুসলিম মাযহাব বা ধর্ম হবে, যাকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা হবে। আল্লাহ্‌তা'লা এ সিলসিলার উপর অসাধারণ ও অলৌকিকভাবে আশীষ বর্ষণ করবেন এবং যারাই এ সিলসিলাকে ধ্বংস করার প্রয়াসী হবে অবশ্যই তারা ব্যর্থ হবে। সিলসিলায়ে আলীয়া আহমদীয়ার বিজয় হবে 'চিরস্থায়ী গালবা' এমন কি মহাপ্রলয় (কেয়ামত) এসে পড়বে।" – (রূহানী খাযায়েন)

(৫) 'আরবাঈন' নামক কেতাবের তৃতীয় জিলদের ১৭ পৃষ্ঠায় হযরত আকদস লিখছেনঃ "তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর ও যথেচ্ছ গালিগালাজ দিতে থাক; এবং আমাকে যথাসাধ্য কষ্ট ও যাতনা দেওয়ার পরিকল্পনা কর এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত আমার এ সিলসিলাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেওয়ার জন্য সমুদয় চেষ্টা তদ্বির চালিয়ে

যাও, কিন্তু মনে রেখ যে, আল্লাহ্‌তা'লা অচিরেই তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবেন যে, আল্লাহ্‌র হাতেই বিজয়ী।"

(৬) বিরুদ্ধবাদী উলামাকে সম্বোধন করে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ঃ

"স্মরণ রাখবেন, এরকম দোয়াও যদি আপনারা করেন যে, দোয়া করতে করতে আপনাদের মুখে ঘা হয়ে যায় এবং ক্রন্দন করতে করতে এমনভাবে সেজদাতে মাথা নত করে ফেলেন যার ফলে নাক ঘষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, আর অনবরত অশ্রুপাত হতে হতে চক্ষের আবরণ গলে গিয়ে চক্ষু-পলকসমূহ ঝরে পড়ে যায়; এমনকি আল্লাহ্‌র দরবারে গিরিয়াজারির আতিশয্যের কারণে দৃষ্টিহীনতা এসে যায় এবং অবশেষে দেমাগ (মস্তিষ্ক) শীর্ণ হয়ে মৃগী অথবা উন্মাদগ্রস্ত হয়ে যায়; তবুও আমার বিরুদ্ধে আপনাদের দোয়া তথা বদ্‌দোয়া আল্লাহ্ শ্রবণ করবেন না। কেননা, আমি খোদা প্রেরিত। -------- আমার রূহে সেই সাচ্চায়ী বিরাজমান যদ্বারা ইব্রাহীম (আঃ)-কে আশীষযুক্ত করা হয়েছিল। আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার, হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্‌র সমতুল্য সম্পর্ক বিদ্যমান। আমার এ গূঢ় রহস্য আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কেহ অবগত নহে। আমার বিরুদ্ধে ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মেতে উঠে বিরুদ্ধবাদী লোকগণ নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আমি ঐ রকম (দুর্বল) 'চারা' নহি যা তাদের হাতে উপড়িয়ে ফেলতে পারে।"

– (আরবাঈন পুস্তকের পঞ্চম জিল্দঃ ৫-৭ পৃঃ)

সত্য নির্ধারণের সন্দেহাতীত পন্থা

কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ,একাধারে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং ইমাম মাহদী হওয়া দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য সত্যান্বেষীগণকে একটি সহজ পন্থা অবলম্বন করার জন্য আহ্বান করেন। তিনি গভীর আন্তরিকতা ও জোরালো ভাষায় বলেন ঃ

"সত্যান্বেষীগণ! যাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করার ভয়ে ভীত, তাঁরা তাহকীক অর্থাৎ পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে ব্যাপারটি সম্পর্কে যাচাই না করে মৌলবীদের অনুকরণ করবেন না। তাঁদের ফতওয়া দেখে অস্থির হবেন না। কারণ, এরূপ ফতওয়া কোন অভিনব বস্তু নহে। যুগে যুগে উলামা সম্প্রদায় তাদের জ্ঞানের অহমিকার কারণে যুগ-ইমামদের অস্বীকার ও বিরোধিতা করে আসছেন।" আল্লাহ্ সূরা মোমেন-এর নবম রুকূতে বলেছেনঃ

فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

অর্থাৎ তাহারা তাহাদের নিকট যে যৎসামান্য জ্ঞান ছিল উহার গর্বে উল্লসিত (৪০ঃ৮৪)।

মির্যা সাহেব বলেনঃ "যদি এ অধমকে সন্দেহ করেন, আমি যে দাবী করেছি তৎসম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে সন্দেহ নিরসনের জন্য আপনাদেরকে আমি একটি সহজ পন্থা অবলম্বন করার জন্য বলছি।

প্রথমতঃ 'তওবাতুন্নসুহা' (খাঁটিভাবে তওবা) করার পর রাত্রে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবেন। প্রথম রাকাতে সূরা ইয়াসীন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে ২১ (একুশ) বার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। তারপর তিন শত বার ইস্তেগফার পাঠ করবেন এবং খোদাতা'লার নিকট দোয়া করবেন, হে কাদের-করীম সর্বশক্তিমান কৃপালু খোদা! তুমি গোপন অবস্থা জান। আমি জানি না। কোন মরদুদ, মিথ্যাবাদী, ভন্ড কিংবা সত্যবাদী কেউই তোমার দৃষ্টি হতে আত্মগোপন করতে পারে না, সুতরাং, আমি মিনতি করি এই যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি মসীহ-মাহদী এবং ওয়াক্তের ইমাম হওয়ার দাবী করেছেনঃ (১) তাঁহার অবস্থা কী? (২) তিনি কি সত্যবাদী? (৩) না মিথ্যাবাদী? (৪) মকবুল না মরদুদ? (৫) তোমার দরবারে তিনি গৃহীত না পরিত্যক্ত? তোমার অনুগ্রহ দ্বারা এ অবস্থা স্বপ্ন, কাশ্‌ফ বা ইলহাম দ্বারা আমার নিকট প্রকাশ কর; যাতে মরদুদ হয়ে থাকলে তাকে গ্রহণ করে যেন 'গুমরাহ' না হই এবং 'মকবুল' হয়ে থাকলে এবং তোমার তরফ হতে এসে থাকলে তাঁকে অস্বীকার বা অবমাননা করে ধ্বংস না হই। আমাদেরকে সর্বপ্রকার ফেতনা ও অশান্তি হতে রক্ষা কর। যাবতীয় শক্তি তোমারই। আমীন!

প্রচারক ঃ
মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ান

---

* নোটঃ উল্লেখ্য যে, রূহানী পন্থা অবলম্বন করে অদ্যাবধি অসংখ্য লোক আহমদীয়া সিলসিলার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ মুক্ত হয়ে তাতে যোগদান করেছেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

অন্তিম শয্যায় পণ্ডিত লেখরাম